NOT FOR SALE

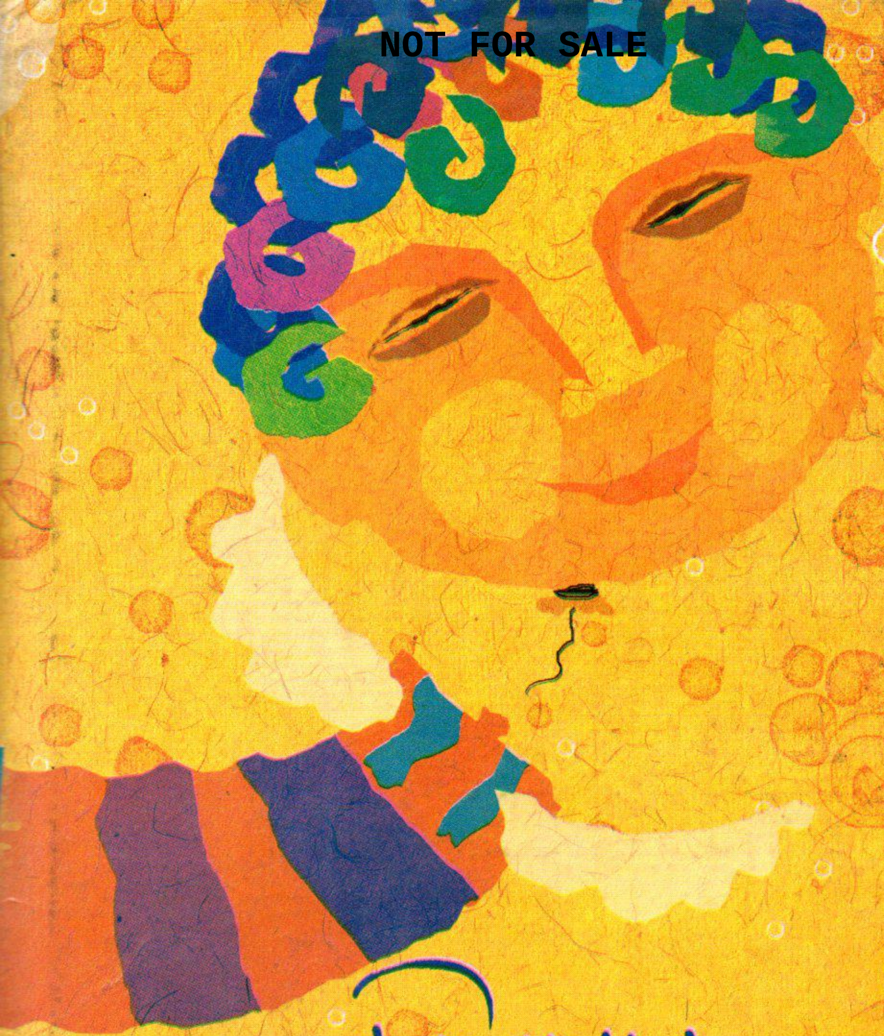

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

প্রথম খণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

NOT FOR SALE

THIS COPY IS NOT FOR SALE.

©ASOKE CHATTERJEE

NOT FOR SALE

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

(প্রথম খণ্ড)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

NOT FOR SALE

Kishore Sahitya Samagraha
by Harinarayan Chattopadhaya
Price : Rs. 150.00

Published by :
Rama Bandayapadhaya
Sasadhar Prakashani
10/2B, Ramanath Mazumder Street
Kolkata-700 009.

প্রকাশিকা ঃ
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

© তপতী দেবী

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ২০১২
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থমেলা

প্রচ্ছদ ঃ সৌরিশ মিশ্র

হরফবিন্যাস ঃ
আর্টিস্টিক ইম্প্রেশন
৮০/৫, এম. জি. রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ
গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন
চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিনিময় ঃ ১৫০ টাকা মাত্র।

পিতা
সাজানো
মূর্তিদুটো
কাহিনী।
দুর্গাপুরের
অরণ্যের
হতো না।
দীপু ও ত
লোকদের
কাছে ফি
যাবেন।

কাঠের
পারিজাত

রামগ
নিয়ে তাবে

এই ব
করবে আ

NOT FOR SALE

ভূমিকা

পিতা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস ও ছোট গল্প নিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে। কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনীতে কিভাবে রতনগড়ের মন্দিরের মূর্তিদুটো নিখোঁজ হয়েছিল, কিভাবে তাদের পাওয়া গেল সেই দুর্দান্ত কাহিনী। অরণ্য বিভীষিকাতে কালু সর্দার একজন ডাকাত। আজ যেখানে দুর্গাপুরের কারখানা, অনেক বছর আগে সেখানে বন ছিল আর সেই অরণ্যের পথ দিয়ে কেউ গেলেই তার টাকাপয়সা আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। এই রোমহর্ষক কাহিনী পড়লে সকলেই ভয় পাবে। ভয়ের মুখোশে দীপু ও তপু দুজনেই স্কুলের ছাত্র। কিভাবে তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে দুষ্টু লোকদের হাতে পড়েছিল আর কি করেই বা তারা আবার তাদের মা-বাবার কাছে ফিরে এসেছিল তারই বিচিত্র কাহিনী, যা পড়ে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন।

কাঠের পা গল্পে আমরা দেখতে পাই কিভাবে আফজলের কাছ থেকে পারিজাত আসল পাথর পেয়েছিলেন।

রামগতির দুর্গতি গল্পে রামগতি খুব কিপ্টে লোক ছিল। তার সুযোগ নিয়ে তাকে যে হেনস্থা করা হয়েছিল তারই কাহিনী গল্পে পাবেন।

এই বইটিতে ডিটেকটিভ রহস্য, হাসি—সবকিছুই আপনাদের মন জয় করবে আশা করি।

ধন্যবাদান্তে
তপতী দেবী

NOT FOR SALE

সূচীপত্র

উপন্যাস

- অরণ্য-বিভীষিকা ৫-১৩০
- ভয়ের মুখোশ ১৩১-২১৪
- কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ২১৫-৩২০

গল্প

- রামগতির দুর্গতি ৩২১-৩২৮
- কাঠের পা ৩২৯-৩৫০

NOT FOR SALE

অরণ্য-বিভীষিকা

লোহার আলমারিটা খোলবার আগে রাজনারায়ণ ঘরের দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিলেন। বাইরের কোন লোক দেখতে না পায়। ঘরের মধ্যে শুধু দু'জন। রাজনারায়ণ আর তাঁর স্ত্রী মহামায়া।

পৈতায় বাঁধা চাবিটা দিয়ে রাজনারায়ণ আলমারি খুললেন, তারপর ছোট একটা ড্রয়ার খুলে মাঝারি সাইজের ক্যাশবাক্স বের করলেন।

মহামায়ার দিকে ফিরে বললেন, এস, এগিয়ে এস। নায়েব দুপুরবেলা কলকাতা থেকে সব নিয়ে এসেছে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে বলে তোমাকে তখন আর ডাকিনি। আলমারির ভিতর তুলে রেখেছি।

মহামায়া এগিয়ে এসে আলমারির সামনে পা মুড়ে বসল।

রাজনারায়ণ এক এক করে ক্যাশবাক্স থেকে নামিয়ে সিল্কের কাপড়ের ওপর রাখলেন।

সীতাহার, রতনচূড়, মান্তাশা, কঙ্কণ, হাঙরমুখো অনন্ত, চন্দ্রহার, কান, সিঁথিমৌর, তোড়া। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় গহনাগুলো ঝকঝক করে উঠল। মহামায়া খুব খুশী।

পশুপতি সেকরার হাতের কাজ ভারী চমৎকার। সোনা তো নয় যেন আগুন। কি ঝকঝকে পালিশ। আমার তো মনে হয় সূর্যকান্তবাবুরা গহনা দেখে খুবই আনন্দ পাবে।

রাজনারায়ণ মাথা নাড়লেন।

এর ওপর করকরে মোহর আছে। সেগুলো থলিতে মজুত। সম্প্রদানের সময় বাবাজীর সামনে রাখব। তাছাড়া আরো একটা জিনিস—

খুট্ করে একটা শব্দ।

বাইরের বারান্দায় কি একটা এসে পড়ল।

রাজনারায়ণ তাড়াতাড়ি গহনাপত্র আলমারিতে তুলে ফেললেন। চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলেন আলমারি। কি হল? মহামায়া অবাক্ হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

কি একটা আওয়াজ হল বারান্দায়। দেখে আসি। দরজা খুলে রাজনারায়ণ বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। মহামায়া চুপচাপ বসে রইল ঘরের মধ্যে।

মিনিট পাঁচেক পরে রাজনারায়ণ যখন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, তখন তাঁকে দেখে মহামায়া চমকে উঠল।

পাংশু মুখ, বিস্ফারিত দুটি চোখ, ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছে। কি হল?

রাজনারায়ণ কোন উত্তর দিলেন না। একটা হাত মহামায়ার দিকে এগিয়ে দিলেন। হাতের মুঠোয় একটা তীর। তীরের আগায় একটা কাগজের টুকরো।

মহামায়া ঠিক কিছু বুঝতে পারল না। চিঠিটাই বা কিসের? কালু সর্দারের চিঠি।

বিরাট ঘরে রাজনারায়ণের গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আর কিছু বলতে হোল না। আর কিছু বলার দরকারও ছিল না।

কালু সর্দারের নামেতেই বিশখানা গাঁয়ের লোক থরথরিয়ে কাঁপত। কোন শক্তি নেই কালুকে বাধা দিতে পারে। কোন অস্ত্র নেই যাতে কালুর পরমায়ু হরণ করতে পারে। এটাই ছিল সকলের বিশ্বাস।

কালু সর্দার কোথাও আসবার আগে চিঠি লিখে তার দিনক্ষণ জানাত। পাইক, বরকন্দাজ, লোকলশকর যতই তৈরী থাক, কালু সর্দারের দল ঠিক কাজ হাসিল করে যাবেই। তাকে কেউ আটকাতে পারত না।

আটকাতে যে পারত না, তার কারণও ছিল। সবাই বলে কালু মা বাশুলীর বরপুত্র। মায়ের পুজো দিয়ে, পূজার সিঁদুর কপালে নিয়ে সে ডাকাতিতে বের হত, সেইজন্য সে ছিল অবধ্য। কোন অস্ত্র তার ত্রিসীমানায় আসতে পারত না।

রনপায় ভর দিয়ে কালু চলাফেরা করত। এক এক রাতে বিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি করে নির্বিঘ্নে নিজের আস্তানায় ফিরে আসত। গায়ে একটা আঁচড়ও লাগত না।

এখন যেখানে দুর্গাপুরের কারখানা, জমজমাট শহর, অনেক বছর আগে সেখানে অজগর বন ছিল। দিনের বেলাও সূর্যের আলো প্রবেশ করত না। অবিশ্রাম ঝিঁঝি ডাকত। ভয়ংকর জন্তুজানোয়ার তো ছিলই, তার চেয়েও মারাত্মক ছিল ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়ের দল।

NOT FOR SALE

কেউ পথ ভুলে সে জঙ্গলে ঢুকলে প্রাণ নিয়ে আর বের হতে পারত না।

দুর্গাপুরের সেই গভীর জঙ্গল ছিল কালু সর্দারের ডেরা।

অনেক কালের পুরোনো এক বিশালাক্ষীর মন্দির ছিল। আশপাশের লোকেরা বলত বাশুলীর মন্দির। বিরাট আটহাত কালীমূর্তি। মূর্তির দুটো চোখ আর লকলকে জিভ দেখলে অনেক সাহসী লোকেরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। তারই কাছে কালু সর্দার থাকত।

কালু একলা নয়, তার সঙ্গে থাকত তার একশ অনুচর। বেশির ভাগই বাগদী আর আগুরী। তাদের লাঠি হাতে থাকলে বন্দুকের গুলিও দেহ ছুঁতে পারত না।

অনেকবার কালু কোম্পানির টাকা লুঠ করেছে।

অবশ্য চিঠি দিয়ে নয়, আচমকা। বিহার থেকে বাংলায় খাজনার টাকা আসছিল, পালকিতে, চারপাশে অশ্বারোহী সিপাই। হাতে গাদা বন্দুক। এছাড়াও বর্শা হাতে আরও লোক থাকত।

পাশে গভীর জলা, জঙ্গল। ছোট ছোট টিলা।

হঠাৎ একেবারে 'বাশুলী মায়ীকি জয়' বলে বন্যার স্রোতের মতন কালু সর্দারের দল দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বন্দুকধারী সিপাইরা অবসরই পায়নি। তারা সচেতন হবার আগেই ভোজালি আর বর্শায় কারো মুণ্ড দেহচ্যুত, কারো বা শরীর এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল।

তারপর কালু সর্দারের অনুচরদের পক্ষে টাকার থলি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়া মোটেই শক্ত হয়নি।

একবার শুধু কোম্পানি খেপে গিয়েছিল।

সেবার পালকির মধ্যে টাকা আগলে নিয়ে যাচ্ছিল এক লালমুখো সাহেব। মিস্টার কানিংহাম।

গোলমাল শুরু হতেই কানিংহাম দু হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে পালকি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল।

অসীম সাহস ভদ্রলোকের, তেমনি অদ্ভুত লক্ষ্য।

NOT FOR SALE

কালু সর্দারের ডানহাত-গগন দলুই। খুব ভাল তলোয়ার খেলত। পিস্তলের এক গুলিতে তার চোয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল কানিংহাম। তারপর আর একটা গুলিতে বিজয় সামন্ত মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। বিখ্যাত লাঠিয়াল বিজয়।

কালু সর্দার একটু দূরে রনপার ওপর ভর দিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। ব্যাপার দেখে রনপা চড়েই হুংকার দিয়ে কানিংহামের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এত আচমকা যে কানিংহাম একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

কালু সর্দার তার মাথার অনেক ওপরে।

পিস্তল উঁচু করার আগেই কালু খাঁড়া দিয়ে কানিংহামের মাথাটা দু-ফাঁক করে দিয়েছিল।

তারপর কোম্পানির সিপাই আর কেউ দাঁড়ায়নি। ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পেরেছিল, পালিয়েছে। সেই সময় কোম্পানি খেপে উঠেছিল।

কলকাতা থেকে একগাদা সিপাই এসেছিল বন্দুক, বল্লম, সড়কি নিয়ে।

ওপরওয়ালার হুকুম ছিল যেমন করে হোক সাহেব মারার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

কোম্পানির সিপাই কিন্তু বনের মধ্যে কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

শুধু ঝিঁঝি আর তক্ষকের আওয়াজ। মাঝে মাঝে বানরদের এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে পড়ার শব্দ। কোথাও জনমানব নেই। দিনের বেলাতেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। বার বার পায়ে বুনো লতা জড়িয়ে গেল।

যে সব সিপাইরা ঘোড়ায় চড়ে ভিতরে ঢুকেছিল, তাদের ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে সামনের পা তুলে চিঁহিঁ করে উঠল।

হিন্দু সিপাইরা বলল, এ জঙ্গলে ভূত আছে হুজুর। আমরা আর এগোব না। মুসলমান সিপাইরা বলল, এটা শয়তানের এলাকা। আমরা ফিরছি। সবাই ফিরে এসেছিল।

সেই কালু সর্দার, যাকে লোকে যমের দোসর বলে মনে করে, সে চিঠি পাঠিয়েছে রাজনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি।

NOT FOR SALE

ব্যাপারটা যথেষ্ট ভয়ের তো বটেই। মহামায়া প্রশ্ন করল কি লিখেছে চিঠিতে?

একটু কেশে রাজনারায়ণ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন।

বাতির তলায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

মহাশয়,

আগামী অমাবস্যার রাত্রে বাশুলী মায়ের পূজার আয়োজন করিয়াছি। আমি মায়ের দীন সেবক। মায়ের পূজার ব্যয় বহন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। সেই জন্য আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। অমাবস্যার আগের রাত্রি দ্বিপ্রহরে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইব, আপনি অনুগ্রহপূর্বক অর্থ, রত্ন, অলংকারাদি লইয়া প্রস্তুত থাকিবেন। মায়ের কর্মে বাধা প্রদান করিয়া কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টি করিবেন না বলিয়াই বিশ্বাস করি।

দীনের প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

বিনীত
বাশুলী মায়ের সেবায়েত
কালু।

একবারে নয়, থেমে থেমে রাজনারায়ণ চিঠি পড়া শেষ করলেন।

মহামায়া প্রস্তরমূর্তির মতন পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজনারায়ণ থামতে মহামায়া বলল, এই কি ডাকাতির চিঠি?

হ্যাঁ, কালু সর্দার এইভাবেই সকলকে চিঠি লেখে। পূজার সাহায্য চেয়ে আমার মনে হয়, তারার বিয়ের জন্য কলকাতা থেকে গহনাগাটি এনেছি মহাল থেকে কাঁচা টাকা, সবই কালু জানতে পেরেছে। তার চর সর্বত্র সেইজন্যই এ বাড়িতে চড়াও হতে চায়।

কি হবে? এবার মহামায়ার কণ্ঠে কান্নার সুর।

মহামায়ার কথার কোন উত্তর রাজনারায়ণ দিলেন না। দরজা দিয়ে খোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, ভৈরব, ভৈরব।

NOT FOR SALE

মিনিট কয়েক পরেই সামনের সিঁড়ি দিয়ে এক লাঠিয়াল উঠে এল। কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। গলায় লাল পাথরের মালা। লাল পাথরের মতনই আরক্ত দুটি চোখ। হাঁটু পর্যন্ত খাটো হলুদ রঙের ধুতি। কোমরে গামছা। হাতে তেল-চুকচুকে লাঠি।

বারান্দায় এসেই লাঠিটা রাজনারায়ণের পায়ের কাছে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, ডেকেছেন হুজুর?

নায়েবমশাইকে একবার ডেকে দে। সদরে আসতে বল।

ভৈরব নেমে যেতে খড়ম পায়ে দিয়ে রাজনারায়ণও নেমে গেলেন। একতলায়, সদরে।

বিরাট তক্তপোশ পাতা। ইতস্ততঃ কয়েকটা তাকিয়া। একপাশে একটা আলবোলা। দেয়ালে অনেকগুলো তৈলচিত্র। রাজনারায়ণের পূর্বপুরুষদের।

রাজনারায়ণ তক্তপোশের ওপর একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন।

থানা এখান থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ। সেখান থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে এমন আশা দুরাশা। একটি দারোগা আর গুটি দুই তিন সিপাই, এরা আর বিপদে কি সাহায্য করতে পারে?

অমাবস্যার আর ঠিক পাঁচ দিন বাকী। তার মানে কালু সর্দার আসবে চার দিন পরেই। যা কিছু ব্যবস্থা এর মধ্যেই করে ফেলতে হবে।

রাজনারায়ণ একবার ভাবলেন, অলংকার, অর্থ সমস্ত কলকাতায় সরিয়ে ফেলবেন, কিন্তু তারপরই মনে হল, তাতে বিপদ্ আরো বেশী। কালু সর্দারের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি। টাকা আর অলংকার কোনদিনই কলকাতায় পৌঁছাবে না। পথেই কালু সর্দারের লোকের হাতে পড়বে।

কি ব্যাপার, এমন অসময়ে ডেকেছেন? নায়েব এসে তক্তপোশের পাশে দাঁড়াল।

রাজনারায়ণ মুখ তুলে দেখলেন, তারপর বললেন, বসুন নায়েবমশাই। আপনি আজই কলকাতা থেকে ফিরেছেন, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত।

নায়েব স্বীকার করল, একটু পরিশ্রান্ত বোধ করছি অবশ্য। সারাটা পথ নৌকায়। গঙ্গার অবস্থাও খুব শান্ত ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

NOT FOR SALE

গহনাপত্রের কি কোন গরমিল হয়েছে? আমি তো দু দুবার তালিকা দেখে মিলিয়ে নিয়েছি।

না, না, রাজনারায়ণ হাত নাড়লেন, সে সব কিছু নয়। গহনাপত্র ঠিকই আছে। আপনার কাজ চিরদিনই নিখুঁত। এটা দেখুন।

তাকিয়ার তলা থেকে রাজনারায়ণ তীরবিদ্ধ চিঠিটা বের করে নায়েবের দিকে এগিয়ে দিলেন।

একবার ঝুঁকে চিঠির কোণে রক্তাক্ত খাঁড়ার চিহ্ন দেখেই নায়েব শিউরে উঠল, সর্বনাশ, এ তো কালু সর্দারের চিঠি। এ আপনি কোথা থেকে পেলেন?

একটু আগে তীরটা ওপরের বারান্দায় এসে পড়ল। বাইরে থেকে কেউ ছুঁড়েছে।

নায়েব পিরানের পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে লাগিয়ে নিল। অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ল।

তারপর রাজনারায়ণের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, এখন উপায়?

উপায়ের ব্যাপারেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

নায়েব গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, আমাদের তৈরী থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে?

কিন্তু কালু সর্দারের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কেউই তো তৈরী থেকেও পার পায়নি। কালু যা বলেছে, তা করেছে।

তা বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে ফটক খুলে তাকে তো আর আহ্বান জানানো যায় না। আমাদের ভীল, সাঁওতাল আর যত লেঠেল প্রজা আছে সব এখানে এনে জড় করব, পাহারা দেবার জন্য। তারা আপনার জন্য জান দেবে। দেখি কি করে কালু এখানে ঢোকে। আর ধন-অলংকারের আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কি ব্যবস্থা?

নায়েব আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে এদিক ওদিক দেখল তারপর আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে চাপাকণ্ঠে বলল, আপনি সব কিছু চোরাকুঠুরিতে চালান দিন। আর পূজার সময় বারোয়ারি যাত্রাদলের যে মেকী গহনা আমাদের কাছে আছে, সেইগুলোই আপনার আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে হবে।

NOT FOR SALE

রাজনারায়ণের মুখ দেখে মনে হল নায়েবের এ ব্যবস্থায় তিনি কিছুটা সন্তোষ লাভ করেছেন।

বললেন, বেশ, আপনার কথামতই ব্যবস্থা করে দেখি। আর একটা কথা নায়েবমশাই।

বলুন?

এ চিঠির কথা আপনি পাঁচ কান করবেন না। কে শত্রু কে মিত্র চেনা দুষ্কর।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ সম্বন্ধে কিছু জানবে না।

নায়েব বেরিয়ে যেতে রাজনারায়ণ উঠে পড়লেন।

ওঠবার মুখেই বিপত্তি।

অন্দরের পরিচারিকা বিরজা দ্বারপথে এসে দাঁড়াল।

হুজুর, একবার শীগ্‌গির ওপরে আসুন।

রাজনারায়ণ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। বিরজার চিৎকারে চমকে উঠলেন।

কি, কি হল?

মার ফিট হয়েছে।

ফিট! বিরজার পিছন পিছন রাজনারায়ণ দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে এলেন।

ঘরের মাঝখানে মহামায়া শুয়ে। তাকে ঘিরে আরো দু'জন পরিচারিকা। বোধ হয় মহামায়ার মাথায় জল ঢালা হয়েছিল। ঘরের মেঝে জলে ভরতি।

এমন ফিট মহামায়ার মাঝে মাঝে হয়। কোন শোক বা ভয় পেলে। এবার অনেকদিন হয়নি।

কবিরাজ একটা ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু সে ওষুধ খাওয়ানোই মুশকিল। এই সময় দাঁতে দাঁতে এমন আটকে যায়, মুখই খোলা যায় না।

রাজনারায়ণ ওষুধটা এনে বিরজার হাতে দিয়ে বললেন, এখনই এটা খাইয়ে দাও। তারা কোথায়, তারা?

একজন পরিচারিকা বলল, দিদিমণি ঠাকুরঘরে।

এত রাত পর্যন্ত ঠাকুরঘরে?

কথাটা বলেই রাজনারায়ণ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

NOT FOR SALE

পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি। রাজনারায়ণের গৃহদেবী। দু'বেলা পূজা হয়, আরতি।

পুরোহিতের সঙ্গে তারাই থাকে। সব ব্যবস্থা করে দেয়।

গৃহদেবীর সঙ্গে মিল রেখেই রাজনারায়ণ মেয়ের নাম রেখেছিলেন তারা। মেয়ে সামান্য শ্যামাঙ্গী, কিন্তু অপরূপ লাবণ্যময়ী। দীর্ঘকেশ, আয়তলোচন।

পণ্ডিতরা গণনা করে বলেছেন, তারার দেবী অংশে জন্ম। এ মেয়ে ঐশী সম্পদের অধিকারিণী।

তারা যখন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন মহামায়া উঠে বসেছে। পরিচারিকারা সরে গেছে সে ঘর থেকে। তারা একবার মার দিকে চেয়ে বাবাকে প্রশ্ন করল।

মার কি হয়েছে বাবা?

হঠাৎ আবার ফিট হল আজকে।

কেন? আজ হল কেন?

কেন হল, তার উত্তর মেয়েকে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই তিনি শুধু বললেন, কি জানি, বুঝতে পারছি না। রাত অনেক হয়েছে, তোমরা শুতে যাও।

মহামায়াকে ধরে তারা বাইরে চলে গেল।

রাজনারায়ণ বারান্দায় গিয়ে এদিক ওদিক দেখলেন। পাশেই আমবাগান। নিঝুম অন্ধকার। শুধু এখানে ওখানে জোনাকির চুমকি। দেউড়িতে লাঠি হাতে ভৈরব পায়চারি করছে।

বারান্দার দরজা বন্ধ করে রাজনারায়ণ আবার আলমারি খুললেন। ক্যাশবাক্সটা সাবধানে বের করে নিয়ে এদিকের দরজা দিয়ে বাইরে এলেন।

ঘোরানো সিঁড়ির কাছে দেয়ালের গায়ে বিরাট এক তৈলচিত্র। অশ্বারোহী এক যোদ্ধার। রাজনারায়ণের পূর্বপুরুষদের একজন, যিনি একসময়ে বর্গীর আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

রাজনারায়ণ এদিক ওদিক দেখে চিত্রের পায়ের কাছে জুতার ওপর সজোরে টিপে ধরলেন।

খট্ করে একটা শব্দ। তৈলচিত্র দরজার মতন খুলে গেল। ভিতরে আবছা সিঁড়ির থাক দেখা গেল। ক্যাশবাক্স বগলে করে রাজনারায়ণ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

NOT FOR SALE

কিছুটা গিয়েই বেশ অন্ধকার। আর দেখা যায় না। রাজনারায়ণ হাতড়ে হাতড়ে পাশের কুলুঙ্গি থেকে চকমকি পাথর বের করলেন, তারপর পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে সিঁড়ির এককোণে রাখা মশালে ধরালেন।

সামনেই চোরাদরজা দেখা গেল। দরজা ঠেলে রাজনারায়ণ ভিতরে ঢুকলেন।

দেয়ালের গায়ে বিরাট সব গর্ত। তারই একটার মধ্যে ক্যাশবাক্সটা ঠেলে রেখে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঠুকঠুক করে কোথায় একটা আওয়াজ হল। ভ্রু কুঞ্চিত করে রাজনারায়ণ ফিরে দাঁড়ালেন। পরিশ্রমে, উত্তেজনায় তাঁর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘামের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। চওড়া বুক ওঠানামা করছে।

পায়ের শব্দ বলেই যেন মনে হল, কিন্তু এ চোরাকুঠুরিতে কোথা থেকে পায়ের শব্দ আসবে। এ চোরাকুঠুরির কথা জমিদারির দু একজন শুধু জানে। রাজনারায়ণ, নায়েব আর ভৈরব। পরিবারবর্গের মধ্যে একমাত্র মহামায়া। তারাও জানে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই রাজনারায়ণ বুঝতে পারলেন, সবই তাঁর মনের ভুল। নিজের বুকের স্পন্দনই তিনি শুনেছেন। বাইরের কোন আওয়াজ নয়।

সিঁড়ি বেয়ে রাজনারায়ণ ওপরে উঠে এলেন।

তৈলচিত্র দেয়ালের সঙ্গে লেপটে ছিল। উলটো দিক থেকে হাতল ঘোরাতেই চিত্রটি খুলে গেল। রাজনারায়ণ এদিকে এসে আবার তৈলচিত্র আটকে দিলেন।

নিস্তব্ধ রাত্রি। কেউ কোথাও নেই। শুধু অন্ধকার আর স্তব্ধতা চিরে মাঝে মাঝে ভৈরবের হুংকার শোনা যাচ্ছে, হুঁশিয়ার!

এই চোরাকুঠুরি নির্মিত হয়েছিল বহুকাল আগে। যখন পাঠানদের অত্যাচারে মানুষের প্রাণ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। কোন কারণ নেই, প্ররোচনা নয়, হঠাৎ সৈন্যের দল ঘোড়া ছুটিয়ে জমিদারির মধ্যে ঢুকে পড়ত। শিশু নারী বৃদ্ধ তাদের অত্যাচারের কাছে কেউ রেহাই পেত না। ধনরত্ন তো ছিনিয়ে নিতই, প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।

NOT FOR SALE

সেই সময় বাড়ির মেয়েরা এই চোরাকুঠুরিতে আশ্রয় নিত। শিশুরাও। পুরুষরা দেউড়ি পাহারা দিত। প্রাণ দিত।

পাঠানের অত্যাচার থামতে, মোগলের গণ্ডগোল কিছুদিন শুরু হয়েছিল, কিন্তু সে খুব তীব্র নয়। শেষদিকে আরম্ভ হয়েছিল বর্গীদের তাণ্ডব। তখন আবার চোরাকুঠুরির প্রয়োজন হয়েছিল।

তারপর সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে কোম্পানি এল ব্যবসা করতে। দাঁড়িপাল্লা হাতে এল বটে, কিন্তু নজর মসনদের ওপর।

তবে একটা কথা, দেশে কিছুটা শান্তি ফিরে এল। অহেতুক অত্যাচার বন্ধ হল।

কিন্তু একেবারেই কি বন্ধ হল? ডাকাতের দল উঠল। রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাত, কেনারাম, সবশেষে এই কালু সর্দার। মানুষের ত্রাস।

এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় কোম্পানি করতে পারল না। কোম্পানির লোক নিজেরাই এদের হাতে নাজেহাল হয়ে গেল। রাজনারায়ণ চোখ বন্ধ করলেন।

সকাল থেকে একটা ব্যস্ততার ভাব। অমাবস্যার আগের দিন।

তারার প্রথম নজরে পড়ল। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে কালীর মন্দিরে যায় পূজার আয়োজন করতে। জবাফুল তুলে মালা গেঁথে রাখে। ধূপ ধুনো জ্বালায়। তারপর ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত এসে হাজির হয়।

আবছা অন্ধকারে মন্দিরে যেতে যেতেই তারা লক্ষ্য করল সদর ফটক দিয়ে পিলপিল করে লোক ঢুকছে। পালপার্বণে যেমন আসে।

চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখল, কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে টাঙ্গি, কারো বর্শা, কারো বল্লম। সকলেরই খালি গা। কাপড় মালকোঁচা দেওয়া। তারা অবাক্ হয়ে গেল।

এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পেল ওপরের বারান্দায় রাজনারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন।

তারা ঘুরে বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একদম কাছে নয়। কারণ স্নান সেরে এসেছে, এখন আর ঘরের মধ্যে ঢোকা উচিত হবে না।

NOT FOR SALE

বাবা!

কে রে?

আমি তারা।

কি খবর মা? রাজনারায়ণ অপুত্রক। একটি মাত্র সন্তান তারা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন।

তার ওপর আর কিছু দিন পরেই তারা পরের বাড়িতে চলে যাবে। জমিদার সূর্যকান্তবাবুর বাড়ি। এখান থেকে অনেক মাইলের পথ। তখন আর ইচ্ছা করলেই রাজনারায়ণ মেয়েকে দেখতে পাবেন না।

এত লোক এখানে ঢুকছে কেন বাবা? এত ভোরে?

রাজনারায়ণ প্রথমে ভাবলেন, মেয়েকে কিছু একটা মনগড়া কথা বলবেন, যাতে তারা ভয় না পায়। তারপর ভাবলেন, সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই ভাল। তাতে মেয়ে মন শক্ত করে নিতে পারে।

রাজনারায়ণ মেয়ের দিকে একটু এগিয়ে কালু সর্দারের চিঠির কথাটা বলে দিলেন। আজ মাঝরাতে যে কালুর আসবার কথা আছে, তাও বললেন।

তারা মন দিয়ে সব শুনল, তারপর বলল, এসব হাঙ্গামা না করলেই তো ভাল ছিল বাবা।

হাঙ্গামা! মেয়ের কথা শুনে রাজনারায়ণ অবাক্ হয়ে গেলেন।

মিছামিছি হয়তো কতকগুলো প্রাণহানি হবে, তার চেয়ে কালু সর্দার যা চাইছে সেটা তাকে দিয়ে দিলেই হত। অলংকার আর অর্থ।

রাজনারায়ণ একবার তারার দিকে দেখেই অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। তারা এমনই মেয়ে। সাজসজ্জার দিকে কোনদিন ঝোঁক নেই। টাকাপয়সা সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নয়। মায়ের পূজা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। পালপার্বণে উৎসবে কোমর বেঁধে প্রজাদের সেবায় মাতে।

দশ বছরের মেয়ে হলে হবে কি, চালচলনে আধবুড়ীদের মতন। ধর্মের কথা শুনতে খুব ভালবাসে। তার মুখেই এমন কথা শোভা পায়।

রাজনারায়ণ আর কিছু বললেন না। দুটো হাত পিছনে রেখে পায়চারি করতে লাগলেন। তারা আস্তে আস্তে সরে গেল বাপের সামনে থেকে।

বিকালবেলা মহামায়া এসে দাঁড়াল। বিবর্ণ, পাংশু মুখ।

NOT FOR SALE

আমরা কি চোরাকুঠুরির মধ্যে চলে যাব?

রাজনারায়ণ একটু খুশীই ছিলেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব পাকা হয়েছে। কালু সর্দার আর তার দল বিশেষ কিছু করতে পারবে এমন ভরসা কম।

জমিদারবাড়ির এলাকা লাঠিয়ালে ঘিরে ফেলেছে। প্রচুর মশালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরকার হলে সব কটা জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

রাজনারায়ণ গাদা বন্দুক হাতে সারারাত বারান্দায় পাহারা দেবেন। সঙ্গে নায়েবও থাকবে।

স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে বললেন, চোরাকুঠুরিতে এখন আশ্রয় নেবার কোন দরকার নেই। সেরকম অবস্থা হলে আমি তোমাকে বলব। তুমি আর তারা পরিচারিকাদের নিয়ে শোবার ঘরে থেক। সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিও। চিৎকার গোলমাল যদি কিছু শোন, খবরদার বাইরে এস না।

মহামায়া ঘাড় নেড়ে ভিতরে চলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে সারা জমিদারবাড়িতে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এল। একটা ছুঁচ পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যায়। মানুষের নিশ্বাসের আওয়াজও যেন থেমে গেল।

রাত বাড়ল। প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক শোনা গেল। দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেল।

ঠিক যে মুহূর্তে বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে রাজনারায়ণ ভাবলেন, এই প্রথম বোধ হয় কালু সর্দার কথা রাখতে পারল না, তখনই পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে উঠল। একটানা অনেকগুলো লোকের চিৎকার ছাপিয়ে হুংকার শোনা গেল, 'বাশুলী মায়ীকি জয়!'

রাজনারায়ণ বন্দুক হাতে টান হয়ে দাঁড়ালেন। পাশে নায়েব দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্ততঃ দেখতে লাগল।

নীচে পাইকদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা। সবাই ফটকের কাছে এসে জড় হল।

একটু পরেই কে একজন খবর আনল, কালু সর্দারের দল নায়েবের ঘরে আগুন লাগিয়ে লুঠপাট শুরু করেছে।

NOT FOR SALE

নায়েব ব্যাকুলকণ্ঠে চিৎকার আরম্ভ করল, বাঁচান হুজুর, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার মেয়ে জামাই কাল রাতে এসেছে। গয়নাগাটি তো রয়েইছে, তাছাড়া কালু সর্দারের কাছে প্রাণের কোন দাম নেই। এতক্ষণে বোধ হয় সব শেষ করে দিল।

নায়েব দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল। পিছন পিছন রাজনারায়ণ।

নামতে নামতেই রাজনারায়ণ ভাবতে লাগলেন, সবটাই কালু সর্দারের চালাকি। জমিদারবাড়ি আক্রমণ করার ভয় দেখিয়ে নায়েববাড়ি চড়াও হয়েছে। লোকলশকর সব জমিদারবাড়িতে, নায়েবের বাড়ি একেবারে অরক্ষিত। কালু সর্দার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায়।

রাজনারায়ণের নির্দেশে পাইকের দল মশাল জ্বালিয়ে নায়েবের বাড়ির দিকে ছুটে গেল। আগে আগে নায়েব পাগলের মতন দু হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দৌড়তে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে উত্তেজনার মুখে কেউ লক্ষ্য করল না, ঝাঁকড়া আমগাছের যে ডালগুলো জমিদারবাড়ির ছাদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, সেই ডালগুলো বেয়ে কালো কালো কয়েকটা মূর্তি টুপটুপ করে ছাদের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

রাজনারায়ণ নায়েবের বাড়ির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ছাদের ওপর উঠলেন। মনে হল আগুন অনেকটা স্তিমিত, হল্লার শব্দও যেন কিছুটা কম।

তিনি যখন দূরের আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন, তখন লক্ষ্য করলেন না, যে একদল মুখোশ-আঁটা মানুষ নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

যদিও মহামায়াকে নিষেধ করা হয়েছিল, হাজার গোলমালের আওয়াজেও সে যেন ঘর ছেড়ে না বের হয়, কিন্তু আর সে কৌতূহল দমন করতে পারল না।

পা টিপে টিপে চৌকাঠের কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দেয়ালে লাগানো তৈলচিত্রটা ঠেলে কারা যেন চোরাসিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আধ-অন্ধকারে মহামায়া তাদের ঠিক চিনতে পারল না।

চিৎকার করতে গেল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন স্বর বের হল না। একটু পরেই দেখল লোকগুলো আবার তৈলচিত্র খুলে বেরিয়ে আসছে। মনে হল একজনের বগলে যেন ক্যাশবাক্সের মতন কি একটা রয়েছে।

NOT FOR SALE

এবার প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে মহামায়া চেঁচিয়ে উঠল। কে?

কোন উত্তর নেই।

কে তোমরা? আবার মহামায়া চিৎকার করল।

ছায়ামূর্তিগুলো নক্ষত্রবেগে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

এবার মহামায়া বেশ বুঝতে পারল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। ক্যাশবাক্স নিয়ে দুর্বৃত্তরা সরে পড়ার চেষ্টা করছে।

মহামায়া সাহস করে ছাদের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল। যতটা সম্ভব উচ্চকণ্ঠে চেঁচাতে লাগল, ডাকাত পড়েছে, ডাকাত।

মহামায়ার চিৎকার এইবার ছাদে দাঁড়ানো রাজনারায়ণের কানে গেল। তিনি ছুটে নামতে লাগলেন। কি হল? কি হল?

মহামায়ার আর চিৎকার করার শক্তি নেই। সেইখানেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

ইচ্ছা করেই সেদিন সব বাতিদানে আলো দেওয়া হয়নি। যাতে কেউ আক্রমণ করলে কোথায় কোন্ ঘর তার হদিস না পায়।

অন্ধকার রাত। তবু সেই অন্ধকারে মহামায়ার সাদা শাড়ির কিছুটা রাজনারায়ণের চোখে পড়ল। কে, মহামায়া?

মহামায়ার কণ্ঠ আর একজনও শুনতে পেয়েছিল। সে ভৈরব। মশাল হাতে ভৈরব ছুটে ওপরে চলে এল।

সেই মশালের আলোতেই রাজনারায়ণ দেখতে পেলেন, তৈলচিত্রটি সরানো। চোরাকুঠুরির দরজা একেবারে খোলা।

দুই

সর্বনাশ, চোরাকুঠুরির দরজা খোলা।

সব ভুলে রাজনারায়ণ চেঁচিয়ে উঠলেন, তারপর উন্মত্তের মতন টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

অল্প কয়েকক্ষণ, তারপরই রাজনারায়ণ আবার ছুটে ওপরে উঠে এলেন। উস্কখুস্ক চুল, আরক্ত চোখ, সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে।

NOT FOR SALE

আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভৈরব, চোরাকুঠুরি থেকে ক্যাশবাক্স নিখোঁজ। কালু সর্দার আমার সর্বনাশ করেছে।

ভৈরব আর দাঁড়াল না। হুংকার দিয়ে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে নীচে নেমে গেল। কয়েকজন পাইক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওপরের ঘরের চিৎকারের অর্থ তার ঠিক বুঝতে পারেনি। একটু শব্দ নেই, বাইরের কোন মানুষ ভিতরে ঢোকেনি, অথচ কিসের এত গোলমাল? হুজুর এভাবে চিৎকার করছেন কেন?

রাজনারায়ণ ছুটে নিজের শোবার ঘরে এলেন। উদ্দেশ্য চাবি দিয়ে লোহার আলমারি খুলে দেখবেন, যাত্রার দলের মেকী গহনাগুলো ঠিক আছে কিনা। উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি ভুলে গেলেন যে চাবিবন্ধ অবস্থায় ভিতরের জিনিস চুরি যেতে পারে না। কিংবা এও হতে পারে, তিনি ভেবেছিলেন, কালু সর্দারের অসাধ্য কিছু নেই।

কিন্তু আলমারি আর খুলতে হল না, চাবি দিয়ে নীচু হতেই আর্তনাদ করে ছিটকে মেঝের ওপর পড়ে গেলেন।

মহামায়া রাজনারায়ণের পিছন পিছন চৌকাঠ পর্যন্ত এসেছিল, স্বামীকে ওভাবে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়তে দেখে উচ্চরোলে কেঁদে উঠল।

পরিচারিকারা এতক্ষণ ঘরের মধ্যে জড় হয়ে বসে মা কালীর নাম জপ করছিল, মহামায়ার কান্না কানে যেতে আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না।

প্রথমে বিরজা, পিছন পিছন অন্য পরিচারিকারা ছুটে এল।

ঠিক আলমারির সামনে রাজনারায়ণ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। পিঠের মাঝখানে একটা তীর। সারা পিঠ রক্তাক্ত। তীরের পিছনে সাদা একটা কাগজ।

পাশে মহামায়া মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে।

সিঁড়িতে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। কলরবও শোনা গেল।

বিরজা এগিয়ে দেখল, নায়েব ওপরে উঠছে। পিছনে কিছু পাইক।

সর্বনাশ হয়েছে নায়েবমশাই। বিরজা কেঁদে উঠল।

কি, কি হয়েছে?

নায়েব ওপরে উঠে এল।

NOT FOR SALE

বিরজা কিছু বলল না। আঙুল দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখাল।

উঁকি দিয়ে দেখেই নায়েব আর্তস্বরে বলে উঠল, একি!

নায়েব ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাইকরাও ঢুকছিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে মহামায়া পড়ে আছে দেখে তারা চৌকাঠের ওপারে থমকে দাঁড়াল।

সাবধানে তীরটা রাজনারায়ণের পিঠ থেকে তুলতে তুলতে নায়েব বলল, তোমাদের একজন শীগ্‌গির গিয়ে কবিরাজমশাইকে ডেকে নিয়ে এস। এখনই যাও, একটু দেরি কর না।

তীরটা তুলতেই রাজনারায়ণের পিঠের ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল অবিরামধারায়।

নায়েব একটা হাত রাজনারায়ণের নাকের তলায় রাখল। নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করার জন্য।

তার মুখে চোখে হতাশার ভাব ফুটে উঠল। তারপরই দৃষ্টি পড়ল তীরের ডগার দিকে।

মনে হল একটা চিঠি। লাল কালিতে লেখা। চিঠির কোণের দিকে চোখ যেতেই নায়েব শিউরে উঠল। একটা রক্তাক্ত খাঁড়ার ছবি।

চিঠিটা খুলে নায়েব পড়তে আরম্ভ করল। একমনে।

খুব ছোট চিঠি। লাইন চারেকের।

সবিনয় নিবেদন,

বাশুলী মায়ের পূজার জন্য সামান্য উপকরণ চাহিয়াছিলাম, আপনি আপনার আচরণে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মায়ের পূজায় কোন রকম সাহায্য করিতে আপনি অসম্মত। শুধু তাহাই নহে, আপনি আমাদের ভুলাইবার জন্য আসল স্বর্ণালংকারের পরিবর্তে মেকী অলংকার আলমারিতে রাখিয়া দিয়াছেন। যদি সরলতাবশতঃ আমরা ওই মেকী অলংকার মায়ের সম্মুখে নিবেদন করিতাম তাহা হইলে আমাদের সকলকে নরকস্থ হইতে হইত।

মায়ের রোষবহ্নি বিষমুখ তীরের আকার লইয়া আপনার প্রাণহরণ করিল। আপনার কৃতকর্মের ফল আপনি ভোগ করিলেন। আমি নিমিত্ত মাত্র।

ইতি

বিনীত

মায়ের একান্ত সেবক—কালু।

NOT FOR SALE

চিঠিটা পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনারায়ণের দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠেই একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

পরিচারিকারা কেউ মহামায়ার মুখে জলের ঝাপটা কেউ তাকে বাতাস করতে ব্যস্ত ছিল, রাজনারায়ণের শেষ অবস্থা কেউই লক্ষ্য করল না। আধঅন্ধকারে দেখলেও বিপদের গভীরতা হয়তো উপলব্ধি করতে পারত না।

নায়েব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারল, আর কিছু করার নেই। রাজনারায়ণ সকল চিকিৎসার বাইরে।

দুটো হাত বুকের কাছে জড় করে ভগ্নকণ্ঠে নায়েব বলল, তারা কোথায়? তারা?

নায়েব ভেবেছিল রাজনারায়ণের মৃতদেহের কাছে তারার থাকা দরকার। মহামায়ার যা অবস্থা। তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত। নয়তো, এই চরম দুঃসংবাদ তার কানে গেলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। চেতনা হলেও আবার মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

বিরজা উঠে দাঁড়াল। নায়েবের দিকে ফিরে বলল।

আমাদের সঙ্গে তারা দিদিমণি ওই ঘরেই তো ছিল। চুপচাপ বসে ছিল। ঘরের মধ্যেই আছে।

জমিদারের নায়েবকে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়। অনেক ঝড়ঝাপটা তাকে নিতে হয় মাথা পেতে। নায়েব এগিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল।

তারা, তারা।

কোন উত্তর নেই।

হঠাৎ ভিতরবাড়িতে ঢোকা সমীচীন হবে না। এত গোলমালে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে এমন অসম্ভব কল্পনা কেউ করবে না।

তবে কি মহামায়ার মতন তারাও ভয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে।

নায়েব সরে এসে বিরজাকে ডাকল, বিরজা।

বিরজা মহামায়ার কাছ থেকে উঠে নায়েবের সামনে এসে দাঁড়াল।

নায়েব বলল।

দেখ তো, তারাকে ডাকছি, সাড়া পাচ্ছি না। তারা কোথায় গেল?

NOT FOR SALE

বিরজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সেই সময় ভৈরবও এসে দাঁড়াল। তার এক হাতে জ্বলন্ত মশাল।

মশালের আলোয় অনেকটা জায়গা পরিষ্কার দেখা গেল।

সর্বনাশ হয়েছে নায়েবমশাই, চোরাকুঠুরিতে ক্যাশবাক্স নেই। জমিদারবাবু কোথায়, হুজুরকে এই সর্বনাশের খবরটা দিয়ে আসি।

নায়েব হাত তুলে বারণ করল। একটু দাঁড়াও ভৈরব। অনেক কথা আছে।

ক্যাশবাক্সের কথা রাজনারায়ণ ভৈরবকে বলেছিলেন। চোরাকুঠুরি সতর্কভাবে পাহারা দেওয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বিরজা পাংশুমুখে বেরিয়ে এল। তারা তো ঘরের মধ্যে নেই।

নায়েবের দুটো পাই টলমল করে কাঁপতে লাগল। দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ শুনে শুনে তার উন্মাদ হবার যোগাড়।

ভৈরবকে ডেকে বলল। ভৈরব, তুমি তারা দিদিমণিকে আগে খুঁজে দেখ। সে নিশ্চয় মন্দিরে গেছে।

নায়েবের অনুমান ঠিক। কিন্তু ভৈরব একটু দেরি করে ফেলল।

তারা গোলমাল শুনেই আস্তে আস্তে সকলের অলক্ষ্যে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। দুটো হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করে কালীমূর্তির সামনে বসে ছিল। তারপর কোলাহল একটু কমতে দেয়ালে টাঙানো কালীর একটা পট বুকের মধ্যে চেপে ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

ছোট বাগান। বেশীর ভাগই ফুলের গাছ। এই বাগানটুকু পার হতে পারলেই অন্তঃপুরে যাবার সিঁড়ি।

তারা সেই দিক লক্ষ্য করেই এগোচ্ছিল।

হঠাৎ গন্ধরাজের ঝোপটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। তারার মনে হল লোহার মতন শক্ত একটা হাত এসে তার মুখ চেপে ধরল, তারপর অবলীলাক্রমে তাকে কাঁধে ফেলে সেই দৈত্যাকার শক্তি ছুটতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ তারার চেতনা ছিল, তার মধ্যেই সে কঠিন হাতে লোকটার চুলের গোছা চেপে ধরেছিল, তারপর একটু একটু করে চেতনা বিলুপ্ত হতে, তার মুঠি আলগা হয়ে এল।

NOT FOR SALE

খুব অস্পষ্ট ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। গালে একটা মানুষের উত্তপ্ত নিশ্বাস, মাঝে মাঝে ঘামের ধারাও ঝরে পড়ল।

তারপর তারার আর কিছু মনে নেই।

যখন তারার জ্ঞান হল তখন ভোর হয়ে আসছে।

সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, দেহে রীতিমত উত্তাপ। তারা চোখ মেলেই চমকে উঠল।

অজগর বন। চার কোণে চারটে মশাল পোঁতা। দু একটা পাখির কাকলির জন্য বোঝা যাচ্ছে ভোর হয়েছে, তা না হলে অরণ্যে এখনও গভীর অন্ধকার।

মাঝখানে মাটির একটা বেদী। তার ওপর দীর্ঘ সবল একটি লোক বসে। তার দু'পাশে বর্শাধারী দু'জন শরীররক্ষী। ইতস্ততঃ আরো অনেকে জটলা করছে।

ঘাসের শয্যা। তার ওপর মাদুর পাতা। খড়ের বালিশ।

তারা উঠে বসল। কালীর পট তখনও তার বুকে ঝুলছে। পটটা সে হারের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিল।

তারা বেদীর ওপর বসা লোকটার দিকে একবার দেখল তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কে তোমরা? কেন আমাকে এখানে এভাবে ধরে এনেছ?

লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তারার আপাদমস্তক দেখল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার অনুচর তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে মা! তার জন্য আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

তারা আশ্চর্য হয়ে গেল।

এরা যে ডাকাত, এটা যে ডাকাতের আস্তানা সেটা বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ডাকাতের কাছ থেকে এমন কোমল কণ্ঠস্বর সে প্রত্যাশা করেনি।

আমি বাড়ি যাব। তারা উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের লোকটিও দাঁড়িয়ে উঠল। বলল।

মা, তোমার শরীর এখনও ক্লান্ত। এতটা পথ ঘোড়ার পিঠে যাওয়াও তোমার পক্ষে কষ্টকর। তুমি বিশ্রাম কর। কিছু আহার কর। আমি কালু

NOT FOR SALE

সর্দার, আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যেখানে বলবে, আমি নিজে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেব।

এই কালু সর্দার? সারা বাংলার ত্রাস? যার নামে কোম্পানি পর্যন্ত বিচলিত হয়?

তারার বয়স দশ বছর কিন্তু বয়সের অনুপাতে তার বুদ্ধি অনেক প্রখর। সে বুঝতে পারল, যেমন করেই হোক এদের এলাকা থেকে সরে না গেলে নিস্তার নেই।

তাই সে বলল। তোমাদের এখানে কিছু খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চুরির জিনিস স্পর্শ করলেও পাপ হয়। তুমি এখনই আমাকে নিয়ে চল।

পলকের জন্য কালুর দুটি চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, তারপরই সে সংযত করল নিজেকে। মুখে হাসি ফুটিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, এখানকার গাছে অজস্র ফল আছে। এ গাছ কারো সম্পত্তি নয়। তুমি নিজে ফল পেড়ে না হয় আহার কর। তাতে আশা করি তোমাকে পাপ স্পর্শ করবে না।

না, তারা মাথা নাড়ল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, আমি একদণ্ড এখানে থাকব না। এখনই আমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

বেশ। কালু এগিয়ে এসে সজোরে হাততালি দিল।

দু'জন সশস্ত্র অনুচর এসে সামনে দাঁড়াল।

কালু নীচুগলায় তাদের কি বলল, তারপর তারার দিকে চেয়ে বলল, এস মা।

একটু দূরে একটা বটগাছের ডালে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। তার কাছে এসে কালু বলল, ছোট ঘোড়া, তোমার উঠতে কোন অসুবিধা হবে না। আমি তোমার পাশে পাশেই রইলাম। কোন ভয় নেই।

ভয় যে তারার একেবারে হয়নি, তা নয়, কিন্তু কালুর সামনে কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করল না।

বটগাছের নীচু ডালে পা রেখে আস্তে আস্তে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল। শক্তহাতে লাগাম ধরতেই ঘোড়াটা ঠুকঠুক করে এগিয়ে চলল। পাশে পাশে কালু সর্দার।

তোমার সঙ্গে আমার একজায়গায় কিন্তু খুব মিল আছে তারা। কালু সর্দার বলল।

NOT FOR SALE

বিস্মিত তারা প্রশ্ন করল। তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

কালু হাসল, বলল, তুমি আমি দুজনেই মা কালীর ভক্ত।

তারা ভ্রূকুঞ্চিত করে কালুর দিকে চেয়ে বলল।

আমি তোমার মতন নিরীহ মানুষদের ওপর অত্যাচার করি না। খুন করি না তাদের।

কালু একটু বিচলিত হল। সব ঘটনাটা মনে মনে একবার স্মরণ করার চেষ্টা করল।

কালু যখন পাতার আড়ালে আমগাছের ডালে তীর নিক্ষেপ করার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখনই লক্ষ্য করেছে, তারা ছুটে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তারপর রাজনারায়ণের দেহে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে অন্ধকারের সুযোগে মন্দিরের সামনে দিয়ে কালু যখন দৌড়ে পালাচ্ছিল, তখনও লক্ষ্য করেছে মন্দিরের দরজা বন্ধ।

তার অনেক পরে অনুচর ফটিক তারাকে হরণ করে নিয়ে এসেছে। তার জন্য ফটিককে অবশ্য শাস্তিও পেতে হয়েছে।

চাবুকের ঘায়ে তার সর্বশরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। অন্ততঃ সাত দিন সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

নারী, শিশু, গাভীকে স্পর্শ করা বা আঘাত করা কালু সর্দারের নিষেধ।

তারার কথার কালু কোন উত্তর দিল না। ঘোড়ার পাশে পাশে চলতে লাগল।

পায়ে-চলা পথ। মাঝে মাঝে গাছপালার জন্য তারাকে মাথা নীচু করতে হল। যাতে গাছের ডাল মাথায় না লেগে যায়।

একেবারে বনের প্রান্তে এসে কালু থামল। তারাকেও থামাল।

বলল, আমি আর জঙ্গলের বাইরে যাব না। তুমি চলে যাও। একটু গিয়েই একটা দোকান পাবে, সেখানে আমার লোক থাকবে। যদি আমার লোক না পৌঁছে থাকে, তুমি একটু অপেক্ষা কর। লোক দু'জন পৌঁছে যাবে।

তারা খুব সাবধানে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। কালু ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে রইল।

তারা বন থেকে বেরিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

NOT FOR SALE

পরিশ্রমে আর মানসিক দুশ্চিন্তায় তারার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে খুব ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল।

যেখানে বন শেষ হয়েছে সেখানেই একটা মুদীর দোকান। দোকানে কোন লোক নেই, শুধু মুদী বসে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

তারা গিয়ে সামনের বেঞ্চে বসল।

মুদী হাতপাখা থামিয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখল।

জমিদারের মেয়েকে তার দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ পালপার্বণ ছাড়া তারা কোনদিনই প্রজাদের সামনে আসেনি। মুদী অন্ততঃ তাকে কোনদিন দেখেনি।

তবে তারাকে জঙ্গল থেকে এভাবে বের হতে দেখেই অবাক্ হল বেশী। তারা যে বড়ঘরের মেয়ে সেটা বুঝতে তার দেরি হল না। এত বড় বাড়ির মেয়ে এভাবে পথেঘাটে বের হয় না।

মুদী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে তারাই বলল। একটু জল খাব।

মুদী শশব্যস্ত হয়ে মাটির গেলাসে জল আর শালপাতায় দুটো বাতাসা দিল।

তারা বাতাসা ছুঁল না, ঢকঢক করে জল খেল।

তুমি কোথায় যাচ্ছ মা? এলেই বা কোথা থেকে?

মুদীর কথার উত্তর দিতে গিয়েই তারা থেমে গেল।

গৌর হে, কৃপা কর! মৃদু খঞ্জনির শব্দ। মুখে গান।

তারা পিছন ফিরে দেখল, দুটি বৈষ্ণব এসে দাঁড়িয়েছে। নাকে তিলক, কপালে ফোঁটা, গায়ে নামাবলী। একজনের হাতে খঞ্জনি, আর একজনের গলায় ঝোলানো মৃদঙ্গ।

কই হে, গৌরাঙ্গের সেবার জন্য কিছু দাও।

মুদী হাতপাখা রেখে উঠে পড়ল। পাশের দরমার দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

মুদী সরে যেতেই, একজন বৈষ্ণব তারার কাছে এসে দাঁড়াল।

মৃদুকণ্ঠে বলল, আমরা কালু সর্দারের লোক। চল, তোমাকে জমিদারবাড়ি রেখে আসি। সর্দার তাই বলে দিয়েছে।

NOT FOR SALE

তারা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ দু'জনের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর উঠে দাঁড়াল।

আর একজন বৈষ্ণব বলল, দাঁড়াও, মুদীর কাছে থেকে ভিক্ষাটা নিই আগে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই মুদী একটা মাটির সরায় চাল, আলু আর পটল নিয়ে এসে দাঁড়াল।

কই, এস বাছা, এগিয়ে এস।

একজন বৈষ্ণব থলির মধ্যে ভিক্ষার জিনিসগুলো নিল। তারপর তারার দিকে চেয়ে বলল, তুমিও তো জমিদারবাড়ির দিকে যাবে বলছিলে? চল তাহলে।

তারা উঠে দাঁড়াল। বৈষ্ণব দু'জন আগে আগে, একটু ব্যবধান রেখে তারা তাদের অনুসরণ করল।

তিন

জমিদারবাড়ির কাছাকাছি যখন তিনজনে এসে পৌঁছল, তখন রোদ বেশ চড়া। ফটকের সামনে নায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাছে দাঁড়িয়ে জমিদারবাড়ির পুরোহিত পঞ্চানন তর্কতীর্থ।

একটা ঝাঁকড়া বটগাছের নীচে বৈষ্ণব দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারাকে বলল, যাও, তুমি চলে যাও। আমরা আর এগোব না। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তুমি ফটকের মধ্যে ঢুকলে আমরা ফিরে যাব। সর্দারের তাই নির্দেশ।

তারা কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতন মনের অবস্থা তার ছিল না। সে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

নায়েবের কাছাকাছি যেতেই নায়েব চমকে উঠল। মানুষ ভূত দেখে যেমন চমকায়, ঠিক তেমনই। আমি এসেছি নায়েবকাকা।

NOT FOR SALE

নায়েব তারার কথার কোন উত্তর দিল না। ফিসফিস করে পুরোহিতের সঙ্গে কি আলোচনা করল, তারপর তারা আর একটু এগোতেই দুটো হাত প্রসারিত করে তাকে বাধা দিল। তারা, দাঁড়াও।

তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তোমাকে ডাকাতরা হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি তো এ বাড়িতে আর ঢুকতে পারবে না। তোমাকে বাড়িতে স্থান দিলে আমরা সবাই সমাজে পতিত হব।

এমন কথা তারা আশাও করেনি। সব ভুলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তাহলে আমি কোথায় যাব নায়েবকাকা? তাছাড়া আমাকে যে ডাকাতে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সে কি আমার দোষ? এত পাইক বরকন্দাজ রেখেও তো তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারলে না।

নায়েব এসব কথার কোন উত্তর দিল না। হয়তো এসব কথার উত্তর তার জানা নেই। একটু পিছিয়ে লোহার ফটকটা সজোরে বন্ধ করে দিল।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে এবার তারা বেশ জোরেই কেঁদে উঠল।

তোমার পায়ে পড়ি নায়েবকাকা, আমাকে ঢুকতে দাও। নইলে পথে পথে আমি কোথায় ঘুরে বেড়াব? কে আমায় আশ্রয় দেবে? আমি বাবা আর মার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

এবার পুরোহিত কথা বলল। রুক্ষ, কর্কশ কণ্ঠস্বর।

জমিদারমশাই ডাকাতদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। তোমার জাত গিয়েছে। এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হতে পারে না।

বাবা নেই?

তারা পথের ধুলার ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল দেখল সামনে কেউ নেই। লোহার কঠিন ফটকটা পথরোধ করে রয়েছে। অনেক দূরে কয়েকজন প্রজা দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতহারানো মেয়ের কাছে আসার সাহস তাদের নেই।

কাপড় দিয়ে তারা ঘষে ঘষে চোখের জল মুছে ফেলল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখল। সব জানলা দরজা বন্ধ। কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন নেই।

NOT FOR SALE

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মনে মনে বিড়বিড় করে তারা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর জোরে জোরে পা ফেলে যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকেই চলতে শুরু করল।

কোথায় চলেছে তা সে নিজেই জানে না। বার বার চোখের জলে সামনের পথ ঝাপসা হয়ে গেল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে চলার গতি আরো দ্রুত করল। কোন কিছু চিন্তা করার শক্তি তার নেই, শুধু এইটুকু বুঝতে পারল, নিজের গাঁয়ে, নিজের বাড়িতে তার স্থান নেই। সম্পূর্ণ বিনাদোষে।

তারা। তারা। তারা চমকে ফিরে দেখল।

বটগাছের তলায় সেই বৈষ্ণব দু'জন তখনও বসে রয়েছে। তাদের একজন তারাকে ডাকছে।

তারা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এখন কোথায় যাবে?

জানি না।

তারা মাথা হেঁট করল।

বৈষ্ণব দু'জন উঠে দাঁড়াল। চল, আমাদের সঙ্গে।

কোথায়?

সর্দারের কাছে। ভ্রূ কুঁচকে তারা চেয়ে রইল।

এমন যে হবে সর্দার জানত। সেইজন্যই আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছিল। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

তারা কোন প্রতিবাদ করল না। বুঝল প্রতিবাদ করে লাভ নেই। এ গাঁয়ে কেউ তাকে আশ্রয় দেবে না। দেখাই যাক ডাকাতের সর্দার কি বলে। কি ব্যবস্থা করে তার জন্য।

জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দেখল একটা পাকুড়গাছের নীচু ডালে একটা ঘোড়া বাঁধা। যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা জঙ্গলের বাইরে এসেছিল, সেই ঘোড়া।

তার মানে, তারার ফেরার সমস্ত বন্দোবস্ত সর্দার করে রেখেছে।

ঘোড়ায় চড়তে গিয়েই কথাটা তারার মনে পড়ে গেল। সে সরে দাঁড়িয়ে বলল, না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।

NOT FOR SALE

কেন?

তোমরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ। পিতৃহন্তার আশ্রয়ে আমার প্রয়োজন নেই।

ততক্ষণে বৈষ্ণব দু'জন তাদের ফোঁটা তিলক মুছে ফেলেছে। পোশাক বদলেছে। ডাকাতের অনুচর বলে এবার চেনা যাচ্ছে।

একজন গম্ভীরকণ্ঠে বলল।

সব কথা সর্দারের কাছে শুনতে পাবে। চল।

তারার আর কোন কথা বলার সাহস হল না। আস্তে আস্তে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল।

পথে একটিও কথা হল না। কথা বলার ইচ্ছাও তারার হল না। সারাক্ষণ কেবল বাপের মুখ মনের মধ্যে ভাসতে লাগল। মার অসহায় অবস্থা।

অনেকক্ষণ পর ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে যখন তারার দুটো চোখ বুজে এসেছে তখন শাঁখ ঘণ্টার আওয়াজে সে সোজা হয়ে বসল।

ঘোড়ার দু'পাশে দু'জন অনুচর চলেছে।

তারা জিজ্ঞাসা করল, কি হচ্ছে?

মার পূজো।

একটু এগিয়ে তারাকে ঘোড়া থেকে নামানো হল।

সামনেই মন্দির। শাঁখ ঘণ্টার শব্দ সেখান থেকেই আসছে।

মন্দিরের চাতালে গিয়ে তারা দাঁড়াল।

বিরাট বাশুলীমূর্তি। লোলরসনা। হাতে খর্পর।

সামনে রক্তাম্বর পরে কালু সর্দার পূজা করছে। দু'পাশে অনুচররা, কেউ চামর দোলাচ্ছে, কেউ শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাচ্ছে।

দু'হাত জোড় করে প্রণাম করে তারা মন্দিরের চাতালে উঠতে গিয়েই বাধা পেল।

একজন অনুচর সামনে এসে দাঁড়াল।

মন্দিরে যেও না।

কেন?

তুমি অস্নাত। তাছাড়া তোমার এখন অশৌচ।

NOT FOR SALE

অশৌচ কথাটা কানে যেতেই তারার বুকটা আবার যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। আঁচল দিয়ে দুটো চোখ চেপে তারা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

অনুচরের নির্দেশে পুকুরে স্নান সেরে তারা ফলমূল আহার করে নিল। ছোট একটা পর্ণকুটীরে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। শয্যায় শোয়ামাত্র তার চোখে গভীর ঘুম নেমে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তারার খেয়াল নেই, হঠাৎ কানে অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

উঠে বসতে কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট হল। আরো গম্ভীর।

মা, মা।

কুটীরের দরজায় দাঁড়িয়ে কে ডাকছে। কিন্তু তারাকে এমন সম্বোধন কে করবে?

তারা দরজার কাছে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কালু সর্দার দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে রক্তাম্বর। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ। হাতে মোটা লাঠি।

তুমি আমায় ডেকেছ মা। আমি এতক্ষণ পূজায় ব্যস্ত ছিলাম।

কিছুক্ষণ তারা কোন কথা বলতে পারল না। কালু সর্দারকে কখন ডেকেছে মনে করতে লাগল।

মনে করতে করতেই তারার মুখ চোখ আরক্তিম হয়ে উঠল।

বলল, তোমরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ?

মানুষ মানুষকে মারতে পারে না তারা-মা। আমরা উপলক্ষ মাত্র। নিজের অন্যায়ের জন্যই তোমার বাবা নিজের বিপদ্ ডেকে এনেছিলেন। নিজের চরম বিপদ্।

নিজের অন্যায়ের জন্য? তারা বিস্মিত হল।

হ্যাঁ, দেবদেবীর সঙ্গে ছলনা করা পাপ, অন্যায়।

তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারল না।

কালু সর্দারের কণ্ঠ এবার আরও গম্ভীর।

মায়ের পূজার জন্য তোমার বাবার কাছে অর্থ আর অলংকার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। তিনি অর্থ লুকিয়ে ফেলেছিলেন। স্বর্ণালংকার সরিয়ে সেই

NOT FOR SALE

জায়গায় মেকী অলংকার রেখে দেবীকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রবঞ্চনা আর অন্যায়ের শাস্তি মৃত্যু। সেই মৃত্যুই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। যাক মা, আসল কথাটা শোন।

কথাটা বলবার আগে কালু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তারার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল তারপর বলল, তোমার কথা আমি সব শুনেছি। এমন ব্যাপার যে হবে সেটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। হিন্দুসমাজ শুধু বাইরের কাঠামোটা আঁকড়ে ধরে আছে। ভিতরে কোন সারবস্তু নেই। মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, অথচ তাকে বর্জন করতে একটুও দ্বিধা করে না। এ ভালই হয়েছে মা। কালুর মা নেই। আমার একজন মায়ের প্রয়োজন ছিল। সমস্ত রাত পরিশ্রম করে এসে একজনের কাছে বিশ্রাম করার জন্য। তুমি এখানে থাক, আমার মা হয়ে। দেখবে, বাইরের লোক তোমার ছেলের যতটা বদনাম করে, আমি ততটা খারাপ নই।

এরপর কালু এক আশ্চর্য কাণ্ড করল।

লাঠিটা পাশে রেখে তারার পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে তারা বেশ সময় নিল। এত বড় ডাকাত—সারাটা এলাকা যার নামে থরথরিয়ে কাঁপে, সে এভাবে তাকে প্রণাম করল। নিজের লোক বিনা অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ির দরজা থেকে, আর নিঃসম্পর্কীয় এই দস্যু এমনভাবে তাকে নিজের কাছে টেনে নিতে চাইছে।

শুধু আশ্রয় দেওয়া নয়, নিজেকে নিবেদন করছে তার পায়ের তলায়।

কালু সর্দার উঠে দাঁড়াল। লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, এস মা, আজ থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে। মা বেটা একঠাঁই থাকব। আমি যখন তোমার ছেলে, তখন গোটা দলেরই তুমি মা। এস আমার সঙ্গে।

কালু আগে আগে, তারা তাকে অনুসরণ করল।

অরণ্যের আরো অন্ধকারে পাশাপাশি দুটি কুটীর। মাটির দেয়াল। খড়ের চাল।

সেই কুটীরের সামনে এসে কালু থামল।

এই আমার আস্তানা মা। এখন থেকে আমরা দু'জনে এখানে থাকব।

NOT FOR SALE

কুটীরের সামনে দু'জন অনুচর বর্শা হাতে পায়চারি করছিল, কালুকে দেখেই অভিবাদন করে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

আজ থেকে মা আমার কাছে থাকবে। এদিকের এই কুটীরে তার থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

অনুচর দু'জন সেখান থেকে সরে গেল।

কালু তারাকে সঙ্গে নিয়ে এদিকের কুটীরে ঢুকল।

দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা কালীর পট। গোটা দুয়েক জলচৌকি। একটা কাঠের আলনা। এদিকে নীচু তক্তপোশে একটা বিছানা। বিছানার ওপর বাঘের ছাল পাতা।

মা। কালু তারার দিকে ফিরে বলল।

বল। সকাল থেকে আমি অভুক্ত। ওই পাশে আমার খাবার রয়েছে। আসন করে দাও।

তারা আসন পেতে দিল। কোণের মাটির হাঁড়ি থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসে রাখল। এদিক ওদিকে চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল কলাপাতাঢাকা একটা থালা।

সাবধানে থালাটা তুলে তারা আসনের সামনে রাখল।

কলাপাতা সরিয়েই দেখল ফলমূল সাজানো।

তুমি এই অবেলায় শুধু ফলমূল খাবে?

আজ রাত্রে কাজে বের হতে হবে, সেই জন্যই পূজোর এত ঘটা। যে রাতে কাজে বের হই, সেদিন ফলমূল ছাড়া কিছু খাই না।

কালু খেতে বসতেই বাইরে থেকে একটা অনুচর এসে পাখা নেড়ে বাতাস করতে লাগল।

দু এক মুহূর্ত। তারপরই তারা তার হাত থেকে পাখাটা চেয়ে নিল।

পাখাটা আমায় দাও। আমি বাতাস করছি।

অনুচর একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে কালুর দিকে দেখল তারপর কালু ইঙ্গিত করতে পাখাটা তারার হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল।

তারা বাতাস করতে লাগল।

NOT FOR SALE

একটু পরেই কালু বলল, থাক মা, আর বাতাস করার প্রয়োজন নেই। তুমি এমনিতেই আজ ক্লান্ত। যাও, পাশের কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

তারা সত্যিই খুব পরিশ্রান্ত বোধ করছিল। পাখাটা রেখে দিয়ে পাশের কুটীরে চলে গেল।

কুটীরের মধ্যে ঢুকেই অবাক্ হয়ে গেল।

একপাশে তক্তপোশে বিছানা পাতা। আলনায় সার সার নতুন শাড়ি আর শেমিজ। কুটীরের দেয়ালে ছোট একটি কালীর পট। যেটা তারা নিয়ে এসেছিল।

যে অনুচরটি কুটীরের দরজায় পাহারায় ছিল সে তারাকে বলল, তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়। আমি দরজায় রইলাম। আমার নাম দীনু। কোন দরকার হলে আমাকে ডেক।

তারা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভেবেছিল শোবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসবে, কিন্তু ঘুম এল না, পরিবর্তে রাজ্যের চিন্তা এসে তাকে ঘিরে ধরল।

এ কি করছে সে? মা বলে ডেকেছে বলেই পিতৃঘাতীদের দলে মিশে গেছে। তাদের সেবা করছে, তদ্বির-তদারক।

পরমুহূর্তেই মনে হল, এ ছাড়া সে কিই বা করতে পারত। বাবা নেই। থাকলেও সমাজের বিধানের কাছে বাবা অসহায়। তারাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষেও সম্ভব হত না। বাবা নেই, মার অবস্থা তো আরও করুণ। পুরোহিত যে নির্দেশ দেবে সেটা তাকে মানতেই হবে।

জোর করে জমিদারবাড়িতে তারাকে স্থান দিলে প্রজারা ক্ষেপে উঠবে।

কাজেই তারার একমাত্র আশ্রয় এই অরণ্য। নির্ভর অরণ্যের চেয়েও ভয়ংকর এই মানুষের দল। একবার যখন এদের কবলে এসেছে তখন পালাবার পথও বন্ধ। একটু সন্দেহ হলেই এরা রেহাই দেবে না।

কতক্ষণ তারা ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই, দারুণ একটা কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে গেল।

ঠিক কুটীরের বাইরে প্রচণ্ড চিৎকার। বাশুলী মায়িকী জয়।

NOT FOR SALE

তারার বুকটা কেঁপে উঠল। কিছু বলা যায় না। পরিচারিকাদের কাছে শুনেছিল, কালু সর্দার কালীর কাছে নরবলি দেয়। তারাকে এত তোয়াজ করে এখানে রাখার উদ্দেশ্যই হয়তো তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে। মন্দিরের সামনে একজোড়া হাড়িকাঠ সে দেখেছে।

মা। মা।

সব কোলাহল ছাপিয়ে কালুর বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল।

তারা তক্তপোশ থেকে নামল। কুটীরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকলেই যে সে বাঁচতে পারবে এমন ভরসা কম। ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে টানতে টানতে ওকে বের করে নিয়ে যাবে।

দরজার কাছে গিয়েই দেখল বাইরেটা মশালের আলোয় উজ্জ্বল। একটা নয়, অনেকগুলো মশাল জ্বলছে।

সেই আলোতে তারা দেখল দেয়ালে টাঙানো কালীর পট।

পটটা খুলে বুকে চেপে নিল।

মনে পড়ে গেল, গতকাল বিপদের সময় এমনইভাবে কালীর পট বুকে চেপে ধরেছিল, কিন্তু বাঁচতে পারেনি। ডাকাতের হাতে ধরা পড়েছিল।

তা পরুক, তবু বিপদের সময় মায়ের সান্নিধ্য সে ছাড়তে পারবে না। যদি মৃত্যু আসে, যদি এরা তাকে টেনে নিয়ে মায়ের মন্দিরে বলি দেয়, তাহলে কালীর এই পট বুকে জড়িয়েই সে মরবে।

মা, মা। আবার কালু সর্দারের কণ্ঠ। এবার আরো উদ্বিগ্ন।

তারা বুঝতে পারল সে বাইরে না এলে কালুই ভিতরে ঢুকবে।

কালীর নাম জপ করতে করতে তারা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অনেক মশালের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল তারাকে। উষ্কখুষ্ক চুল বাতাসে উড়ছে। বিস্ফারিত দুটি চোখ। ঠোঁটদুটো থরথরিয়ে কাঁপছে। বুকে দুলছে কালীর পট।

তারা মায়িকী জয়।

প্রথমে কালুর গলা, তারপর পিছনে দাঁড়ানো সমস্ত অনুচর তার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল।

কালু সর্দার হাঁটু মুড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচরবৃন্দ।

NOT FOR SALE

মায়ের কাজে বের হচ্ছি মা। তোমার আশীর্বাদের জন্য এসেছি।

তারার চাঞ্চল্যের অবসান হল। তাহলে এরা তাকে ধরতে আসেনি। কোথায় ডাকাতি করতে যাবে তাই আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছে।

কোথা থেকে কি হল তারা নিজেই জানে না। নিজের ডানহাত প্রসারিত করে সে কালুর মাথার ওপর রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল।

যতক্ষণ না শেষ ডাকাত অরণ্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ তারা চুপচাপ দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় একটু দূরে কোথাও অনেকগুলো ঘোড়া রাখা ছিল, কারণ একটু পরেই সম্মিলিত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।

সব শব্দ মিলিয়ে যেতে তারা চোখ ফেরাল। দেখল বর্শা হাতে অনুচরটি পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

দীনু।

মা।

এরা কোথায় গেল ডাকাতি করতে?

তা তো জানি না মা। সর্দার, আর দু একজন চাঁই ছাড়া কেউ জানে না।

একটু চুপ করে থেকে অনুচর আবার বলল।

তোমার খাবার সময় হলে বলো, খাবার এনে দেব।

কোন উত্তর না দিয়ে তারা কুটীরের মধ্যে ঢুকল। একটু পরেই ছোট একটা ছেলে এসে পিলসুজের প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে জোনাকির ঝাঁক দেখা যাচ্ছে। কুটীরের মধ্যে সামান্য আলো। সেই আলোটিকে সম্বল করে তারা দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসল।

প্রত্যেক রাতে এরা এমনই ডাকাতি করতে বেরিয়ে যাবে। ডাকাতি করতে বেরোনো মানেই একজনের সর্বনাশ করা। মানুষ খুন জখম করবে, টাকা পয়সা লুঠ করবে, তারার মতন এমনই কত লোকের চরম বিপদ্ হবে।

এমন একটা আসন্ন সর্বনাশকে তারা কি করে নির্বিবাদে আশীর্বাদ করল? এতক্ষণ পরে তারার খেয়াল হল, তার বুকে তখনও কালীর পটটা ঝুলছে।

NOT FOR SALE

পটটা তারা আস্তে আস্তে খুলে ফেলল। চোখের সামনে রেখে নিরীক্ষণ করে দেখল। ভীষণদর্শনা মূর্তি নয়, দুটি চোখে যেন প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস।

চার

দিন তিন চার পরে আবার কালু এসে তারার দরজায় দাঁড়াল।

মা।

জানলায় মাথা রেখে তারা চুপচাপ বসেছিল। তার ধারণা ছিল এ অঞ্চলে কেবল বুঝি পুরুষের দলই আছে। মেয়ে সে একলাই। কিন্তু আগের দিন আধবুড়ী একজন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

বলেছে, আমাকে কালু তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে।

তার কথায় তারা একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এখানে কেউ অমনভাবে নাম ধরে ডাকে না। সবাই বলে সর্দার।

আমার কাছে?

হ্যাঁ, আমি তোমার কাছে থাকব। দেখাশোনা করব।

তারার ভাল লেগেছে। তবু কথা বলবার একজন লোক পাওয়া গেল। এভাবে দিনের পর দিন মুখ বুজে থাকতে পারছিল না।

বুড়ীর নাম সুখদা। সে এসেই তারার খুব যত্ন করতে আরম্ভ করেছে। চুলের জট ছাড়িয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। গায়ে খড়ি উঠছিল, ভাল করে তেল মাখিয়ে দিয়েছে। বসে বসে অনেক গল্প করেছে।

সেই সময় বলেছে। সুখদা কালুর মাসী। কালুর যখন মা মারা যায় তখন কালুর বয়স বছর চারেক। ভাল করে কিছু বুঝতেই পারেনি। বাপ যখন গেল, তখন কালু দশ বছরের। অনেক টাকা খাজনা বাকী ছিল, জমিদারের পাইক এসে মড়া আটকাল।

যত জিনিসপত্র টেনে টেনে বের করে উঠানে ফেলে দিল। যে সব লোক দাহ করার জন্য এসে জড় হয়েছিল, তাদের গালাগালি দিয়ে সরিয়ে দিল। কালু চুপচাপ দাওয়ার ওপর বসে দেখছিল। তারপর যখন একজন পাইক পা

NOT FOR SALE

দিয়ে তার বাবার দেহটা নাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, ব্যাটা, সত্যি মরেছে তো, না খাজনার ভয়ে মটকা মেরে পড়ে আছে, তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারেনি।

ঘরের কোণ থেকে লাঠি তুলে নিয়ে পাইকদের এলোপাতাড়ি মারতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু যমদূতের মতন পাইকদের সঙ্গে ওইটুকু ছেলে আর কতক্ষণ লড়বে। আধমরা কালুকে টানতে টানতে পাইকরা জমিদারবাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থামে বেঁধে কি প্রচণ্ড মার। চোখে দেখা যায় না। চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যার দিকে আমিই কোলে করে কালুকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। সারা গায়ে ব্যথা। নড়াচড়া করতে পারে না। ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। বাড়িঘর জমিজমা সব জমিদারের কবলে, তাই কালুকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।

সেরে উঠেই কালু রুখে দাঁড়াল।

আমাকে বলল, দেখ মাসী, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নেবই। জমিদারকে ঠিক অমনি করে গাছে বেঁধে আমি চাবকাব।

তারপর কালু নিখোঁজ। কোথাও তার আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পনেরো বছর পরে এক অন্ধকার রাত্রে কালু যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন সে কালু ডাকাত। তার নামে জমিদাররা থরথর করে কাঁপে।

কালু আমাকে এখানে নিয়ে এসে প্রথমেই মায়ের মন্দিরের সামনের বাজপড়া তালগাছটার কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল, মাসী, এই গাছে পিছমোড়া করে বেঁধে রতনপুরের জমিদারকে আমি চাবুক মেরেছি। দুধ ঘি খাওয়া চেহারা কিনা, তাই সহ্য করতে পারল না। ঘণ্টাখানেক পরেই একেবারে খতম হয়ে গেল।

চুপ করে রইলাম। রতনপুরের জমিদারের দেহ জমিদারবাড়ির ফটকের সামনে পাওয়া গিয়েছিল, সে কথা জানি। কার কাজ তাও সবাই জানতে পেরেছিল, কারণ জমিদারের কপালে খাঁড়ার চিহ্ন আঁকা ছিল। তখন কি আর আমি জানি, সেটা আমাদের কালুর কীর্তি।

দু গালে দুটো হাত রেখে তারা চুপচাপ বসে বসে শুনেছে। সব ব্যাপারের একটা কারণ থাকে, একটা ইতিহাস।

NOT FOR SALE

আজ জমিদারদের ওপর, বড়লোকদের ওপর কালুসর্দারের এই যে ঘৃণা আর আক্রোশ তার কারণ তারা জানতে পারল, বুঝতে পারল।

কালুসর্দারের গলার স্বর কানে যেতেই তারা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মাসী কই?

স্নান করতে গেছে।

কথা বলতে বলতেই মাসী ভিজে কাপড়ে এসে ঢুকল।

এই যে মাসী, তুমি মাকে ভাল করে স্নান করিয়ে মন্দিরে নিয়ে এস। দেরি কর না।

তারা আর থাকতে পারল না। জিজ্ঞাসা করে ফেলল।

কেন? এত সকালে মন্দিরে কেন?

আজ তোমার শুদ্ধি মা। আজ তুমি আমাদের দলের মা হবে।

কথাটা তারা বুঝতে পারল না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। কথাটা বলেই কালু চলে গেছে। খুব দ্রুতপায়ে। তাকে দেখে খুব ব্যস্ত বলে মনে হল।

মাসী তারার হাত ধরে বলল, চল পুকুরঘাটে চল। আমি তেল আর গামছা নিয়ে যাচ্ছি।

স্নান সেরে ফিরে এসে তারা দেখল একটা থালার ওপর লালপাড় গরদের শাড়ি। এক কৌটা সিঁদুর।

শাড়িটা পরে কপালে সিঁদুরের টিপ এঁকে তারা তৈরী হয়ে নিল।

জনা তিন চার লোক তারাকে সঙ্গে করে বিশালাক্ষীর মন্দিরে নিয়ে গেল। মন্দিরের সামনে গিয়েই তারা অবাক্।

সামনের জমিতে ত্রিপল খাটানো হয়েছে। তার নীচে বাজনাদারের দল। এপাশে ওপাশে বহু লোক। বটগাছের তলায় একপাল ছাগল বাঁধা।

তারা যেতেই কালু এগিয়ে এল।

এস মা, আমরা সবাই তোমার অপেক্ষা করছি। ছটায় লগ্ন। তার আগে আমাদের পূজায় বসতে হবে।

তারা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না, কিন্তু প্রতিবাদ করল না। বুঝতে পারল প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাছাড়া সবাই এখন এত ব্যস্ত যে তার প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ও কারো নেই।

NOT FOR SALE

মূর্তির সামনে তারাকে বসানো হল। একপাশে কালু, আর একপাশে পুরোহিত। অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্র পড়া হল। ফাঁকে ফাঁকে বাজনার শব্দ।

পূজা শেষ হতে পুরোহিতকে তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। পুরোহিত তারার কপালে সিঁদুরের রেখা টেনে দিল।

বাইরে সকলে চিৎকার করে উঠল।

তারামায়িকী জয়।

তারাকে নিয়ে কালু মন্দিরের বাইরে এল। চাতালে একটি লোক অপেক্ষা করছিল, তার কাছে এসে কালু বলল, এইখানে একটু বস মা। তোমার ডানহাতটা বাড়িয়ে দাও।

তারা নিজের ডানহাত প্রসারিত করে দিল।

লোকটা নিপুণহাতে তারার কবজির একটু ওপরে সূঁচ ফুটিয়ে একটা খাঁড়া এঁকে দিল। এবার তারার মনে পড়ল, ঠিক এই রকম উলকি সে কালু থেকে শুরু করে তার অনুচরদের হাতেও দেখেছে। এমন কি কালুর মাসীর হাতেও।

উলকির কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচণ্ডবেগে বাজনা বেজে উঠল। রামশিঙা, ঢাক ঢোল কাঁসি।

কালু বলল, মা, এবার থেকে তুমিও আমাদের দলের লোক হলে। আমাদের এক জীবন, এক উদ্দেশ্য।

তারা বিস্ফারিত দুটো চোখের দৃষ্টি কালুর ওপর ন্যস্ত করে বলল, তার মানে, আজ থেকে আমিও ডাকাত হলাম। মানুষ খুন জখম করা আমারও পেশা হল?

কিছুক্ষণ কালু চুপ করে রইল। বোধ হয় কি বলবে মনে মনে তাই ভেবে ঠিক করতে লাগল। তারপর বলল।

অপ্রয়োজনে মানুষকে খুন জখম আমরা করি না মা। প্রজাদের রক্ত শুষে জমিদার যে সম্পদ্ গড়ে তোলে, আমরা তার সেই সম্পদ্ অপহরণ করি। কোম্পানি দেশের লোকের বুক নিংড়ে কর আদায় করে নিজেদের ভোগবিলাসিতার জন্য খরচ করে, নিজেদের দেশে চালান দেয়, সেই অর্থ লুটে নিয়ে আসি। আমাদের এই ন্যায় কাজে যারা বাধা দেয়, তাদের শাস্তিবিধান করতে হয়। তারা মরে, আহত হয়। আমরা মায়ের সেবক। এই

NOT FOR SALE

অর্থ মায়ের পূজায় ব্যয় করি। দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করি। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, আমরা বিলাসীতার জীবন যাপন করি না।

চুপ করে তারা শুনল। কোন উত্তর দিল না। সব কথাগুলো যে বুঝতে পারল এমন নয়। হাতে উলকি পরার সঙ্গে তার সারা শরীরে একটা আতঙ্কের শিহরন বয়ে গেল। ভালমন্দবোধও যেন লোপ পেয়ে গেল।

এবার এদিকে এস মা।

মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে কালু নেমে এল। পিছন পিছন তারা।

মাঠের মাঝখানে যমদূতের মতন একটি লোক দাঁড়িয়ে। ঝাঁকড়া চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। করমচার মতন লাল দুটি চোখ। পরনে খাটো লাল রঙের কাপড়। হাতে তেলচুকচুকে মোটা বাঁশের লাঠি।

এই নিশি ওস্তাদ। তোমাকে লাঠি আর ছোরা খেলা শেখানোর ভার এর ওপর।

এইবার তারা চমকে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা?

হ্যাঁ, মা। তুমি আজ থেকে আমাদের একজন হলে, তাই সবই তোমাকে শিখতে হবে। তীরধনুক আর বন্দুক ছোড়া আমি নিজে তোমায় একসময়ে শিখিয়ে দেব।

এবার নিশি কথা বলল। যেমন চেহারা, তেমনই কণ্ঠস্বর।

বাজখাঁই আওয়াজে বলল, এস লাঠিখেলা দিয়েই শুরু করি।

কালু একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। একটা অনুচর লাঠির গোছা এনে তারার সামনে ফেলে দিল।

নিশি তার মধ্য থেকে বেছে বেছে ছোট মজবুত একটা লাঠি তুলে নিয়ে তারার হাতে দিল।

তারপর শুরু হল লাঠিখেলা শেখানোর আদিপর্ব। তামেচা, বাহেরা, শির।

তারা আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিল। চুলের রাশ বেঁধে নিল। ওস্তাদের নির্দেশক্রমে লাঠি চালাতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টার ওপর কসরত চলল। তারার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। লাল হয়ে উঠল দুটি গাল। ক্লান্ত দুটি পা টলতে লাগল।

NOT FOR SALE

নিশি বলল, থাক মা, আজ এই পর্যন্ত। আবার কাল ভোরে হবে।

হাতের লাঠিটা ছুড়ে ফেলে তারা বসে পড়ল।

ঠিক পিছনেই মাসী দাঁড়িয়ে ছিল।

সে বলল, এবার চল, বেলা হয়েছে, খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম করবে।

মাসীর সঙ্গে কুটিরে ফিরতে গিয়েই তারা অবাক্ হয়ে গেল।

তার যাবার পথের দু পাশে ডাকাতরা সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুটি হাত বুকের ওপর জোড় করা।

তারা তাদের সামনে যেতেই তারা নমস্কার করল। আস্তে আস্তে বলল, সন্তানদের আশীর্বাদ কর মা।

কুটিরে ফিরে তারা মাসীকে জিজ্ঞাসা করল।

আমাকে এরা দলে নিতে চায় কেন বল তো? আমি কি পুরুষমানুষ? এদের মতন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি কি ডাকাতি করতে পারি?

পুরুতমশাই তোমাকে দেখেই বলেছেন, তোমার দেবীঅংশে জন্ম। তুমি যে দলে থাকবে, যাদের সহায় হবে, তাদের কখনও বিনাশ হবে না।

তারা এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

মাসী বলল, তাছাড়া কালু তোমাকে স্বপ্নও দেখেছে।

আমাকে স্বপ্ন দেখেছে?

হ্যাঁ, তোমাকে ধরে নিয়ে আসার ক'দিন আগে বাশুলীদেবী বলেছেন, কালু, ঘটনাচক্রে যে আসবে তাকে যত্ন করবি। সে সাধারণ মানুষ নয়। সে এলে তোর দল অজেয় হয়ে উঠবে। তোর প্রতিপত্তি বাড়বে। তারপরই তুমি এলে।

তারা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

পাঁচ

এর পর থেকে তারার দৈনিক জীবনযাত্রা একেবারে এক নিয়মে চলল। ভোরবেলা উঠে ছোলাভিজানো খেয়ে লাঠি আর ছোরা খেলা শেখা। বিশ্রাম

NOT FOR SALE

করে শরবত আর অন্য কিছু খেয়ে নিয়ে সর্দারের কাছে তীর ছোঁড়া শেখা। তা ছাড়া সাঁতার, গাছে চড়া, দৌড়ানো তো আছেই।

কালু বলে, আমাদের সব কিছু শিখে রাখতে হয় মা। কখন কি অবস্থায় পড়ি কিছুই ঠিক নেই।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম। বিকালে রঘুর কাছে কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া শেখা।

এ ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয়।

একদিন অসময়ে কালু ডেকে পাঠাল। সবে তারা ঘুম থেকে উঠে কুস্তি শিখতে যাবার যোগাড় করছে, অনুচর এসে দাঁড়াল।

মা, সর্দার ডাকছে।

আমাকে?

হ্যাঁ, সর্দার বদনতলার মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারা বেরিয়ে পড়ল। অনুচর সঙ্গে সঙ্গে চলল।

বদনতলার মাঠ বাশুলীর মন্দিরের ঠিক পিছনে। এখানেই তারা দৌড়ানো অভ্যাস করে। সেখানে পৌঁছে তারা দেখল একটা মাটির টিপির ওপর কালু বসে আছে।

তারাকে দেখে বলল, এস মা, এখানে বস।

তারা সর্দারের পাশে গিয়ে বসল। কোথাও কিছু নেই। মাঠ খালি। এখানে চুপচাপ কেন বসে থাকতে হবে তারা বুঝতে পারল না।

হঠাৎ একটা শেয়ালের চিৎকারে তারা চমকে উঠল।

চেয়ে দেখল দু'জন লোক একটা শেয়ালের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

ঠিক সর্দার আর তারার সামনে শেয়ালটাকে নিয়ে এসে একটা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধল। একজন অনুচর শালপাতায় একটা মাংসের টুকরো এনে তারার সামনে ধরল।

নাও, এটা শেয়ালটাকে দিয়ে দাও। খুব কাছে যেও না। শেয়ালটা ক্ষেপে আছে।

খুব সাবধানে এগিয়ে তারা মাংসটা শেয়ালটার সামনে ছুঁড়ে দিল।

NOT FOR SALE

শেয়ালটা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর আর লোভ সামলাতে না পেরে একটু একটু করে মাংসের সামনে এগিয়ে গেল। এদিক ওদিক দেখল, মাংসটা শুঁকল, তারপর একগ্রাসে মাংসটা মুখে পুরে দিল।

মিনিট পাঁচেক, তারপরই আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। ল্যাজটা গুটিয়ে পেটের মধ্যে চলে গেল। চারটে পা প্রসারিত করে মাটি আঁচড়াতে লাগল। জিভটা একদিকে ঝুলে পড়ল। দুঃসহ একটা যন্ত্রণায় শরীরটা কুঁকড়ে গেল। সমানে কাতর চিৎকার করতে লাগল।

শেয়ালটা অমন করছে কেন?

তারা কালুকে জিজ্ঞাসা করল।

কালু কোন উত্তর দিল না। হাত দিয়ে তারাকে থামিয়ে দিল। একটু পরে শুধু বলল, দেখ না মজা।

প্রায় মিনিট কুড়ি আর্তনাদ করতে করতে শেয়ালটা স্থির হয়ে গেল। চার পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। দুটি চোখ বিস্ফারিত।

এইবার কালু উঠে দাঁড়াল।

তারাকে বলল, শেয়ালটাকে মাংসের সঙ্গে সেঁকো বিষ দেওয়া হয়েছিল। মানুষ হলে পাঁচ মিনিটেই সাবাড় হয়ে যেত, কিন্তু শেয়ালের কড়া জান অনেকক্ষণ লড়েছে।

কিছু বুঝতে পারল না তারা। হঠাৎ এভাবে শেয়ালটাকে বিষ দিয়েই বা মারা হল কেন? আর শেয়ালের মৃত্যু দেখবার জন্য তাকেই বা ডেকে আনল কেন কালু সর্দার?

তোমার তো এখন কুস্তি শেখার সময়, তাই না মা?

হ্যাঁ। তারা মাথা নাড়ল।

যাও তাহলে। রঘু অপেক্ষা করছে।

তারা চেয়ে দেখল একটু দূরে একটা তেঁতুলগাছের তলায় রঘু অপেক্ষা করছে।

কুস্তি শেখা শেষ হলে সন্ধ্যার ঝোঁকে তারা রঘুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করল। বিষ দিয়ে শেয়াল মারার কথা।

NOT FOR SALE

গামছা ঘষে ঘষে রঘু শরীর থেকে মাটি তুলছিল, তারার দিকে চেয়ে বলল, ডাকাতের দলে থাকতে হলে মনকে লোহার মতন কঠিন করতে হয় মা। অনেক রকমের যন্ত্রণাকর মৃত্যু আমাদের দেখতে হয়। অনেক সময় এমনও হয়, নিজের দলের লোককে আধমরা অবস্থায় ফেলে আমাদের পালিয়ে আসতে হয়। তাকে তুলে আনবার সুযোগ হয় না। এমনও হয়, বল্লমের খোঁচায় দলের একটা লোক যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাকে সরিয়ে আনতে পারছি না, কিন্তু তাকে যদি কোম্পানির লোক ধরে নিয়ে যায় তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের দলের কথা, আস্তানার কথা জেনে নেবে, তাই পালাবার সময় আমরাই বর্শা দিয়ে কিংবা লাঠির ঘায়ে তাকে খতম করে দিয়ে আসি। যাতে সে আর কথা বলতে না পারে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে তারা উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল।

একটু পরে বলল, কি নিষ্ঠুর তোমরা!

আমরা কিছুই করি না। বাশুলীমাই আমাদের হাত দিয়ে সব কিছু করান। জন্ম মৃত্যু সবই তো মায়ের খেলা। আমরা নিমিত্ত মাত্র। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই সর্দার ওভাবে তোমার সামনে শেয়ালটাকে বিষ দিয়ে মারল।

তারা আর কোন কথা বলল না। সে জানে কথা বলে কোন লাভ নেই। তার ফিরে যাবার পথ যখন বন্ধ, তখন এদের মধ্যেই তাকে থাকতে হবে। এদের কথাতেই সায় দিতে হবে।

মাসের পর মাস ঘুরে বছরও শেষ হয়ে গেল।

লাঠি আর ছোরা খেলায় তারা অসম্ভব উন্নতি করেছে। তীর ধনুকে তার অব্যর্থ লক্ষ্য। ডাকাতদের জীবনের সঙ্গে তার জীবন অনেকটা মিশে গিয়েছে। কালু সর্দার যখন দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে বের হত, তখন ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে তারা বনের শেষ পর্যন্ত যেত।

মাঝে মাঝে কালু সর্দারের কাছে আবদারও করত।

ছেলে, আমায় কবে নিয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে?

কালু হাসত। নিয়ে যাব মা, সময় হলে ঠিকই নিয়ে যাব।

NOT FOR SALE

তারা অভিমান করত।

কেন, আমি তোমার দলের লোকের চেয়ে কিসে কম? আজকাল তো বন্দুক ছোড়াও শিখেছি।

কালু বলত, তুমি কারো চেয়ে কম নয় মা। কম কেন হবে, তুমি যে সকলের মা। তোমার বয়সটা আর একটু বাড়ুক, মা আর ছেলে পাশাপাশি বের হব।

সারা দলে বন্দুক মাত্র তিনটে। গাদা বন্দুক। কোম্পানির সিপাইয়ের কাছ থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

কালু নিজের হাতে তারাকে বন্দুক ছোড়া শিখিয়েছিল।

প্রথম দিন তো বন্দুকের ধাক্কায় তারা চিৎপাত হয়ে পড়েই গিয়েছিল ঘাসের ওপর।

তারপর আস্তে আস্তে তারা বন্দুক ছোড়া শিখে নিয়েছিল। প্রথম প্রথম শেয়াল, গাছে ঝুলন্ত সাপ, তারপর উড়ন্ত বক এক গুলিতে খতম করে দিত।

কালু হাততালি দিয়ে বলত, সাবাস, মা, সাবাস!

প্রথম যেদিন কালু তারাকে সঙ্গে নিল, তখন তারার বয়স তেরো।

সারারাত তারা ঘুমোতে পারেনি। বিছানায় ছটফট করেছে। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

ঠিক সন্ধ্যা হতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল। শাড়িটা তারা পুরুষদের মতন মালকোঁচা দিয়ে পরে নিল। মাথায় পাগড়ি বাঁধল, যাতে দরকারের সময় চুল খুলে মুখ চোখ ঢেকে বিব্রত না করে। কোমরে বড় ছোরা, হাতে বর্শা।

তারাকে মাঝখানে রেখে দলটা এগিয়ে গেল।

অনেকটা পথ। অনেকবার অন্ধকারে তারা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেল। তারপর কালুর নির্দেশে একটা ঝাঁকড়া অশথগাছতলায় সবাই দাঁড়াল।

চকমকি জ্বেলে একজন আলো জ্বালাল। সেই আলোতে তারা দেখল এক পুরোহিত দাঁড়িয়ে।

পুরোহিত তারাকে বলল, আমি যা বলছি, সেই কথাগুলো উচ্চারণ কর মা। যদি কোনভাবে ধরা পড়ি তাহলে যতই দৈহিক যন্ত্রণা দিক শত্রুরা কিংবা

NOT FOR SALE

অর্থে বশীভূত করার চেষ্টা করুক, আমি প্রাণান্তেও দলের কারো নাম বলব না, কোন আস্তানার খবর দেব না। মা বাশুলীর দিব্যি।

পুরোহিত চকচকে একটা খাঁড়া তারার কাঁধের ওপর রাখল।

তারা পুরোহিতের কথাগুলো উচ্চারণ করল। তারপর পুরোহিত সিঁদুর নিয়ে তারার কপালে টিপ এঁকে দিল।

কালু বলল, এবার পুরুতমশাইয়ের পায়ের ধুলো নাও মা।

তারা হাঁটু মুড়ে বসে পুরোহিতের পদধূলি নিল।

সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য কাঁপিয়ে গর্জন উঠল।

বাশুলী মায়ীকি জয়!

আবার যাত্রা শুরু হল।

ছোট ছোট জলা, বাঁশঝাড় পার হয়ে সবাই একটু ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছাল।

আকাশে চাঁদের ফালি। খুব অল্প আলো। পরিষ্কার কিছু দেখবার উপায় নেই।

কালু বলল, সব গাছে উঠে পড়। আমি তলায় রইলাম। সময় হলে খবর দেব।

অন্য সকলের সঙ্গে তারাও গাছে চড়ল। অনেক ডালপালা-ছড়ানো বটগাছ। উঠতে কোন অসুবিধা হল না।

একটা মোটা ডাল আঁকড়ে তারা চুপচাপ বসে রইল। এই টের পেল তার বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় চলেছে। দুপ দুপ শব্দ। এতদিন যা শিখেছে, আজ হাতে-কলমে তার পরীক্ষা।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল তারার। হঠাৎ চাপা গম্ভীর গলায় কালু সর্দারের সাবধানবাণী 'হুঁশিয়ার' কানে যেতেই সে সোজা হয়ে বসল।

অনেক দূর থেকে ঘুঙুরের মতন একটা শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

ঝুন, ঝুন, ঝুন।

ম্লান অন্ধকারে তারা দেখল অনুচরেরা সবাই গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে। তারপর একে একে মাটিতে বুক দিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল।

NOT FOR SALE

পশ্চিম দিক থেকেই ঘুঙুরের আওয়াজটা আসছিল। সেই দিকটাই আলো হয়ে উঠল।

মশালের আলো।

গাছের ওপর থেকে তারা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। দুটো লোক ছুটে আসছে। এক হাতে লাঠি, লাঠিতে ঘুঙুর বাঁধা, আর এক হাতে জ্বলন্ত মশাল।

তার পিছনেই একজন অশ্বারোহী সিপাই। তারপর বাহকরা পালকি বয়ে আনছে। বন কাঁপিয়ে বাহকদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হুম্ না, হুম্ না, হুহুম্ না।

পিছনে আরো অনেকগুলো পাইক।

বন্যজন্তু তাড়াবার জন্য ওই মশালের আলো আর ঘুঙুরের শব্দ। কুখ্যাত এই দুর্গাপুরের জঙ্গলের কথা তাদের জানা, তাই যতটা সম্ভব দ্রুতপায়ে জায়গাটা পার হবার চেষ্টা করছে।

বাশুলী মায়ীকি জয়! কালুর ভয়াল কণ্ঠস্বর। তারপর তার অনুচরদের হুংকার শোনা গেল। মাটি ফুঁড়ে যেন ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।

কে একজন সবেগে সড়কি চালাল ঘোড়ার পায়ে। ঘোড়াটা পা মুড়ে বসে পড়ল, তার পিঠের লোকটা ছিটকে পড়ল জলার ওপর। মশালধারী দুজন তীরের ঘায়ে খতম।

সঙ্গে সঙ্গে পালকির পিছন থেকে লাঠিয়ালের দল ছুটে এসে পালকিটা ঘিরে রাখল।

লাঠির ফটাফট শব্দ, তীরের শোঁ শোঁ আওয়াজ, মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরোক্তিতে মুহূর্তে জায়গাটা যেন নরকে পরিণত হল।

হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে গুৱম গুৱম শব্দ।

সিপাইরা বন্দুক ছুড়তে শুরু করেছে।

ডাকাতদের দু'একজনও মশাল জ্বালিয়েছে।

সেই মশালের আলোয় তারা দেখল, শুধু সিপাইরাই নয়, পালকি থেকে একজন লালমুখো সাহেব বেরিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বন্দুক ছুড়ছে। লাঠিয়ালরা তাকে ঘিরে রয়েছে।

NOT FOR SALE

ডাকাতদের তরফে বন্দুক মোটে তিনটি। তারা জানে দুটি আনা হয়েছে। একটি মেরামতের অপেক্ষায় আস্তানায় পড়ে আছে।

বন্দুকে সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও কম নয়।

দূর থেকে লক্ষ্য করা যায় সত্য কথা, কিন্তু একবার গুলি ছোড়া হয়ে গেলেই আবার বারুদ ঠাসতে হয়। তাতে অনেক সময় নেয়। মুখোমুখি লড়াই করার পক্ষে খুব মুশকিল। বারুদ ঠাসবার সময় প্রতিপক্ষ আঘাত করার সুযোগ পায়। লাঠিয়ালরা লালমুখো সাহেবকে বেষ্টন করে রেখে তাকে বারুদ ভরবার সুযোগ দিচ্ছে।

মনে হল ডাকাতদের কয়েকজন বন্দুকের গুলিতে যেন ঘায়েল হল। আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। একজন তো তারা যে গাছের ডালে বসেছিল, তার তলাতেই উপুড় হয়ে পড়ল। দু একবার কেঁপে উঠেই নিস্পন্দ হয়ে গেল।

খুব বেগতিক অবস্থা। ডাকাতরা কিছুটা পিছিয়ে এল।

আচমকা লাঠিয়ালদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা শুরু হল।

হইচই চিৎকার। দু একজন পড়েও গেল মাটির ওপর।

ডাকাতরা পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করেছে।

বাশুলী মায়ীকি জয়!

তারা বুঝতে পারল কালু সর্দারের গলার আওয়াজ।

কালু কিছু অনুচর নিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের পিছন থেকে আক্রমণ করেছে।

কালুর গলায় সাহস পেয়ে ডাকাতরা যারা পিছিয়ে এসেছিল, তারাও নতুন বিক্রমে লাঠিয়ালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অসহ্য চিৎকার, গোঙানির শব্দ, মাথার খুলি ফাটার ফটাস ফটাস আওয়াজ।

আচমকা তারা দেখল লালমুখো সাহেবটা ছুটতে ছুটতে গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তাকে বোধ হয় কেউ লক্ষ্য করেনি।

সাহেব কিন্তু পালিয়ে গেল না। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ডাকাতদের দিকে বন্দুকের নলটা ফিরিয়ে তাক করতে লাগল।

NOT FOR SALE

দু এক মুহূর্ত। কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল তারা নিজেই বুঝতে পারল না। হাতের বল্লমটা সজোরে তুলে তারা সাহেবের পিঠ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। বল্লমটা সাহেবের পিঠে অনেকটা গেঁথে গেল।

মর্মান্তিক আর্তনাদ করে সাহেব পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত তারার শরীর, কাপড় ভিজিয়ে দিল।

ছয়

তারার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। দু'হাতে গাছের একটা ডাল ধরে না থাকলে সে বোধ হয় ঠিকরে মাটিতেই পড়ে যেত।

কোম্পানির লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছুটতে শুরু করল। মশালের আগুনে পালকিটা দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। অবশ্য তার আগে ডাকাতরা টাকার থলিগুলো বের করে এনেছে।

ফেরার মুখে সবাই এসে গাছতলায় জড় হল। কালু সর্দার প্রথমেই চিৎকার করে উঠল, তারা মায়ীকি জয়!

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে সুর উঠল, তারা মায়ীকি জয়!

কালু কাঁধে করে তারাকে গাছ থেকে নামাল।

তখনও তারার চেতনা নেই। দু'হাতে কালুর মাথাটা আঁকড়ে ধরে নিঃঝুম হয়ে বসে রইল।

চলতে শুরু করার আগে কালু পাশে দাঁড়ানো অনুচরকে বলল।

এই মেঘা, সাহেবের বন্দুকটা নিয়ে আয়। ও বন্দুক মার পাওনা।

অনেকটা পথ গিয়ে তারার চেতনা হল।

আস্তে আস্তে বলল, আমাকে নামিয়ে দাও।

কালু তারাকে মাটির ওপর নামিয়ে দিল।

হাঁটতে গিয়েই তারা অনুভব করল তার দুটো পা ঠকঠক করে কাঁপছে। খুব দুর্বল বোধ হচ্ছে শরীর। হেঁটে চলার শক্তি তার নেই।

কালু সেটা বুঝতে পারল। বলল।

NOT FOR SALE

মা, তুমি আমার শরীরে ভর দিয়ে চল। আর মাইলখানেক গেলেই ঘোড়া পাওয়া যাবে।

সত্যিই কিছুটা পথ যেতেই দেখা গেল একটা গাছের ডালে গোটা তিনেক ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

টাকার থলিগুলো নিয়ে একজন একটা ঘোড়ায় উঠল। কালু তারাকে সামনে নিয়ে আর একটায় উঠল। বাকী ঘোড়ার ওপর দুজন জখম অনুচরকে চাপানো হল।

যখন আস্তানায় গিয়ে পৌঁছল, তখন অন্ধকার কিছুটা তরল হতে শুরু হয়েছে। ভোর হবার আর বাকী নেই।

মাসী কুটীরের দরজায় অপেক্ষা করছিল।

তারার অবস্থা দেখেই আঁতকে উঠল।

একি রে, মেয়ের শরীর যে রক্তে ভেসে গেছে। এ সর্বনাশ কি করে হল?

কালু হাসল, নিজের রক্ত নয়, মাসী, দুশমনের রক্ত। প্রথম রাতেই মা একটা সাহেব খতম করেছে বল্লমের ঘায়ে। তুমি কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে অন্য কাপড় পরিয়ে দাও। শরীর সাফ করে দাও। খুব ক্লান্ত। এখন ঘুমানো দরকার।

তারাকে কালু খুব সাবধানে নামিয়ে মাসীর কাছে দিল।

কতক্ষণ তারার খেয়াল নেই। ঘুম যখন ভাঙল, তখন সর্বাঙ্গে ব্যথা, দেহে ভীষণ উত্তাপ।

উঃ মাগো! তারা চিৎকার করে উঠল।

মাসী পাশেই বসেছিল। তারার কপালে, গালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাইরে প্রহরারত অনুচরকে ডেকে ফিসফিস করে কি বলল।

তারপর আবার যখন তারা চোখ মেলল দেখল, পাশে কালু সর্দার আর একজন মোটা বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে। তাদের কথাবার্তাও তারার কানে এল।

কবরেজমশাই, ভয়ের কিছু নেই তো?

না, না, ভয়ের কিছু নেই। আমি যে পাঁচনটা দিয়ে গেলাম ওটা খাইয়ে দিও। আর এই শিশির তেলটা সর্বাঙ্গে মালিশ করতে হবে। তাজা খুন, তাও আবার মানুষের, চোখের সামনে দেখলে কত জোয়ানও ভিরমি যায়, এ তো বাচ্চা মেয়ে। কি রকম থাকে, পরশু নাগাদ আমাকে একবার খবর দিও।

NOT FOR SALE

কালু ঘাড় নাড়তে, কবিরাজ বেরিয়ে গেল।

কালু বসে বসে তারার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। দিন চারেক পরই তারা উঠে বসল।

উঠেই দেখল তার মাথার কাছে দেয়ালে বন্দুকটা ঝুলছে। বন্দুকের বাঁটে সিঁদুর মাখানো। তার মানে বাশুলীদেবীর কাছে বন্দুকটা উৎসর্গ করা হয়েছিল। ম্লেচ্ছের বন্দুক ব্যবহার করতে যাতে অসুবিধা না হয়। পাপ না স্পর্শ করে।

আরো দিন তিন চারের মধ্যেই তারার শরীর ঠিক হয়ে গেল।

কালু রোজই তাকে দেখতে আসত। তারা সেরে উঠতেই বলল।

কাল একটা উৎসব আছে। কদিন আগেই উৎসবটা হত, কিন্তু তুমি অসুস্থ বলে দিন পিছিয়ে দিয়েছিলাম।

কিসের উৎসব?

এখন বলব না। কাল টের পাবে। কাল ভোরে উঠে স্নান সেরে নিও, আমার লোক এসে তোমায় নিয়ে যাবে।

তাই হল। প্রায় রাত থাকতে উঠে তারা স্নান সেরে নিল। বেশ শীত পড়েছে। ভোরের দিকে কাঁপিয়ে দেয়।

তারার সঙ্গে মাসীও স্নান করল। নতুন চওড়া লালপাড় কাপড় প'রে দুজনে রওনা হল। তারা ভেবেছিল মন্দিরে যেতে হবে। সেখানে কোন পূজার ব্যাপার আছে।

কিন্তু মাসী সেদিকে গেল না। পায়ে চলা আঁকাবাঁকা পথ ধরে দু'জনে জঙ্গলের বাইরে চলে এল।

ফাঁকা এবড়োখেবড়ো মাঠ। কাশ আর ঘেঁটুফুলে বোঝাই। চারপাশে আসশেওড়া আর ঘোড়ানিমের গাছ। একেবারে এককোণে বাঁশের খুঁটির ওপর একটা গোলপাতার ছাউনি। দেখলেই বোঝা যায় ছাউনিটা সদ্য তৈরী হয়েছে।

ছাউনির তলায় কারা ঘোরাফেরা করছে। আধো অন্ধকারে তারা ঠিক বুঝতে পারল না।

একটু এগোতেই কালু সামনে এসে দাঁড়াল।

এস, এস মা এস।

NOT FOR SALE

তারা জিজ্ঞাসা করল, এখানে কিসের উৎসব? এই মাঠের মাঝখানে?

কালু হাসল, আসল উৎসব মা। একটু পরেই দেখতে পাবে।

রোদ উঠতেই তারা অবাক্ হয়ে গেল। ঝোপঝাড়ের অন্তরাল থেকে পিলপিল করে লোক এসে মাঠের ওপর বসল। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে। সকলেরই শীর্ণ, পাঁজরাসম্বল চেহারা।

কালু পিছন দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

তারা দেখল, পর পর তিনটে গরুর গাড়ি আসছে। তার ভিতরে মাটির হাঁড়ি, কলসি আর পোঁটলা।

এরা সব আশপাশের গাঁয়ের লোক, খেতে না পেয়ে কিরকম চেহারা হয়েছে দেখ। জমিদারের খাজনা দিতে দিতে পাঁজরা কখানা ছাড়া এদের সব গেছে। নিজেরা চাষী, অথচ ঘরে এক কণা চাল নেই। কয়েকজন পেটের দায়ে হালের গরু পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে।

শেষদিকে কালুর কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে উঠল।

জমিদাররা এভাবে খাজনা চায় কেন? তারা জিজ্ঞাসা করল।

জমিদাররা বলে কোম্পানি খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক সময়ে তাদের খাজনা কোম্পানির ঘরে জমা না দিলে, জমিদারি নিলামে উঠিয়ে দেবে। ফলে, এ বেচারীদের মুখে রক্ত উঠছে।

তারা চুপ করে শুনল। সেও জমিদারের মেয়ে। অন্ততঃ একসময়ে ছিল। কিভাবে খাজনা আদায় হত, প্রজাদের দেহ নিংড়ে কি না, সেটা তার জানা নেই। কোনদিন জানার সুযোগ হয়নি। সে বেশির ভাগ সময় মন্দিরেই পড়ে থাকত। পূজা অর্চনা নিয়ে।

ইতিমধ্যে লোকগুলো সার দিয়ে বসেছে। কালুর অনুচরেরা সকলের সামনে শালপাতা পেতে দিল।

এবার কালু তারাকে ডাকল।

এস মা, এবার তোমার কাজ শুরু।

কালুর পিছন পিছন তারা এগিয়ে গেল।

গরুর গাড়ি থেকে হাঁড়ি বালতি সব নামানো হয়েছে। ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি।

NOT FOR SALE

কালু বলল, হাতায় করে ভাত নিয়ে সকলের পাতে দাও। অবশ্য সকলের পাতে দিতে পারবে না, যতগুলো পার দাও, তারপর আমার লোকেরা দেবে।

তারা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল। চুলগুলো পিঠের ওপর খোলা অবস্থায় ছিল, হাত দিয়ে এলোখোঁপা করে নিল। তারপর হাতায় ভাত নিয়ে পরিবেশন আরম্ভ করে দিল।

কালু তারার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করে বলল।

আমার মা। আমাদের সকলের মা।

লোকগুলো মুখ তুলে দেখল। চওড়া লালপাড় শাড়ি পরা। কপালে সিঁদুরের টিপ। টানা টানা দুটি চোখ। ডানহাতে হাতার মধ্যে ভাতের স্তূপ।

একসঙ্গে অনেকগুলো লোক চেঁচিয়ে উঠল।

জয়, অন্নপূর্ণা মায়ের জয়!

তারপরই যত লোক খেতে বসেছিল, সবাই সমস্বরে চিৎকার করল, অন্নপূর্ণা মায়ের জয়!

লজ্জায় তারা অনেকক্ষণ মুখ তুলতে পারল না।

সব লোককে পরিবেশন করা তারার পক্ষে সম্ভব হল না। তাও প্রায় একশজনের পাতে সে ভাত দিল, তারপর ক্লান্ত হয়ে মাঠের ওপরই বসে পড়ল।

খাওয়া শেষ হতে সবাই পুকুরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল, তারপর লাইন বেঁধে দাঁড়াল।

এবার পোঁটলাগুলো খোলা হল। ধুতি আর শাড়ি। পুরুষদের ধুতি আর মেয়েদের শাড়ি। কালু ধুতি আর শাড়ি একখানা একখানা করে তারার হাতে তুলে দিল। তারা বিলি করতে লাগল।

আবার জঙ্গল কাঁপিয়ে তারার জয়ধ্বনি উঠল।

সব শেষ হতে বেলা গড়িয়ে পড়ল। তারা ফিরল গরুর গাড়িতে। শুধু তারা নয়, দলের সবাই অভুক্ত।

মন্দিরের চাতালে বাশুলীকে প্রণাম করে সবাই খেতে বসল।

রাত্রিবেলা মাসী তারাকে বলল।

NOT FOR SALE

এই রকম বছরে চার পাঁচবার কালু লোকজনদের খাওয়ায়, কাপড় বিলোয়। যে ডাকাতিতে তুমি সাহেবকে খতম করলে, সেটাতে বিশ হাজার টাকা লুট করে পেয়েছিল। এত টাকা কালু অনেকদিন পায়নি। এই রকমের বড় কিছু পাবার পরই কালু উৎসব করে।

চুপ করে বসে তারা শুনল।

চিরকাল তারা জানত, ডাকাতরা নির্মম, মানুষ খুন করে, আচমকা পথচারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের টাকা-পয়সা লুঠপাট করে নেয়। কিন্তু ডাকাতরা যে এভাবে গরিবদের উপকার করে, বিপদে সাহায্য করে, সেটা তার জানা ছিল না।

কালুর কাছ থেকে তারা অনেক কিছু শুনল।

এই যে সেদিন কোম্পানির টাকাটা লুঠ করলাম, দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে কালু একদিন বলল। তারা পাথরের ওপর ছোরার ফলা শান দিচ্ছিল।

মানভূম থেকে টাকাটা আসছিল বর্ধমানের খাজাঞ্চীখানায়। প্রজাদের রক্তশোষা টাকা। আজ তিন বছর অজন্মা চলেছে মানভূমে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, এক ছটাক শস্য হয়নি। ঘরে ঘরে কান্নাগোল উঠেছে। লোকে পেটের ছেলে মেয়ে বিক্রি করছে সেখানে। গাছের শেকড় খেয়ে ভেদবমি হয়ে মারা যাচ্ছে। গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। খাজনা মকুব করার জন্য লাটের দরবারে দরখাস্ত পর্যন্ত পাঠিয়েছিল।

কি হল সে দরখাস্ত? তারা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

সে দরখাস্ত লাট অবধি পৌঁছায়নি। আমলারাই ছিঁড়ে ফেলেছে। লোকের বসতবাটী, চাষের জমি সব নিলামে উঠিয়ে লোকেদের ভিখারী করে খাজনা আদায় করা চলল। সে দরখাস্ত যেমন লাট অবধি পৌঁছায়নি, সে খাজনার টাকাও তেমনি বর্ধমান অবধি আসেনি। কালু সর্দারের খপ্পরে পড়ে গেল।

কথা শেষ করে কালু বিকট গলায় হেসে উঠল।

সেই হাসির শব্দে তারা চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিল।

সাহেবের পিঠে বল্লম ফোঁড়ার দৃশ্যটা আবার যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল।

NOT FOR SALE

কালুকে বলল, আচ্ছা যে সাহেবটাকে খতম করলাম সে কে?

কোম্পানির কর্মচারী। নামটাম জানি না। চল, কাল রাতে আবার বের হতে হবে।

কাল আবার কোথায়?

আজ সকালে চর সন্ধান এনেছে মুকুন্দপুরের জমিদার কাশী যাচ্ছে। সঙ্গে লোকলশকর যেমন আছে, তেমনি কাঁচা টাকাও নিয়ে যাচ্ছে। বাপের নামে বুঝি মন্দির করবে। এই জঙ্গলের পাশ দিয়েই যাবে। আমাদের তৈরী থাকতে হবে।

মেঘা লাঠি হাতে দরজার বাইরে বসেছিল। সে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ সর্দার, রাত্তিরবেলা জমিদার পথ চলবে তো? কোন চটিতে হয়তো রাত কাটাবে।

না, কালু মাথা নাড়ল, খবর এসেছে চটিতে থামবে না, দেরি হয়ে যাবে। দু একটা বড় বড় শহরে রাত কাটাবে। তিন মাসের মধ্যে কাশী পৌঁছাতেই হবে। মন্দির স্থাপনের ভাল দিন আছে। তাছাড়া, সঙ্গে অঢেল লোকলশকর রয়েছে বলে সাহসও হয়েছে। দেখা যাক। আজ উঠি মা।

কালু উঠে দাঁড়াল।

আশ্চর্য, তারার প্রথমটা একটু ভয় করছিল। সে রাতের মতন আবার হইহল্লা চিৎকার, আর্তনাদ। মৃত্যুর হোলিখেলা। কিন্তু একটু পরেই কেমন উত্তেজনা বোধ করল। এই তো জীবন। চুপচাপ ঘরের কোণে বসে থাকার কোন মানে হয়? দেহে মনে যেন শ্যাওলা পড়ে যায়।

এ অন্যায় নয়। একটু আগেই কালুর কথায় তারা বুঝতে পেরেছে লোকদের বঞ্চিত করে যে টাকা সংগৃহীত হয়, সেটা ছিনিয়ে নিলে পাপ হয় না।

উপাস্য দেবী বাশুলীর হাতে খর্পর। অত্যাচারীকে, শোষককে হত্যা করলে অন্যায় হয় না।

পরের দিন সন্ধ্যায় সকলে মাঠে জড় হল। এবারের অভিযানে লোক অনেক কম। এবারে বল নয়, কৌশল। সমস্ত ব্যাপারটা কালু সকলকে বুঝিয়ে দিল।

NOT FOR SALE

রাত খুব অন্ধকার নয়। ফিকে জ্যোৎস্নার একটা আস্তরণ সারা জঙ্গলের ওপর। এক একজন এক একটা গাছের নীচে আত্মগোপন করে রইল।

প্রায় মধ্যরাতে মশালের আলো দেখা গেল। সামনে পিছনে অনেক লোক। মাঝখানে সুদৃশ্য পালকি।

কোন চিৎকার নেই। সবাই নিঃশব্দে এই সর্বনেশে জায়গাটা পার হবার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করছে।

হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একটা আর্তস্বর। তারপর একটানা গোঙানি।

সামনের লোকগুলো থেমে গেল। মশাল নীচু করে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে নজরে পড়ে গেল।

পথের একপাশে একটা লোক শুয়ে কাতরাচ্ছে। গায়ে নামাবলী, বুকে পৈতার গোছা। চোখে মুখে কালশিটের দাগ।

কি হয়েছে?

লোকটা গোঙাতে গোঙাতে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবারা আমার যথাসর্বস্ব ডাকাতরা লুটে নিয়েছে। পায়ে লাঠির চোট মেরেছে, উঠে দাঁড়াবার উপায় নেই।

ঠাকুরমশাই, কতক্ষণ আগে?

মিনিট পনেরো হবে। ওই ঝোপের মধ্যে পালিয়েছে। আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে। পথের ভিখারী করে দিয়েছে আমাকে।

লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

গোটা তিনেক লশকর লোকটাকে সাবধানে তুলে পালকির মধ্যে নিয়ে গেল আর বেশির ভাগ বল্লম, সড়কি উঁচিয়ে ঝোপটা ঘিরে ফেলল।

পালকির মধ্যে জমিদার বসেছিল। কোলের ওপর টাকার থলি।

বেশির ভাগ লোক ঝোপের মধ্যে ঢুকতেই পলকে এক কাণ্ড হয়ে গেল। আহত লোকটা চোখের নিমেষে টাকার থলিটা তুলে নিয়ে পাশের অশ্বারোহীকে সবেগে পদাঘাত করল। তারপর সে মাটিতে পড়ে যেতেই একলাফে ঘোড়ার ওপর চড়ে বসে বিদ্যুদ্‌বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

সমস্ত ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে দলের লোকেরা কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

কিন্তু একটু পরেই গুরুম গুরুম করে বন্দুকের শব্দ। পালকির ভিতর থেকে জমিদার বন্দুক ছুড়েছে।

কাজ শেষ। ডাকাতের দল পিছিয়ে গিয়ে ঘন জঙ্গলে মিশিয়ে গেল। পরিকল্পনা ঠিক এই রকমই ছিল। কালু সর্দার আহত ব্রাহ্মণ সেজে কৌশলের আশ্রয় নেবে।

আস্তানার কাছে গিয়ে সবাই দেখল ঘোড়াটা একটা সুপুরিগাছের সঙ্গে বাঁধা। কালু ধারে কাছে কোথাও নেই।

একটু এগোতেই নিধের সঙ্গে দেখা হল। কালুর তদারক করে এই নিধিরাম।

সে বলল, সর্দার চোট খেয়েছে। বন্দুকের গুলির চোট।

সেকি?

সবাই চমকে উঠল।

কই, সর্দার কোথায়?

শুয়ে আছে ঘরে। আমি কবরেজমশাইকে একবার খবর দিয়ে আসি।

একটা গাছের নীচে দুটো বড় বড় বাঁশ শোয়ানো ছিল। নিধি সে দুটো তুলে নিল। বাঁশ নয়, রনপা। তার ওপর উঠে নিধি তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবাই ছুটল কালুর কুঁড়ের দিকে।

বিছানার ওপর কালু শুয়ে রয়েছে। সারাটা রাস্তায়, ঘরের মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। বিছানাতেও রক্তের ছোপ।

কি হল সর্দার?

একজন কালুর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

কালু চোখ খুলল। সারা মুখ আরক্ত। যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টায় গালের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে।

জমিদারবেটার হাতের টিপ দারুণ। অন্ধকারেও ঠিক পিঠে একটা গুলি বিঁধিয়েছে।

NOT FOR SALE

বোঝা গেল এই কটা কথা বলতেই কালুর বেশ কষ্ট হল।

মাথার কাছে মাসী বসেছিল। তারা পায়ের কাছে গিয়ে বসল।

কালু তারার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে ম্লান হাসল।

কবিরাজ এল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। ঘোড়ায় চড়েই এসেছে।

কালুকে উপুড় করে ফেলে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। পিঠের কাছে বেশ বড় একটা গর্ত। গর্তের চারপাশে বারুদের কালো দাগ।

হামানদিস্তাতে একটা ওষুধ বেটে পিঠে লাগিয়ে দেওয়া হল।

কবিরাজ বের হয়ে যাবার সময় তারা গিয়ে দাঁড়াল।

কেমন দেখলেন?

সবাই বাশুলী মায়ের ইচ্ছা। আমাদের শক্তি আর কতটুকু।

কবিরাজ আর দাঁড়াল না। ঘোড়ার ওপর গিয়ে উঠল।

তারা ধীরপায়ে কালুর বিছানার কাছে ফিরে এল।

কালু চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটু পরেই কালু কথা বলল। তারা মা।

বল।

লুটের টাকাটা মাসীর কাছে রয়েছে। তুমি থলিটা নাও। রঘু, মেঘাকে বল উৎসবের আয়োজন করতে। গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দিতে। শীত আসছে, সবাইকে একখানা করে যেন গরম গায়ের কাপড় দেওয়া হয়।

তারা বলল, তাড়ার কি আছে। তুমি সেরে ওঠ, তখন ব্যবস্থা করা যাবে।

কালু ম্লান হাসল, আমি আর সেরে উঠব না তারা মা।

তারা চমকে উঠল, সেকি, অলক্ষণে কথা। কি এমন হয়েছে, তুমি সেরে উঠবে না?

ঘা বিষিয়ে উঠেছে। বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি জানি এবার আমার নিস্তার নেই। বাশুলী মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে সেই কথা বলে গেছেন।

তারা এগিয়ে এসে কালুর শিয়রে বসল। একটা হাত তার মাথার চুলের ওপর রাখল। নরম গলায় বলল, তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর তো। এসব কথা তোমায় ভাবতে হবে না।

কালু আর কথা বলল না। চোখদুটো বন্ধ করল।

NOT FOR SALE

সেই রাত থেকেই কিন্তু জ্বরে কালুর গা যেন পুড়ে যেতে লাগল। কেমন আচ্ছন্ন ভাব। বার বার ডাকলে কোনরকমে একবার ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দেয়।

রাত বাড়তে তারা কবিরাজকে খবর দিল। মেঘাকে পাঠিয়ে।

ঘুম থেকে কবিরাজকে উঠিয়ে আনতে বেশ সময় নিল। তারা ছটফট করতে লাগল।

কালুকে পরীক্ষা করে কবিরাজের মুখ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠল। এককোণে এগিয়ে এসে বলল, আমি বাপু কালুর অবস্থাটা ভাল বুঝছি না। ওষুধ তো কোন কাজ করছে না। আর এই রকম জ্বরের তাপ, মনে হচ্ছে শরীরের মধ্যে বিষ কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

তাহলে?

দুটো হাত জড়ো করে কবিরাজ কপালে ঠেকাল। সবই বাশুলী মায়ের ইচ্ছা।

সাত

সারাটা রাত একভাবে কাটল। সবাই জেগে বসে রইল কালুকে ঘিরে।

পরের দিন ভোরে কালু চোখ মেলল। মুখ চোখের ভাব যেন একটু পরিষ্কার।

তারা বাশুলীর পূজো দিতে বেরিয়ে পড়ল। মাসীকে সঙ্গে নিয়ে।

ফিরল যখন বেশ বেলা হয়েছে। কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল। দলের প্রায় সবাই এসে জড় হয়েছে। কেউ ঘরের মধ্যে, কেউ উঠানে, কেউ বাগানে বসে আছে।

সামনে নিধিরামকে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

নিধিরাম মাথা নীচু করে বলল, সর্দারের অবস্থা ভাল নয়।

লোক ঠেলে তারা ভিতরে গেল। পূজোর সিঁদুর কালুর কপালে পরিয়ে দিল। সাবধানে তাকে হাঁ করিয়ে চরণামৃত ঢেলে দিল মুখে।

ইঙ্গিতে কালু তারাকে কাছে বসতে বলল।

NOT FOR SALE

তারা বসল।

দলের চাঁইরা সবাই চারপাশে দাঁড়িয়ে। ক্লান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে কালু একবার সকলের দিকে দেখল তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। মা বাশুলীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি যখন থাকব না, তখন দল চালাবার ভার দিয়ে গেলাম তারা মায়ের ওপর। আমাকে যেমন সম্মান দেখাতে, একেও তেমনই দেখাবে। জীবন দিয়ে এর সেবা করবে।

কালু মেঘাকে ইঙ্গিত করল। মেঘা কোণ থেকে রুপোবাঁধানো কালুর লাঠিটা এনে তারার দিকে এগিয়ে দিল। তারা লাঠিটা কপালে ঠেকাল।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, তারা মায়ীকি জয়!

কালুর ক্লান্ত মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল তারা বুঝতে পারল না। তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে অশ্রান্ত দাপাদাপি। এত বড় একটা দলের সে অধিনায়িকা। এ গুরু দায়িত্ব বহন করার তার শক্তি কোথায়!

কালু একটা হাত রাখল তারার মাথায়। তারা নীচু হয়ে কালুকে প্রণাম করল।

তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার দু চোখ বেয়ে টপটপ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। একদৃষ্টে সে কালুর দিকে চেয়ে রইল।

কালুর দুটি চোখ নিমীলিত। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। মনে হল দেবতার নাম জপ করছে।

সে রাত এমনি ভাবেই কাটল।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে তারাকে স্নান সেরে নিতে হল। স্নান সেরে চওড়া লালপাড় নতুন শাড়ি অঙ্গে জড়াল। তারপর দলের দু'জনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে দেখল দরজার গোড়ায় পালকি দাঁড়িয়ে।

একি পালকি কেন?

তোমাকে মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে। হেঁটে যাবার দরকার নেই।

তারা আর কথা বলল না। পালকির মধ্যে গিয়ে বসল।

NOT FOR SALE

মন্দিরের সামনে দলের প্রায় সকলেই এসে জুটেছে। কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। পুরোহিত খুব ব্যস্ত।

তারাকে মূর্তির সামনে পাতা কার্পেটের একটা আসনে বসতে হল।

সংস্কৃত তারা একবিন্দুও বোঝে না, কিন্তু পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বার বার তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তারপর পুরোহিত মন্ত্র থামিয়ে বাংলায় যখন তাকে বুঝিয়ে দিল যে সামনে যে বিরাট শক্তি রয়েছে তারা সেই বাশুলীমায়েরই শক্তির অংশ, অমিত বীর্যের অধিকারিণী, তখন শুনতে শুনতে তারার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল, সত্যিই যেন মা বাশুলী নিজের শক্তির কিছুটা তাকে অর্পণ করেছেন।

শেষকালে পুরোহিত বলল, এবার শোণিত দাও মা।

শোণিত? তারা একটু চমকে উঠল। কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না।

পুরোহিত আবার বলল, তোমার অভিষেকের দিনে মাকে রক্ত অর্ঘ্য দিতে হয়।

তারা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে পুরোহিতের দিকে চেয়ে রইল।

পুরোহিত তারার ডানহাতটা টেনে নিল নিজের দিকে তারপর পাশে রাখা চকচকে একটা ছোরা তুলে নিয়ে অনামিকার ওপর আস্তে বসিয়ে দিল।

ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত ছুটল।

পুরোহিত তারার হাতটা টেনে মূর্তির পায়ের ওপর রাখল।

টপটপ করে রক্তের ফোঁটা বাশুলীমায়ের পায়ের ওপর ঝরে পড়তে লাগল।

ফেরার সময় পালকিতে নয়, তারাকে মাঝখানে রেখে দলের সবাই জয়ধ্বনি করতে করতে চলল।

বাড়ির কাছ বরাবর এসেই সবাই থেমে গেল। কালুর কাছে মাসী ছিল, আর দরজায় একজন অনুচর।

দুপুরের থমথমে আবহাওয়া ছাপিয়ে মাসীর কান্নার সুর ভেসে উঠল।

তারার হাতে কলাপাতায় মোড়া প্রসাদ ছিল। কান্নার শব্দ কানে যেতেই সে প্রসাদ বুকের মধ্যে চেপে ধরে ছুটতে আরম্ভ করল।

NOT FOR SALE

পিছন পিছন দলের আর সবাই।

কালু সর্দার চিত হয়ে শুয়ে আছে। দুটো হাত বুকের ওপর। যন্ত্রণায় মুখটা কিছুটা বিকৃত। মাথার কাছে বসে মাসী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে।

প্রসাদটা পাশে রেখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কালুর শরীরের ওপর। দলের সবাই কালুর প্রাণহীন দেহ ঘিরে দাঁড়াল মাথা নীচু করে।

তারার খেয়াল ছিল না। হাতের আঙুল থেকে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেল আবার। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত কালুর কপালে রক্তচন্দনের মতন শোভা পেতে লাগল।

দলের সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কালু সর্দারের জয়! তারামায়ীকি জয়!

বিকালের দিকে কালু সর্দারকে নিয়ে যাওয়া হল। দলের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। তারার হাতেও।

মাইল তিনেক দূরে শ্মশান। শুধু দলের লোকই নয়, কোথা থেকে খবর পেয়ে কাছাকাছি গ্রাম থেকে অনেক লোক এসে জুটল।

কেউ কেউ এগিয়ে এসে তারাকে প্রণাম করল।

বলল, রানীমা, এবার আপনি ভরসা। সন্তানদের দেখবেন।

প্রথম প্রথম তারার একটু ভয় হয়েছিল। কি জানি তার এভাবে দলের সর্দার হওয়াটা দলের অন্য সবাই হয়তো তেমন পছন্দ করবে না। বিশেষ করে চাঁইরা।

কিন্তু দিনের পর দিন কেউ একটু প্রতিবাদ করল না। বরং মেঘা, চরণ, মনা এরা সব অন্য কথা বলল।

জানো তারামা, সর্দার স্বপ্ন পেয়েছিল। একবার, দুবার নয়, বার বার তিনবার।

কি স্বপ্ন? তারা জিজ্ঞাসা করেছিল।

বাশুলীমা স্বপ্ন দিয়েছিল, এবার আমার দেহ থেকে অংশ দেব তোদের। আমার শক্তির অংশ। আর কোন ভয় থাকবে না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে তারার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীরের রক্ত যেন ফুটতে লাগল টগবগিয়ে। সত্যিই বুঝি সে বাশুলীমায়ের প্রেরিত।

NOT FOR SALE

তারপরই তুমি এলে। তোমাকে দেখেই সর্দার বলেছিল আমাদের। মার লোক এসে গেছে রে। এবার আমার যাবার পালা। একে ভাল করে সব শিখিয়ে দে। আর তোদের মার নেই।

তারা আর কিছু বলেনি। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে। নিজের মধ্যে সত্যিই একটা শক্তির উৎস অনুভব করেছে। মনে হয়েছে দুনিয়ার কোন বাধাই তার প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। তারামায়ীর দল অজেয়, অক্ষয়।

দিন তিনেকের মধ্যে খবর এল।

তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দলের লাঠিখেলা দেখছিল, একজন বৈরাগী এসে প্রণাম করে পিছনে দাঁড়াল।

খবর আছে মা।

তারা পিছিয়ে এল।

কি খবর?

পরশু মাঝরাতের কিছু পরে শক্তিগড়ের লোচন রায়ের গোমস্তা এই পথ দিয়ে যাবে কলকাতার সেরেস্তায় টাকা জমা দিতে।

সঙ্গে লোক কত?

এবার এক নতুন কায়দা করেছে মা। লোকজন নিয়ে হইচই করে যাবে না।

তবে?

এক পুরোহিত যাবে নারায়ণ কোলে করে। সঙ্গে জন চারেক লাঠিয়াল।

টাকা?

পুরোহিত আর লাঠিয়ালদের কোমরে থাকবে।

ঠিক আছে, যদি টাকা আমাদের কবলে আসে, পরে দেখা করো, পুরস্কার পাবে।

লোকটা আবার প্রণাম করে বিনীতকণ্ঠে বলল।

গরিবকে মনে রাখবেন মা। অধীনের নাম নফর সামন্ত। নসীপুরের বাসিন্দা।

তারা ঘাড় নাড়ল।

NOT FOR SALE

লোকটা মাঠ পার হয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে, তারা মেঘার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, একটা খবর আছে। সন্ধ্যার পর তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করো।

দলের পাঁচজন চাঁই ঠিক সন্ধ্যার পর তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তারা সবে পূজা শেষ করে দেবীর পটের সামনে আরতি করছিল মেঘাদের ঢুকতে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বলল।

আরতি শেষ করে তাদের কাছে বসে নফর সামন্তর দেওয়া খবরের কথা বলল।

মনা বলল, লোক যদি এত কম হয় তো আমরা জন চারেক গিয়েই তো কাজ হাসিল করতে পারি। বেশী লোকজন নিয়ে হইচই করার কি দরকার। কি বল?

সমর্থনের আশায় মনা সকলের মুখের দিকে দেখে শেষকালে তারার দিকে চোখ ফেরাল।

তারা কিছুক্ষণ কি ভাবল তারপর চাপাগলায় বলল, আমি ভাবছি, আর একটা কাজ করলে হয়।

মেঘা বলল, কি?

বিনা রক্তপাতে কাজ উদ্ধার করা যায় না?

কি করে?

তারা খুব ফিসফিস করে মতলবটা দলের কাছে বলল। শুনে হাসির হল্লা উঠল।

চৈতন মাথা নেড়ে বলল, বুদ্ধি বটে তারামায়ীর!

ঠিক দিনে শক্তিগড়ের গোমস্তা আসবার পথের ধারে এক বিরাট জিয়ল গাছের নীচে জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসীকে দেখা গেল। সামনে ধুনি জ্বলছে। এধারে ওধারে ছড়ানো নরকঙ্কাল। সন্ন্যাসীর সামনে এক নরকরোটিতে রক্তাভ পানীয়। সন্ন্যাসীর পরনে রক্তাম্বর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের বলয়।

মধ্যযাম পার হতেই পথের বাঁকে দুটো মশালের আলো দেখা গেল। তার মানে, শক্তিগড়ের লোকেরা আসছে। কাছে আসতেই বোঝা গেল সবাই বেশ

NOT FOR SALE

দ্রুত পদক্ষেপে চলেছে। কোনরকমে এ অঞ্চলটা পার হতে পারলেই ভোরের দিকে সেবায়েতপুরের চটিতে আশ্রয় নিতে পারবে। মাঝপথে যে চটি আছে, সেটা খুব নিরাপদ নয়।

সন্ন্যাসীর কাছাকাছি আসতেই সন্ন্যাসী বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছাড়ল, কে যায়?

আচমকা আওয়াজে সমস্ত দলটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পুরোহিত পিছনের লোকগুলোর দিকে ফিরে বলল, সর্বনাশ, কাপালিকের পাল্লায় পড়লাম যে!

এত রাতে এ পথ দিয়ে কোথায়?

পুরোহিত জোড়হাত করে সন্ন্যাসীর সামনে বসে পড়ল।

আজ্ঞে, আসছি শক্তিগড় থেকে, যাব কলকাতা। কলকাতার শোভাবাজারে হুজুরদের নতুন বাড়িতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে, তাই গৃহদেবতাকে নিয়ে চলেছি।

কে হুজুর?

আজ্ঞে লোচন রায়। তাড়াতাড়ি ছুটছি, এলাকাটা তো ভাল নয়। কালু সর্দারের এলাকা।

সন্ন্যাসী ভ্রূকুঞ্চিত করে পুরোহিতের দিকে একবার দেখল।

কালু সর্দার তো মারা গিয়েছে।

মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, যেমন কর্ম, তেমনই ফল। ইংরেজের বন্দুকের গুলিতে খতম।

তার দল?

ছড়িয়ে পড়েছে এধার ওধার। তাছাড়া তোমাদের সঙ্গে নারায়ণ রয়েছে, তোমাদের কি ভয়?

সেইজন্যই তো আরো ভয় প্রভু। কি জানি দুর্বৃত্তের দল যদি ঠাকুরকে অপবিত্র করে।

মূর্খ, সন্ন্যাসী গর্জন করে উঠল, ভগবান্‌কে অপবিত্র করে কার সাধ্য! এই নাও কারণবারি।

সন্ন্যাসী নরকরোটি এগিয়ে দিল। পুরোহিতের হাতে।

NOT FOR SALE

পুরো দলটাই সন্ন্যাসীকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়েছিল। পথশ্রমের ক্লান্তি কিছুটা দূর হবে। তা ছাড়া, এমন নির্জন অরণ্যে কাপালিক যেন একটা ভরসা।

পুরোহিতের হাত থেকে দলের সবাই নরকরোটি নিয়ে সেই রক্তাভ পদার্থ পান করল। একের পর এক।

সন্ন্যাসী ধুনির পাশ থেকে ছাই তুলে নিয়ে সকলের কপালে টিপ পরিয়ে দিতে দিতে বলল, যা, এবার যাত্রা শুরু কর। সব অমঙ্গল কাটিয়ে দিলাম। কারো সাধ্য নেই তোদের স্পর্শ করে।

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, উঠে দাঁড়ানোর বদলে সবাই পথের ওপর নেতিয়ে পড়ল। চেতনাহীন।

ঠিক সেই সময় আশপাশের গাছের ডালগুলো দুলে উঠল।

প্রথমে তারা, তারপর মনা, চৈতন আর গোকুল। এক এক করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল।

তারা হাসল, কি, কেমন মতলব দিয়েছিলাম?

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তারামায়ীকি জয়!

ঠিক আছে, এবার দেখ কি আছে। সাবধান, বিগ্রহের যেন কোন ক্ষতি না হয়!

সবাই একটু সরে দাঁড়াল। সন্ন্যাসীরূপী মেঘা পুরোহিত আর সঙ্গীদের দেহ তন্নতন্ন করে তল্লাশ করে নোট আর টাকার থলি বের করে নিল।

ধুনির আগুন নিভিয়ে সবাই অরণ্যের মধ্যে গা-ঢাকা দিল।

কিছুটা গিয়ে মনা বলল, টাকা লুঠ করা হল বটে, কিন্তু এতে গা গরম হল না তারামা।

তারা চলতে চলতে বলল, আপসোসের কি আছে মনা, এক মাঘে কি আর শীত পালায়। দিন আসবে।

সে রাত্রেই মন্দিরের চাতালে বসে গোনা হল। নোটে টাকায় মিলে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা। বিনা রক্তপাতে খুব ভাল উপার্জন।

চৈতনই বলল, আরো কিছু গাদা বন্দুক আমাদের দরকার তারামা। সর্দার বন্দুকের গুলিতে মারা গেল, এ দুঃখ আমাদের যাবার নয়। আমাদের হাতে

NOT FOR SALE

কয়েকটা বন্দুক থাকলে লালমুখোদের সাধ্য কি আমাদের আক্রমণ করার সাহস পায়।

তারা বলল, কিন্তু বন্দুক অতগুলো যোগাড় হবে কি করে? এ তো এমন নয় যে পয়সা ফেললেই মুড়ি বাতাসার মতন দোকান থেকে কিনতে পারব। এক উপায়, ইংরেজরা যখন এ তল্লাট দিয়ে যাবে, তখন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকার সঙ্গে বন্দুকও কেড়ে নেওয়া।

আজকাল শুনছি নাকি ইংরেজরা টাকা নিয়ে জলপথে যাচ্ছে। সে পথেও অবশ্য ছিপ নিয়ে জলদস্যুরা বসে আছে, আর তাছাড়া সময়ও অনেক বেশী লাগে।

দেখা যাক। অপেক্ষায় থাক। বাশুলীমা সুযোগ দিলে ঠিক কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

দিন সাতেক পরেই চৈতন একটা লোককে তারার কাছে নিয়ে এল। এ লোকটাকে তারা আগেও দেখেছে। জন্মেজয় মিত্তির। এখানকার সব ক্রিয়াকলাপের হিসাবনিকাশ, লেখাপড়ার কাজ এই করে। অনেক সময় জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়াঝাটির ব্যাপার গাঁয়ের লোকেরা মিটমাটের জন্য কালু সর্দারের কাছে নিয়ে আসত। আইন আদালতের ওপর তাদের আস্থা নেই। কালু সর্দার যা করবে, যা বলবে, তাই শিরোধার্য। তখন এই জন্মেজয় মিত্তির দলিলদস্তাবেজ সব পড়ে কালু সর্দারকে জমির সীমানার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিত। দলের মধ্যে লেখাপড়াজানা লোক আর ছিল না। তারা অবশ্য দ্বিতীয়ভাগ পর্যন্ত পড়েছে। তাও ভাল করে নয়। ছাপা লেখা যাও বা পড়তে পারে, হাতের লেখা পারে না।

কি হল? তারা বল্লমের ফলাটা শানে ঘষে চকচকে করতে করতে প্রশ্ন করল।

ব্যাপারটা বল না জন্মেজয়। চৈতন লোকটাকে বলল।

জন্মেজয় উরনিতে বাঁধা হলদেরঙের ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করল তারপর সুতোবাঁধা চশমাটা চোখে দিয়ে একবার তারার দিকে চেয়ে বলল, পড়ি?

NOT FOR SALE

বিস্মিতভাবে তারা মাথা নাড়ল।

জন্মেজয় পড়তে আরম্ভ করল।

এতদ্দারা জ্ঞাত হয় যে দেশের স্থানে স্থানে স্থলদস্যু ও জলদস্যুদের আপদ ইংরাজ সুশাসনের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। আশা করা যায় সকলেই এ ধরনের বিঘ্ন উৎপাটিত করার জন্য যত্নবান্ হইবেক। গবর্নর বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ইহা জ্ঞাপিত হইল যে দুর্গাপুর অরণ্যের তিলক সর্দার, তারামায়ী আর ফটিকচরণকে যে বা যাহারা নিধন করিতে পারিবেক, তাহাদের সরকারের সেরেস্তা হইতে নগদ দুই হাজার টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবেক। জলদস্যু রামবাহাদুর ও পোর্তুগীজ পিদ্রুজকে নিধন করিতে পারিলেও অনুরূপ অর্থ প্রদত্ত হইবেক। এ বিষয়ে সরকারও যথাসাধ্য তৎপর হইবেক।

পড়া শেষ করে জন্মেজয় কাগজটা ভাঁজ করে আবার রেখে দিল।

এ ইস্তাহার কারা দিয়েছে? তারা গম্ভীরগলায় জন্মেজয়কে জিজ্ঞাসা করল।

বর্ধমানের নরিশসায়েব। কালেক্টর। শুনলাম বিরাট দলবল নিয়ে এদিকে আসবে, উদ্দেশ্য দুর্গাপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করা।

হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে তারা চুপচাপ বসে রইল। সামনাসামনি লড়াইয়ে এদের সঙ্গে পেরে ওঠা দুষ্কর। সঙ্গে প্রচুর বন্দুক বারুদ থাকে। শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যাও কম নয়, একমাত্র ভরসা এ জঙ্গল এদের নখদর্পণে নয়। আচমকা পিছন থেকে আক্রমণ করে ঘায়েল করতে হবে। বন্দুক ছোড়ার সুযোগ না দিয়ে।

কিছুক্ষণ পর তারা চৈতনের দিকে ফিরল। একটা কাজ করতে হবে চৈতন।

বল।

এখনই রনপা দিয়ে দু'জন লোককে তিলক আর ফটিকের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

তারার কথা শুনে চৈতন অবাক্ হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

আট

এ জঙ্গলে ডাকাতদের তিনটে বড় দল আছে। নামকরা। একেবারে পুবমুখে তিলক সর্দারের দল। তিলক জাতে বিহারী। তার দলের লোক ইদানীং অনেক কমে গেছে। কোম্পানির আমল থেকেই পাইকের কাজে লেগে গেছে। আসলে তিলক ঠগী। আচমকা লোকের গলায় মোমদেওয়া দড়ির ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

বর্ধমানের কাছাকাছি আছে ফটিকচরণের দল। সংখ্যায় অনেক। এদের দলেই কয়েকজন আছে, হাতে বেঁটে লাঠি, অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় সেই লাঠি ঘুরিয়ে পথিকের পায়ের ওপর ছুঁড়ে দেয়। অব্যর্থ লক্ষ্য। পায়ের হাড় ভেঙে লোকটা সেই যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, নিজের শক্তিতে আর কোনদিন উঠতে পারে না। চিরজীবনের মতন খঞ্জ হয়ে যায়।

দুটো দলেরই একটা বড় অসুবিধা, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তখনই মুশকিলে পড়ে যায়। মোমলাগানো দড়ির ফাঁস আর বেঁটে লাঠি, এত লোকের বেলা কার্যকরী হয় না। এ বিষয়ে তারার দলের সুবিধা অনেক বেশী।

তিনটে দল, কিন্তু একজনের সঙ্গে আর একজনের কোন যোগাযোগ নেই। নিজের নিজের এলাকায় সবাই স্বাধীন। কেউ কোনদিন কারো সঙ্গে দেখা করে না।

তারা প্রথম যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে চাইছে। সেইজন্যই চৈতন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

লোক গিয়ে কি বলবে?

একটা চিঠি দেব, সেটা দিয়ে আসবে। দু'জনকে আমার সঙ্গে দেখা করার চিঠি।

দেখা করবে তোমার সঙ্গে?

দেখা করা না করা তাদের ইচ্ছা।

চৈতন ব্যাপারটা যেন ভাল চোখে দেখল না।

বলল, কি জানি, ওরা যদি ভাবে, আমরাই বা কেন যাব। তারাই আসুক আমাদের কাছে।

NOT FOR SALE

তারা মাথা নাড়ল, না, তা হয়তো ভাববে না, কারণ আমি মেয়েছেলে। আমার মনে হয় ওরা আসতে কোন দ্বিধা করবে না। তুমি বুঝছ না, চৈতন, এই সময় আমাদের একজোট হতে হবে। কোম্পানির লোকেরা যেমন আমাদের উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর, তেমনই আমাদেরও বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে।

কথাগুলো তারা খুব নরমসুরেই আরম্ভ করেছিল, কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠতে গলার স্বরও চড়া হয়ে গেল।

আশপাশে দলের যে ক'জন ছিল, তারা এসে সামনে দাঁড়াল।

মেঘা বলল, কি হল তারামায়ী?

তারা তার সিদ্ধান্তের কথা সবাইকে বলল।

মেঘা, চরণ, মনা, সিধু দলের অন্য চাঁইরা স্বীকার করল। যুক্তিটা মন্দ নয়। ওরা যেমন একজোট হচ্ছে, তেমনি আমাদেরও একজোট হতে হবে। তা ছাড়া, এসব ব্যাপারে বেশী লোকের পরামর্শ নেওয়াও মন্দ নয়।

তারা জন্মেজয়কে দিয়ে দুটো চিঠি লেখাল। দু লাইনের চিঠি। তলায় নাম নেই, শুধু দলের প্রতীকচিহ্ন।

দলের দু'জন রনপা চড়ে দু দিকে বেরিয়ে গেল।

চিঠিতে লেখা ছিল, সামনের শনিবার বাশুলীর মন্দিরের চাতালে তিনজনের সভা বসবে। সভার উদ্দেশ্য নরিশ সাহেবের ইস্তাহারের বিষয় আলোচনা করা।

পরের দিনই চর দু'জন ফিরে এল। সংবাদ শুভ। তিলক আর ফটিক আসতে রাজী।

তারা ঠিক করল, সভায় সবাইয়ের থাকার কোন প্রয়োজন নেই। তারা ছাড়া দলের আর পাঁচজন চাঁই থাকবে। এ কথাও দলের দু'জনকে বলে দিল, যেন জঙ্গলের পুব পশ্চিম দু'দিকে অপেক্ষা করে। তিলক আর ফটিকচরণকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবে।

অন্ধকার রাত। চাঁদ উঠবে একেবারে শেষের দিকে। মন্দিরের চাতালের দু'পাশে দুটো মশাল জ্বালাবার ব্যবস্থা হল। সভার শেষে আহারাদির ব্যবস্থা।

NOT FOR SALE

ভাত আর পাঁঠার মাংস। শেষ পাতে চালতার অম্বল। তিলক বিহারী মিষ্টান্নে ভক্ত। তাই বোঁদেও রাখতে হল।

শিয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিলক এসে হাজির। ঘোড়ার পিঠে। সঙ্গে দলের দু'জন। বোধ হয় পরামর্শদাতা।

অনেকক্ষণ কাটল, ফটিকের দেখা নেই। অভ্যর্থনার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে এল।

তারামা, কই কেউ তো এল না। মশার কামড়ে দুটো পা ঢোল হয়ে উঠেছে। কতক্ষণ আর দাঁড়াব।

তারা চাতালের ওপর তিলকের পাশে বসেছিল। তিলকের দিকে চেয়ে বলল, আসবে বলে তো কথা দিয়েছিল ফটিকচরণ। বিপদ্ আপদ্ হল না তো?

বিপদ্ আপদ্ শত্তুরের হোক।

অন্ধকারে ভারী কণ্ঠস্বরে তারা আর তিলক দু'জনেই একটু চমকে উঠল।

ঝোপের পাশ থেকে লাঠি হাতে এক মূর্তি এগিয়ে এল। দু পায়ে ন্যাকড়ার ফালি। তাতে রক্তের ছোপ। সারা মুখে কালো কালো দাগ।

লোকটা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে বলল, আমিই ফটিকচরণ। আসতে সামান্য দেরি হয়ে গেল।

তারা দাঁড়িয়ে উঠল, একি, এ অবস্থা কি করে হল?

মাথা নীচু করে পায়ের ন্যাকড়া খুলতে খুলতে ফটিক বলল, অবস্থাটা আমাকেই করতে হল। পুলিসের চর ঘুরছে। এখানে ওখানে। কে তাদের খবর দিয়েছে মার্শাল সাহেবের দুটো পা নাকি আমিই জন্মের মতন খোঁড়া করে দিয়েছি। তাই এই রাজবেশ ধারণ করতে হল।

মুখের দাগগুলো মুছে নিয়ে ফটিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তারার দিকে চেয়ে বলল, আদেশ কর তারামায়ী, আমাকে তলব করেছ কেন?

ফটিক উঠে তিলকের পাশে গিয়ে বসল।

তারা নরিশ সাহেবের ইস্তাহারের কথাটা দু'জনকে শোনাল।

দু'জনেই এর আগে শুনেছে।

ফটিক আরো গোপন কথা বলল।

NOT FOR SALE

এ আর কি। শুনলাম নতুন লাট হয়েছে বেণ্টিংক সাহেব। কলকাতার লাট। তামা তুলসী হাতে নিয়ে বুঝি প্রতিজ্ঞা করেছে দেশ থেকে ডাকাতদের উচ্ছেদ করবে। আমরা নাকি দেশে অশান্তির সৃষ্টি করছি। লাটের আবার এক চেলা জুটেছে শ্লীম্যান।

চেলা?

চেলা ছাড়া আর কি। নিজের তো অত সময় নেই, তাই চোর ডাকাত খতম করার ভার দিয়েছে এই চেলাটির ওপর।

এতক্ষণে তিলক কথা বলল, তা শ্রীমান কি করে খতম করবে আমাদের?

ফটিক হাসল, শ্রীমান নয় গো শ্লীম্যান। পাইক বরকন্দাজ নিয়ে নাকি ঘেরাও করবে দুর্গাপুরের জঙ্গল। একটি প্রাণীকেও রেহাই দেবে না।

তারা বলল, একটা মতলব ঠিক করার জন্যই তোমাদের ডেকেছি। এত বড় জঙ্গল ঘেরাও করা তো আর মুখের কথা নয়। কোম্পানির তাঁবে এত লোক নেই। তবে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। ফাঁদে ফেলার চেষ্টা নিশ্চয় করবে।

ফাঁদে ফেলবে কি করে? আমরা কি চিড়িয়া যে চট করে ধরা দেব?

একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে নাচাতে নাচাতে ফটিক বলল, আমাদের ফাঁদ হচ্ছে টাকার তোড়া। টাকার লোভ দেখিয়ে না ধরার চেষ্টা করে।

তিলক বলল, তার মানে?

মানে, হয়তো বিধবা সেজে কোম্পানির লোক তীর্থযাত্রার ভান করে এই পথ দিয়ে হাঁটবে। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লেই থান কাপড়ের তলা থেকে বন্দুক বের করবে। ঝোপঝাড় থেকে দল দল সিপাই আমাদের ঘিরে ধরবে।

তাহলে উপায়? তিলক হাতের লাঠিটা ঠুকতে লাগল।

উপায় হচ্ছে, যখনই লোক জানিয়ে এ পথ দিয়ে কেউ যাবে, তখনই সাবধান। লোক জানিয়ে মানে, টাকা নিয়ে অসহায় লোক যাচ্ছে এমন একটা কথা লোকের মুখে যদি রাষ্ট্র করে দেয়, যাতে আমাদের কানে আসে, তাহলেই বুঝতে হবে ভিতরে গলদ আছে। তাদের আক্রমণ না করাই বুদ্ধির কাজ হবে।

NOT FOR SALE

দলের একজন ভাঁড়ে শরবত নিয়ে এসে দাঁড়াল। তারা শরবত বিলাতে বিলাতে বলল, কাজের কথা শোন। তোমরা দু'জন দু'দিকে আছ, আমি মাঝখানে। যদি গোলমাল হয় তো তোমরাই আগে টের পাবে। এমন একটা ব্যবস্থা কর যাতে গোলমালের আভাস পেলেই আমাকে খবরটা দিতে পার। একজন যদি বিপদে পড়ে, তাহলে দলবল নিয়ে আমরা দু'জন এগিয়ে যাব তার সাহায্য করতে।

খুব ভাল কথা। আমরাও একজোট হব। তেমন কিছু হলে তারামা আমি তোমাকে খবর দেব, তুমি খবর দেবে ফটিককে। দেখি, কোম্পানির কি সাধ্যি আমাদের শেষ করে।

মাঝরাতের পর সভা শেষ হল। তিলক আর ফটিক দু'জনে দু'দিকে চলে গেল। দু'জনেরই রনপা ছিল। যেতে দেরি হল না।

তারা নিজের কুঁড়েঘরে ফিরে এল।

বিছানায় শুল, কিন্তু তারার চোখে ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল। বড় কম ভাবনার কথা নয়। সমস্ত দলের নিরাপত্তার ভার তার ওপর। মঙ্গল অমঙ্গল সব চিন্তা তাকেই করতে হবে। কালু সর্দার দলকে তারই হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

কোম্পানির কর্তারা কোনদিনই তাদের ভাল চোখে দেখেনি। এভাবে টাকাপয়সা লুঠতরাজ করলে কেই বা দেখে। কিন্তু মা বাশুলী জানেন, টাকাপয়সা লুঠ করেছে বটে, কিন্তু নিজের দলের জন্য সে টাকাপয়সার আর কতটুকু খরচ করেছে; বেশির ভাগই আশপাশের গাঁয়ের লোকদের জন্য খরচ করেছে। তাদের ক্ষুধা মিটিয়েছে, পরনের কাপড়চোপড় দিয়েছে, শীতের সময় গরম জামা কাপড় বিলি করেছে।

জমিদাররা যা করেনি, ইংরেজ সরকার যা করেনি, তারা তাই করেছে।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে তারা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

দিন পনেরো কুড়ি একেবারে চুপচাপ। লোকজন পথ চলা বুঝি বন্ধই করে দিল। যে দু একজন গেল, তারা মোটেই লোভনীয় শিকার নয়। একেবারে নিঃসম্বল পথিক। শহরের দিকে চলেছে চাকরির সন্ধানে।

বসে বসে দলের লোকদের শরীরে প্রায় মরচে ধরার যোগাড়।

NOT FOR SALE

হঠাৎ এক খবর এল। খবর আনল কানা গোবিন্দ। গোবিন্দ দু চোখেই দেখতে পায়। বরং একটু বেশীই দেখে। কি একটা গাছের আঠা মাখিয়ে মাঝে মাঝে চোখের পাতা দুটো বেমালুম জুড়ে দেয়। খুব কাছের লোকও টের পায় না। ভাবে বেচারী দৃষ্টিহীন।

গোবিন্দ খবর আনল খাস ইংরেজের তাঁবু থেকে।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে রানীসায়র। লোকে বলে রানীর বিল। এই বিলের ধারে ধারে শীতকালে হরেক রকমের পাখি আসে। কোথা থেকে আসে কে জানে। এখানকার লোকেরা সব পাখির নামও জানে না। পাখি শিকারের লোভে শহর থেকে ছোকরা সাহেবরা আসে। বিলের পাশে তাঁবু ফেলে। পাঁচ দিন সাত দিন কাটিয়ে যায়। পাখি মারে। নিজেরাই পালক ছাড়িয়ে আগুনে ঝলসে খেয়ে ফেলে।

গোবিন্দ বলল এবার প্রায় জন পাঁচেক সাহেব এসেছে। সঙ্গে ছ'টা বন্দুক। কোন রকমে বন্দুকগুলো হাত করতে পারলে কাজই হয়। তারার দলে বন্দুকের প্রয়োজন, সে খবর গোবিন্দ রাখত।

একটা উপায় বাতলে দাও তারামা। বন্দুক কটা তোমাদের এনে দিই।

এ কথা গোবিন্দ বলল বটে, তবে সে মনে মনে ভাল করেই জানত এ প্রায় অসম্ভব। বরং বাঘিনীর কোল থেকে তার বাচ্চা টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু ইংরেজদের কাছ থেকে বন্দুক ফুসলে আনা কিছুতেই যাবে না।

দিনের বেলা বন্দুকগুলো তারা তো কাছে কাছে রাখেই, রাত্রিবেলা শোবার সময় মাথার কাছে তাঁবুর হুকে বন্দুকগুলো আটকে রাখে। ইংরেজদের খানসামার সঙ্গে কথা বলে গোবিন্দ এ খবর সংগ্রহ করেছে।

তারা চিন্তায় পড়ল। এতগুলো বন্দুক এত কাছে রয়েছে, অথচ পাবার কোন পথ নেই।

দলসুদ্ধ ইংরেজদের তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু অতগুলো বন্দুকের মুখে কি হয় বলা যায় না। এদেশী সিপাই হলে ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু ইংরেজের বাচ্চারা শেষ পর্যন্ত লড়বে।

তারা বলল, আচ্ছা গোবিন্দ, তুমি দুপুরের দিকে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর। আমি একটু চিন্তা করে দেখি।

NOT FOR SALE

দুপুরের দিকে গোবিন্দ আবার এসে দাঁড়াল। তারার পাশে মেঘা, চৈতন আর মনাও ছিল। গোবিন্দকে কাছে ডেকে তারা ফিসফিস করে কিছুক্ষণ ধরে পরামর্শ করল।

গোবিন্দর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

হাসতে হাসতেই বলল, ঠিক আছে তারামা, আমি কাল ভোরেই সাহেবদের তাঁবুতে একবার যাব। যদি কাজ হাসিল করতে পারি, তাহলে মেঘা, চৈতন আর মনাকে বলে যাব। ওরা যেন তৈরী থাকে।

পরের দিন ভোরে গোবিন্দ যখন তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল তখন তার অঙ্গে কানা ভিখারীর সাজ। হাতে খঞ্জনি।

সাহেবরা গোল হয়ে তাঁবুর সামনে মাঠের ওপর বসে বন্দুক পরিষ্কার করছিল, গোবিন্দকে দেখে একজন বলল।

এই সাঢু, একঠো গান শুনাও। ভাল গান। রাঢা কিষ্ট গান।

সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জনিতে ঘা দিয়ে গোবিন্দ কীর্তন শুরু করে দিল।

গোবিন্দর গলা চমৎকার। যেমন মিষ্ট, তেমনই সুরেলা। সাহেবরা না বুঝলেও তালে তালে মাথা নাড়তে লাগল।

গানের শেষে গোবিন্দ কাঁধের থলি বাড়িয়ে দিল। খানসামা তাতে আলু, বেগুন, চাল ঢেলে দিল।

গোবিন্দর কিন্তু যাবার নাম নেই। সে চেপে সাহেবদের সামনে বসল।

হ্যাঁ সাহেব, তোমরা জল আনো কোথা থেকে? কোথাকার জল খাও?

কেন?

চারদিকে মহামারী শুরু হয়েছে। মায়ের দয়া, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সাহেবরা কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। পাশে দাঁড়ানো খানসামাকে মানে জিজ্ঞাসা করল।

খানসামা বুঝিয়ে দিল মায়ের দয়া মানে বসন্ত।

এই রোগটাকে সাহেবরা যমের চেয়েও ভয় করে। প্রাণে বাঁচাই এ রোগে দুষ্কর, বাঁচলেও মুখের এমন অবস্থা হয়, রীতিমত ভীতিপ্রদ।

এই বিল ঠেকে জল আনি। আগুনে গরম করিয়া পান করি।

এই বিল থেকে? গোবিন্দ যেন আঁতকে উঠল।

NOT FOR SALE

কি হইল?

আর কি হইল! বছর তিনেক আগে এখানকার জল খেয়ে জমিদারের পুরো বরকন্দাজের দল একেবারে খতম।

সাহেবরা চমকে উঠল।

জল ফুটিয়ে খেলে হবে না সাহেব, অন্য জায়গা থেকে জল আনার ব্যবস্থা কর।

সাহেবরা মুশকিলে পড়ল। কাছাকাছি কোন বড় জলাশয় নেই। দু একটা যা পুকুর আছে, তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। শীতকালে শুকনো খটখট করছে।

উপায়!

এক কাজ করতে পারি সাহেব, তবে বেশীদিন পারব না।

কি কাজ?

আমি যে গাঁয়ে থাকি, সেখানে প্রকাণ্ড এক ইঁদারা আছে, তার জল গরম করে এনে দিতে পারি। তবে তার জন্য পয়সা চাই আমার। আর দিন তিনেকের বেশী পারব না।

ঠিক আছে। পাবে পয়সা। দিন তিনেকই তুমি নিয়ে এস, তার চেয়ে বেশীদিন আমরা থাকবও না। শিকার মাথায় থাক।

তাই ব্যবস্থা হল। বাঁকের দু ধারে কলসী বসিয়ে কলসীর মুখে কলাপাতা ঢাকা দিয়ে গোবিন্দ সাহেবদের জন্য পানীয় জল এনে দিয়ে পরিশ্রমের মূল্য নিল।

তার পরের ব্যাপারটা খুবই সহজ।

রাতের অন্ধকারে মুখে কালি মেখে মেঘা, চৈতন আর মনা তাঁবুতে ঢুকল। খানসামা বাইরে ঘুমাচ্ছিল, তারই কাপড় দিয়ে গোবিন্দ তার মুখ হাত পা বেঁধে ফেলল।

জল পান করে সাহেবরা বেহুঁশ। ষণ্ডামার্কা তিনটে লোক তাঁবুতে ঢুকতে একবার চোখ মেলেও দেখল না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারার অনুচরেরা সব কটা বন্দুক বগলদাবা করে বেরিয়ে এল। শুধু বন্দুক নয়, টেবিলের ওপর কার্তুজের বাক্স ছিল। সেগুলো আনতেও ভুল হল না।

NOT FOR SALE

তারা খুব খুশী। বিনা রক্তপাতে তার মতলব হাসিল হয়েছে বলে নয়, দলের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে ছ'টা বন্দুক পেয়ে।

এতদিন তারার ভয় ছিল, খুব ভারী একটা দল প্রচুর বন্দুক নিয়ে এ পথে এলে তাদের মোকাবিলা করতে একটু অসুবিধাই হয়। ফলে সম্ভব হত না বলেই কৌশলের আশ্রয় নিতে হত।

এবার আর সে ভয় নেই, এতগুলো বন্দুক নিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়তে পারবে।

মন যখন খুশিতে ভরপুর তখন তারা একটা খারাপ খবর পেল।

ইংরেজ সিপাইদের হাতে তিলক সর্দার ধরা পড়েছে। সংবাদ দিল তারই দলের একজন।

তিলক সর্দারের আস্তানার মাইল দুয়েকের মধ্যে ইংরেজ কালেক্টরের তাঁবু পড়েছিল। সঙ্গে সিপাই বরকন্দাজ অনেক ছিল, তিলক টের পায়নি। সবাই চাষার ছদ্মবেশে ঘোরাফেরা করছিল।

কালেক্টর সাহেব চাঁদিনী রাতে ঘোড়ার ওপর চড়ে এদিক ওদিক বেড়াচ্ছিল, তিলকও ওত পেতে ছিল।

সে ভেবেছিল লোকটাকে ঘায়েল করতে পারলে টাকাপয়সা বেশ কিছু পাওয়া যাবে। সাহেবরা কোথায় টাকা রাখে, তিলকের জানা। কোমরবন্ধের মধ্যে পকেট থাকে, সেখানেই সব কিছু। এমন কি রাত্রে শোবার সময়ও সাহেবরা কোমরবন্ধ খোলে না।

কালেক্টর সাহেব একটা বাঁশের বাঁশি বের করে ফুঁ দিচ্ছিল। আকাশে বাতাসে মিষ্ট একটা সুর।

ঝোপের আড়ালে বসে তিলক দড়ির ফাঁস ঠিক করে নিয়েছিল, সাহেব কাছ বরাবর আসতেই দড়িটা মাথার ওপর ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

তিলকের বরাত। এ পর্যন্ত কোনদিন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সবাই বলে তিলকের ফাঁসে মাছি পর্যন্ত আটকে যায়।

কিন্তু সাহেব যেন দড়ির গন্ধ পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ঘাড় জড়িয়ে সোজা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। দড়িটা চাবুকের মতন সপাৎ করে পিঠের ওপর এসে পড়েছিল।

NOT FOR SALE

পলকের মধ্যে দড়িটা টেনে নিয়ে তিলক দ্বিতীয়বার ছোঁড়বার জন্য তৈরী হবার আগেই বিপদ ঘটেছিল।

ঘোড়ার পিঠে শুয়ে শুয়েই সাহেব অপূর্ব সুরে বাঁশি বাজাতে শুরু করেছিল, আর দড়ি হাতে করে তিলক সর্দার পাথরের মতন দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আশপাশের গাছপালার পিছন থেকে ছুটে এসেছিল অন্ততঃ পঞ্চাশজন সিপাই। সকলের হাতে উদ্যত বন্দুক। তিলকের দম নেবার পর্যন্ত সময় দেয়নি। পিঠে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে হাঁটিয়ে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়েছিল।

দলের আর সবাই কোথায় ছিল?

তারা উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

অনেকেই শিকারের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরছিল। আমরা কয়েকজন কাছাকাছি ছিলাম, কিন্তু অতগুলো বন্দুকের সামনে কি করব।

তারপর?

তারপর সর্দারকে ছইঢাকা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে শহরের দিকে নিয়ে চলে গেল। দলের সব লোক এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল। আমরা জনদশেক এখনও আছি। কিন্তু মুণ্ডছাড়া ধড় আর কি করবে বল? চুপচাপ বসে রয়েছি। আমাদের তোমার দলে নিয়ে নাও তারামা।

তারা খুব চিন্তিত ছিল। কোন উত্তর দিল না।

লোকটা বলল, একটা খবর পেয়েছি।

কি?

সাহেবটা কালেক্টর নয়, অন্য কি একটা নাম।

মেঘা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, ওই হচ্ছে ছিরিমান।

তারা মুচকি হাসল, ছিরিমান নয়, শ্লীম্যান।

সে আবার কে?

লাটসাহেবের লোক আমাদের খতম করার প্রতিজ্ঞা করেছে। তিলক সর্দার গেল। বাকী রইলাম আমি আর ফটিকচরণ।

NOT FOR SALE

চৈতন বলল, এবার থেকে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে তারামা। কিছুদিন না হয় চুপচাপ বসে থাকব। শিকারের লোভ করে দরকার নেই। কোথায় কোম্পানি কি ফাঁদ পেতে রাখবে বলা যায়।

তারা সায় দিল। বলল, সত্যি এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। দলের যারা নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যেতে চায় যাক। দরকার হলে ডেকে নেব। এখন আমাদের কিছুদিন চুপচাপ থেকে সাহেবদের হালচাল লক্ষ্য করে যাওয়া উচিত। একজনকে যখন ধরেছে, তখন মনে হয়, ওরা এদিকেও জাল বিছোবার চেষ্টা করবে।

নয়

কিন্তু চুপচাপ তারা বসে থাকতে পারল না। লোকে তাকে বসে থাকতে দিল না।

দিন কুড়ি পরেই তারা বাশুলীর মন্দির থেকে পূজা সেরে বাইরে এসেই চমকে গেল।

মন্দিরের সিঁড়ির সামনে জন ত্রিশেক লোক। অস্থিচর্মসার চেহারা, কোটরাগত চোখ, পথশ্রমে যেন ধুঁকছে।

তারাকে দেখেই সবাই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে বলল,

মা, আমাদের বাঁচাও!

তারা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে তোমরা?

আমরা রাইপুরের চাষী মা। পাঁচ কোশ পথ হেঁটে তোমার কাছে এসেছি।

আমার কাছে কেন?

তোমারই নাম শুনেছি। তুমি গরিবের মা। জমিদার আমাদের খেতের ফসল সব নিজের গোলায় আটকে রেখেছে। চালের মন দু টাকা। কি করে আমরা বাঁচবো মা বল?

জমিদারের কাছে গিয়ে বল তোমরা।

NOT FOR SALE

বলেছি মা। অনেক বলেছি। উত্তরও পেয়েছি, এই দেখ।

সামনের কয়েকজন চাষী পিছন ফিরে দাঁড়াল।

তাদের পিঠে চাবুকের রক্তাক্ত দাগ।

ইশ, এইরকমভাবে মেরেছে?

এ আর কি মা। কত লোককে দিনের পর দিন ঠাণ্ডাগারদে পুরে রেখেছে। পরে দেহগুলো খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। জমিদার নয় মা, পিশাচ।

ঠিক আছে, তোমরা মাঠে বিশ্রাম কর। আমি দেখি কি করতে পারি।

চাষীরা গাছের ছায়ায় বসল। তারা চরণকে ডেকে তাদের মুড়ি আর গুড় দিতে বলল।

দুপুরের দিকে সভা বসল।

তারা বলল, এমন তো নয়, এরা কারসাজি করে আমাদের বিপদে ফেলতে চায়? কোম্পানির লোকের সঙ্গে এদের যোগসাজশ আছে।

মেঘা জিভ কাটল, না তারামা, সে ভয় নেই। এরা সব আমাদের জানা লোক। মধু, পচা, ফকরে, নিতাই এরা কতবার উৎসবে এসেছে নেমন্তন্ন খেতে। কালুসর্দারের আমলে অনেক খবরাখবরও এনেছে।

তাহলে তো আমাদের সামনে শুধু একটা পথ খোলা আছে।

কি? কি পথ?

রাইপুরের জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করা।

তারপর?

তারপর গোলার চাবি নিয়ে গোলার দরজা খুলে দেব। গাঁয়ের চাষীরা ধান লুট করে নেবে। এতে একটা সুবিধা হবে চাষীরাও আমাদের দলের হয়ে যাবে। কোনরকম বাধা দেবে না।

মাটিতে লাঠি ঠুকে মেঘা বলল, খুব ভাল কথা তারামা। চুপচাপ বসে থেকে থেকে গা গতরে বাত ধরে গেল। তাহলে একটা দিন ঠিক করা হোক।

চৈতন বলল, ও আর দিন দেখাদেখি কি। তারামায়ের কাজ সর্বদাই শুভকাজ। আর দিন দশেক পরেই অমাবস্যা। সে রাতেই বেরিয়ে পড়া যাবে।

কিন্তু একটা কথা আছে। তারা বলল।

সবাই তারার দিকে মুখ ফেরাল।

NOT FOR SALE

কি কথা?

কালুসর্দারের দল কখনও বিনা চিঠিতে ডাকাতি করতে যায় না। আমরা যে যাব, সেটা রাইপুরের জমিদারকে চিঠি লিখে আগে জানিয়ে দেব।

দলের সকলেই যেন একটু বিব্রত বোধ করল।

মনা বলল, আগে থেকে জানান দেওয়াটা কি ঠিক হবে? দিনকাল খারাপ, আগের দিনের কথা ছেড়ে দাও। এখন যদি জমিদার কোম্পানির সিপাইয়ের সাহায্য নেয়? বন্দুক নিয়ে সবাই ওত পেতে বসে থাকে?

তারা ভ্রূ কোঁচকাল।

যাই হোক, কালুসর্দারের নিয়ম ভাঙতে পারব না। বিনা চিঠিতে আমাদের দল কোথাও যাবে না। বন্দুক আমাদেরও আছে। ভয়টা কিসের?

তাই ঠিক হল, অমাবস্যার দু দিন আগে চিঠি যাবে। অমাবস্যার রাত্রে দল গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে জমিদারবাড়িতে। তার আগে চৈতন আর পরান চাষীদের খবর দিয়ে দেবে, তারা যেন তৈরী থাকে।

চিঠি লেখবার সময় তারা বলল, কালিতে লিখলে চলবে না। এই দিয়ে লেখ।

পাশ থেকে বর্শার ফলা তুলে নিয়ে আস্তে আঙুলে বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্তের স্রোত বইতে শুরু করল।

আঙুলটা এগিয়ে দিয়ে তারা বলল, লাল অক্ষরে লেখ চিঠি। জমিদারের পড়তে সুবিধা হবে।

ঠিক অমাবস্যার দু দিন আগে চিঠি নিয়ে পরান ছুটল। রনপায়ে ভর দিয়ে।

তীরের ফলায় চিঠিটা আটকে ছুঁড়ে দেবে জমিদারের বাড়িতে।

সব ঠিক হল। কাজ শেষ করে পরান ফিরে এল।

রাইপুরের জমিদার পতাকী ঘোষাল। যেমন উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, তেমনই দুর্দান্ত প্রকৃতির। প্রজারা দু বেলা তার মরণকামনা করে। তিন কুলে কেউ নেই। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে স্ত্রী মারা গিয়েছিল। লোকে বলে পতাকী ঘোষালই বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল বউকে। তার কি একটা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছিল বলে।

NOT FOR SALE

খুব ভোরে উঠে পতাকী ঘোষাল ঘোড়ার পিঠে বেড়াতে বের হয়। অর্ধেক জমিদারিটা একবার চক্কর দিয়ে ফেরে। পথের ওপর প্রজার দেখা পেলে সপাসপ তার পিঠে চাবুক চালায়। একেবারে বিনা কারণে।

সেদিনও বেড়িয়ে বাড়িতে ফেরার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াসুদ্ধ। দেউড়ির ফটকের ওপর একটা তীর গাঁথা। তীরের মুখে চিঠি।

ঘোড়া থেকে নেমে পতাকী ঘোষাল একটানে তীরটা উঠিয়ে ফেলল। চিঠিটা পড়তে পড়তে তার দুটি চোখ আরক্ত হয়ে উঠল।

একজন পাইকের হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

কয়েক লাইনের চিঠি। লাল অক্ষরে লেখা। চিঠির কোণে রক্তাক্ত খাঁড়ার চিহ্ন।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

আপনার বিশাল ধনসম্পত্তি ও দুর্দান্ত চরিত্রের কথা আমরা অরণ্যবাসী হইয়াও অবগত আছি। দুইই কিঞ্চিৎ খর্ব করার মানসে আগামী অমাবস্যা রাত্রের দ্বিতীয় যামে সানুচর আপনার গৃহে পদার্পণ করিবার বাসনা রাখি। আপনি প্রস্তুত থাকিবেন।

আমাদের ভক্তিসহ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি
বাশুলীমায়ের দাসী
তারা।

স্পর্ধা! দাঁতে দাঁত চেপে পতাকী একটা কড়মড় শব্দ করল। মুখে চোখে হিংস্রভাব ফুটে উঠল।

ঠিক আছে, তুমি কতবড় বাশুলীমায়ের দাসী আমিও দেখে নিচ্ছি। মেয়েছেলের এত বাড় ভাল নয়।

অমাবস্যার দ্বিতীয় যাম। অমাবস্যা হচ্ছে কাল। হাতে সময়ও কম।

দুপুরের মধ্যে পতাকী ঘোষাল জমিদারির পর পাইক বরকন্দাজদের ডেকে পাঠাল। তারা আসতে বলল, এ জমিদারির ইমান রাখার ভার

NOT FOR SALE

তোমাদের ওপর। ডাকাত চিঠি দিয়ে শাসিয়েছে আমার ধনসম্পত্তি লুঠ করবে। বেইজ্জত করবে। কি তোমাদের মত বল?

সর্দার পাইকরা হাতের লাঠি তুলে চেঁচিয়ে উঠল, আমাদের জান থাকতে তা হতে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর।

কাল মাঝরাতে ওরা হানা দেবে। সম্ভবতঃ জমিদারবাড়িই আক্রমণ করবে। তোমরা সবাই দা, সড়কি, বর্শা নিয়ে জমিদারবাড়ি ঘিরে থাকবে। ওপরের বারান্দায় আমি নিজে থাকব বন্দুক নিয়ে। কিন্তু বরকন্দাজ রাখব একেবারে জমিদারিতে ঢোকবার মুখে। প্রথমে তারা বাধা দেবে। অবশ্য ডাকাতরা খুব চালাক। হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে আসে কিছু বলা যায় না। আমাদের সব দিকে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

আবার সর্দাররা লাঠি তুলে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিল।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। পতাকী ঘোষাল একরকম নিশ্চিন্ত হল। ডাকাতদের সাধ্য নেই তার জমিদারিতে ঢোকে। তিন পুরুষে তাদের এলাকায় কোনদিন ডাকাতি হয়নি। কেউ সাহস করেনি মাথা গলাতে।

এবার দেখা যাক বাশুলীর দাসীর কতটা বিক্রম।

পরের দিন ঠিক তিনটে নাগাদ পাইক বরকন্দাজরা চমকে দেখল অনেক দূরে ধুলো উড়িয়ে এক ঘোড়সওয়ার তীরবেগে আসছে।

পতাকী ঘোষাল লোহার আলমারি খুলে দামী অলংকারগুলো একবার মিলিয়ে নিচ্ছিল, পাইকদের চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি আলমারি বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে ঘোড়সওয়ার অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। মাথার টুপি খুলে হাত নেড়ে কি বলছে। প্রখর রৌদ্রে ঘোড়সওয়ারের সুগৌর রং দেখে বোঝা গেল লোকটা ইংরেজ।

পাইক বরকন্দাজরা তাদের হাতের অস্ত্র উদ্যত করে রেখেছিল, পতাকীর আদেশে সবাই সরে দাঁড়াল।

ঘোড়সওয়ার ফটক পার হয়ে উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। পতাকী ঘোষালও সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

NOT FOR SALE

ঘোড়সওয়ার টুপিটা বুকের কাছে রেখে অভিবাদন করে বলল, আপনি কি রাইপুরের জমিন্দার?

পতাকী ঘোষাল বলল, হ্যাঁ সাহেব।

আমি কলভিন। মহামান্য ইংরেজ বাহাদুরের সৈন্যবিভাগের লোক। আপনার কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনার জন্য আসিয়াছি।

বলুন।

দুর্গাপুর জঙ্গল ডাকাতের আস্তানা তা নিশ্চয় আপনি জানেন। এ ডাকাতরা মাঝে মাঝে আশপাশের লোকদের শান্তি নষ্ট করে। পথচারীর প্রাণনাশ করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে।

পতাকী ঘোষাল ঘাড় নাড়ল।

আজ আমরা ডাকাতের একটি দলকে গ্রেফতার করিতে চাই। খোঁজ পাইয়াছি তাহারা আপনার জমিদারির দিকেই আসিতেছে।

এবার পতাকী ঘোষাল আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। সাহেবের কাছ বরাবর। বলল, আমি আগেই খবর পেয়েছি ডাকাতরা আমার এখানেই হামলা করতে আসবে, মানে চিঠি দিয়ে তাই জানিয়েছে। আপনারা কি তাদের গ্রেফতার করেছেন?

প্রায়। তবে তাহারা দলে ভীষণ ভারী। আমাদের সৈন্য সংখ্যায় কিছু অল্প। লড়াই হইলে কি হইবে বলা যায় না। তাই আমাদের দলপতি আপনার কাছে পাঠাইলেন, আপনি আপনার লোক দিয়া সাহায্য করুন।

পতাকী ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে উঠল।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ আবার একটা কথা। এতে তো আমারই লাভ। দলটাকে জব্দ করার জন্য আমিও লোক তৈরী রেখেছিলাম।

কথার শেষে পতাকী দু'হাতে তালি বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে বল্লমধারী একজন পাইক এসে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল।

হুকুম করুন হুজুর।

জন দশেক পাইক এখানে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে সাহেবের সঙ্গে চলে যাও। যে ডাকাতের দলের আজ রাতে এখানে আসার কথা, তাদের ইংরেজের লোক আগেই আটকাতে চাইছে। তোমরা তাদের সাহায্য করবে।

NOT FOR SALE

পাইক আবার নমস্কার করে দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সাহেব ঘোড়ার পিঠে উঠতেই তার পিছন পিছন সবাই দল বেঁধে অনুসরণ করল।

তারা পথের বাঁকে না মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পতাকী ঘোষাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে নিজের মনে খুব হেসে নিয়ে বলল, যা শত্রু পরে পরে। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারুক, মাঝখান থেকে আমি বেঁচে যাব।

পতাকী ঘোষাল নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে ঢুকল।

দশ

মাঝরাতের একটু পরেই পতাকীর ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে দারুণ একটা হট্টগোল। চোখ চেয়ে দেখল মশালের আলোয় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একবার মনে ভাবল তার বরকন্দাজরা বোধহয় ডাকাতদের শায়েস্তা করে ফিরছে। তারপরই কিন্তু জয়ধ্বনির ভাষা শুনে চমকে উঠল।

তারামায়ীকি জয়! হা রে রে রে!

বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসেই পতাকী চিৎকার করে উঠল।

দু'পাশে বর্শাধারী দুজন ডাকাত। মাঝখানে খুব কমবয়সী একটি মেয়ে। কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ। এলো খোঁপা। চওড়া লালপাড় শাড়ি গাছকোমর বাঁধা। হাতে বন্দুক। বন্দুক ঠিক পতাকীর বুকের দিকে উদ্যত।

কে, কে তোমরা?

মেয়েটা মুচকি হাসল, বাশুলীমায়ের দাসী। এরাও মায়ের অনুচর।

কি চাই আমার কাছে?

তোমার গোলাঘরের চাবি।

গোলাঘরের চাবি তো আমার কাছে থাকে না।

তারা বন্দুক আরো এগিয়ে আনল। তাহলে আর আমার দোষ নেই। ভেবেছিলাম বিনারক্তপাতেই কাজ হবে। এক দুই তিন বলব। এর মধ্যে যদি চাবি না পাই, তাহলে ঘোড়া টিপতে বাধ্য হব।

NOT FOR SALE

পতাকী আর দ্বিরুক্তি না করে কোমরে বাঁধা চাবির গোছাটা ফেলে দিয়ে বলল, লাল সুতো বাঁধা বড় চাবিটা।

তারা বন্দুক সরাল না। মুখও ঘোরাল না। পতাকীর দিকে চোখ রেখেই বলল, মেঘা, চাবিটা তুলে নিয়ে চলে যাও। আমরা এখানে রইলাম। যদি ভুল চাবি দিয়ে থাকে, খবর দিও, পাষণ্ডকে এক গুলিতে নিকেশ করে দেব।

মেঘা নীচু হয়ে চাবির থোলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে নীচে নেমে গেল। মেঘার জায়গায় আর একজন বল্লমধারী এসে দাঁড়াল।

মিনিট কুড়ি পরেই বাইরে দারুণ চিৎকার শোনা গেল। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত চিৎকার।

তারামায়ের জয়! আমাদের প্রাণ বাঁচালে মা।

তারা বুঝতে পারল গাঁয়ের লোকেরা ধান নিয়ে যাচ্ছে গুদাম থেকে। তাদের আগেই বলে রাখা হয়েছিল।

পাছে কেউ তাদের চিনতে পারে, তাই সবাইকে মুখে কালিঝুলি মেখে আসতে বলা হয়েছিল। তারা তাই এসেছে। পতাকী ঘোষালের পাইকরা তাদের দেখে চিনতে পারবে এমন ভরসা কম। তাছাড়া কিছু পাইক আহত হয়েছে, বাকী সবাইকে বেঁধে ডাকাতরা একজায়গায় ফেলে রেখেছে।

গাঁয়ের চাষীদের চেনবার সুযোগও তারা পাবে না।

আওয়াজটা একেবারে মিলিয়ে যেতে তারা বলল, এবার জমিদারের ব্যবস্থা কর।

দু'জন লোক দু'দিক থেকে এগিয়ে এসে মোটা দড়ি দিয়ে পতাকীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। তারপর তাকে টানতে টানতে শোবার ঘরে এনে পালঙ্কের পায়ার সঙ্গে মোক্ষমভাবে বাঁধল। তার পরনের ধুতির কিছুটা খুলে মুখে গুঁজে দিল। যাতে সহজে না চেঁচাতে পারে।

বাঁধাছাদা শেষ হতে ডাকাতের দলের সাধুচরণ এগিয়ে গিয়ে বলল, পেন্নাম হই কত্তা। কেমন সাহেব সেজেছিলাম বলুন? একেবারে খাস ইংরেজ। আপনার পাইক বরকন্দাজরা জঙ্গলে বিশ্রাম করছে। কাল ভোরে ফিরবে। আসি কত্তা।

NOT FOR SALE

পতাকী দুটো চোখ বিস্ফারিত করে শুধু চেয়ে রইল। মুখ বাঁধা না থাকলে বোধহয় বিস্ময়ে চেঁচিয়েই উঠত।

তারাকে মাঝখানে নিয়ে দলটা দেউড়ি পার হয়ে গেল।

পতাকী অনেক চেষ্টা করেও বাঁধন খুলতে পারল না। সে শুধু একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হল, বাড়িতে এত সোনাদানা মোহর জহরত থাকতে ডাকাতদের ধানের গোলার ওপর লোভ কেন?

সম্ভবতঃ খাবার নেই। পয়সা দিলেই বা ডাকাতদের কে ধান বিক্রি করবে। কিন্তু পতাকীর কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করল। চালের দর দু'টাকা মন উঠেছে, আরও হয়তো কিছু উঠত। কলকাতায় চালান দিতে পারলে বেশ লাভ হত। পতাকীর একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল।

এদিকে রাইপুরের চাষীরা দু'হাত তুলে তারার জয়ধ্বনি করতে লাগল।

তারা তাদের বোঝাল, খুব সাবধান, এমন ভান করবে যেন এখনও তোমরা অভাবগ্রস্ত। জমিদারের কাছে দরবার করবে। নাহলেই তোমাদের সন্দেহ করবে। জানতে পারলে অত্যাচারের শেষ থাকবে না।

চাষীরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেল।

তারপর দিন কুড়ি আবার সব চুপচাপ।

এ পথ দিয়ে লোকচলাচল বেশ কমে গেল। মনে হল ইংরেজরা সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে পথের বিপদের কথা। হয়তো এমন কথাও বলেছে, শীঘ্রই এ সব জঞ্জাল দূর করে দেবে। ডাকাতদের সম্পূর্ণরূপে শায়েস্তা করবে, তারপর এ সব পথ দিয়ে লোকেরা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারবে।

কিছুদিন পরেই আর এক দুঃসংবাদ এল।

তারা ঘুমাচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় শব্দ।

তারার ঘুম খুব সজাগ। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ল।

দরজার গোড়ায় ভৈরব শুয়ে থাকে। কাছে বর্শা নিয়ে। সেও উঠে বসল।

কি ব্যাপার, এত রাত্রে দরজা ঠেলাঠেলি কেন?

NOT FOR SALE

ইংরেজরা আস্তানা ঘিরে ফেলল না তো।

ভৈরব দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

দরজার ওপারে মেঘা।

কি খবর মেঘা? তারা প্রশ্ন করল।

বড় খারাপ খবর মা।

এস, ভিতরে এস।

মেঘা চৌকাঠ পার হয়ে মেঝের ওপর বসল।

তারা প্রদীপের সলতেটা উসকে দিল। ঘরটা কিছু আলোকিত হল।

কি বল?

মেঘা বিরসকণ্ঠে বলল, ফটিকচরণকে খতম করে দিয়েছে।

খতম করে দিয়েছে? কে?

সাহেবরা।

কি করে?

বন্দুকের গুলিতে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলল না।

অনেক পরে তারা খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

সাহেবরা জঙ্গল ঘিরে ফেলেছিল নাকি?

না, তা ঘেরেনি। তবে অনেক সিপাই সান্ত্রী নিয়ে ফটিকচরণের দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছিল। শুধু ফটিকচরণই নয়, তার দলের আরো দশ পনেরো জন খতম।

আগে থেকে কেউ বুঝতে পারেনি?

বোধহয় না। অন্ধকার রাত্রে গুঁড়ি মেরে সিপাইরা এসেছিল। তাদের সঙ্গে রবার্ট সাহেব।

রবার্ট কে?

ওই যে লাটসাহেবের অনুচর ছিরিমান না কে?

শ্রীম্যান।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রবার্ট সাহেবকে নিয়োগ করেছে এ তল্লাট থেকে ডাকাতদের উৎখাত করতে।

NOT FOR SALE

তারা বসে ছিল। উঠে দাঁড়াল।

পায়চারি করতে করতে বলল, এবার তাহলে আমি বাকী, মানে আমরা। তাহলেই দুর্গাপুরের জঙ্গল সকলের পক্ষে নিরাপদ হয়, তাই না?

মেঘা মাথা নীচু করে বসে রইল। কোন উত্তর দিল না।

একটু পরে তারা বলল, এটা কবেকার ঘটনা?

পরশু রাতের। আজ একটু আগে ফটিকচরণের দলের দু'জন লোক এসেছিল, তারা বলল।

লোক দু'জন কি আমাদের দলে আসতে চায়?

না, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা রাজী হল না।

রাজী হল না?

উহুঁ। বলল, আর ডাকাতি নয়। ইংরেজরা যেরকম উঠে পড়ে লেগেছে, এ দেশে ডাকাতি করে আর খেতে হবে না। তারা নিজেদের দেশে ফিরে গেল। চাষবাস করবে।

রবার্ট সাহেবের দল কি এবার আমাদের দিকে আসছে?

না, ফটিকচরণের লাশ নিয়ে তারা বর্ধমান ফিরে গেছে। সেখান থেকে কলকাতা যাবে।

এতক্ষণে ভৈরব কথা বলল, তা লাশটা নিয়ে গেল কেন?

মেঘা উত্তর দিল, লাশটা দেখালে কোম্পানির কাছ থেকে বকশিশ পাবে। নাম হবে রবার্ট সাহেবের।

এবার আমরা কি করব বল?

তারার কণ্ঠে হতাশার সুর।

মেঘা বলল, তোমাকে আমি আর কি মতলব দেব তারামা। তুমি নিজে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখ।

আমার মনে হয় লুঠের মালগুলো আমাদের সরিয়ে ফেলা উচিত। সে সবের সাহেবরা খোঁজ না পায়।

তা না হয় করা যাবে। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা ভগ্নস্তূপ আছে। কোনকালে বোধহয় কোন জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল। এখন সাপখোপের আড্ডা। সব কিছু সেখানে সরিয়ে রাখা যেতে পারে।

NOT FOR SALE

ভগ্নস্তূপ?

হ্যাঁ, লোকেরা বলে, বর্গীরা জমিদারবাড়ি আক্রমণ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। অনেক কাল আগে। রতন সর্দারের আমলে মুসলমানদের ভয়ে একবার ধনরত্ন সব সেখানে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। গোলমালের আশঙ্কা কমতে আবার সে সব এখানে নিয়ে আসা হয়। এবারেও না হয় তাই করা যাবে, কিন্তু আমাদের কি ব্যবস্থা হবে?

আমরা একজোট হয়ে থাকব না। ছড়িয়ে থাকব। যদি কেউ নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যেতে চায়, বাধা দিও না। যেতে দিও। তারপর বিপদ্ কেটে গেলে আবার আমরা একসঙ্গে হব। শুধু তোমরা, মানে দলের প্রধান যারা, তারা আমার সঙ্গে থাক। পরামর্শ করার জন্য দরকার হবে। তবে আমার মনে হয়, আমাদেরও ঠাঁই বদল করা দরকার। আমাদের যেমন চর আছে, তেমনই ইংরেজেরও গুপ্তচর আছে। আমাদের ঘাঁটির সন্ধান রাখছে। কাজেই এখান থেকে সরে আমাদের আরো ভিতরে চলে যেতে হবে।

মেঘা ঘাড় নাড়ল, ভাল ব্যবস্থা। তাহলে কাল থেকেই মাল সরাবার আয়োজন করি। তারপর নিজেদের আস্তানা সরিয়ে নিয়ে যাব।

তাই হল। লুঠের মাল সব সরিয়ে ফেলা হল। দলের সবাইকে ডেকে বলে দেওয়া হল, যাদের যাবার জায়গা আছে, তারা যেন চলে যায়। দল বেঁধে এক জায়গায় থাকাটা বর্তমান অবস্থায় বিপজ্জনক, কারণ ইংরেজরা ডাকাতদের উচ্ছেদ করার জন্য বদ্ধপরিকর।

একথাও বলে দেওয়া হল সময় একটু অনুকূল হলেই আবার তাদের ডেকে আনা হবে।

যাবার সময় তাদের প্রত্যেককে নতুন ধুতি, উড়ানি আর অর্থ দেওয়া হল। তারাকে প্রণাম করে সবাই চলে গেল।

একটা অশথগাছে হেলান দিয়ে তারা চুপচাপ বসে রইল। এই দলে প্রবেশ করার দিন থেকে খুঁটিনাটি অনেক কথা তার মনে পড়ল। কালু সর্দার নিজে হাতে তাকে সব কিছু শিখিয়েছিল। দলের ভার যাতে নিতে পারে তার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিল। গোটা দলকে তারা যেমন ভালবাসত, তেমনই দলের সকলের ভালবাসাও সে অর্জন করেছিল।

NOT FOR SALE

কিন্তু এখন চারদিকের আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে দল রাখা হয়তো আর সম্ভব হবে না। এতদিন ইংরেজরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, অন্য কোন দিকে নজর দিতে পারেনি। এখন ইংরেজ এ দেশের বুকে আসন কায়েমী করে নিয়েছে, কাজেই যা কিছু উৎপাত বলে মনে করে, সব সরাবার চেষ্টা করবে।

এখন আমরা কি করব তারামা?

পাশেই চৈতন দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল।

চারদিকে চর পাঠিয়ে সন্ধান রাখতে হবে। ইংরেজরা কি করছে, কি তাদের মতলব, সেটা আগেভাগে জেনে নিতে হবে আমাদের। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, কারণ ওরা সংখ্যায় অনেক। হাতিয়ারও প্রচুর। তবে এটা ঠিক আমরা কেউ জীবন্ত ধরা দেব না। ওদের নাস্তানাবুদ করে তুলব।

দলের আর যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কেউই কোন কথা বলল না। সবাইয়েরই কেমন বিষণ্ণ ভাব। মনোবল যেন ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে তিলককে গ্রেফতার আর ফটিকচরণের মৃত্যুর সংবাদে এরা অসহায় হয়ে গেছে।

সারা দুর্গাপুরের জঙ্গলে এখন শুধু তারামায়ের দল। ইংরেজ এই দলকে ছেড়ে দেবে এমন আশা দুরাশা।

অনেক দিন চরেরা কোন খবর আনল না। সব চুপচাপ। সিপাইদের খোঁজ পাওয়া গেল না। সবাই সরে গেছে জঙ্গল থেকে। এটা তাদের কোন কৌশল কি না বোঝা গেল না। অবশ্য এমনও হতে পারে, রাজধানীতে তাদের জরুরী ডাক পড়েছে। তাই আপাততঃ ডাকাতদের চিন্তা ছেড়ে অন্য কাজে চলে যেতে হয়েছে।

তবে চর সজাগ রইল। ইংরেজদের গতিবিধির সামান্য খবর পেলেই যাতে তারাকে জানাতে পারে।

ঠিক এই সময় তারার কাছে একদিন একটি প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল। পরনে আধময়লা থান। রুক্ষ চুল। মুখ দেখে মনে হয় প্রৌঢ়া খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ।

তারা গাছের তলায় চুপচাপ বসেছিল।

NOT FOR SALE

আচমকা প্রৌঢ়াকে সামনে দেখে বলল।

কে? কে তুমি?

প্রৌঢ়া হাঁটু মুড়ে একেবারে তারার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

আমাকে তুমি চিনবে না মা। আমি নিরুপায় হয়ে তোমাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

সময় খুব খারাপ। শত্রুরা চারদিকে জাল পেতেছে। ছলে, বলে, কৌশলে তারাকে ধরাই তাদের উদ্দেশ্য।

তারা একবার এদিক ওদিক দেখল।

একটু দূরে চৈতন দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টি তারার দিকে।

তারা গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

আমার কাছে তোমার কি দরকার?

এবার প্রৌঢ়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

তুমি গরিবের মা। তোমার কথা চারপাশের সবাই জানে। তুমি আমাকে বাঁচাও।

প্রৌঢ়ার ভণিতায় তারা বিরক্ত হল।

আসল কথাটা কি বল না? কেবল তো কাঁদুনি গাইছ।

তারার ধমকে কাজ হল।

প্রৌঢ়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল।

বলছি মা, বলছি। সব কথা তোমাকে বলবার জন্যই তো এসেছি।

প্রৌঢ়া ভাল হয়ে বসল। মাটির ওপর। আস্তে আস্তে বলল।

আমার একটি মাত্র মেয়ে মা। বারো বছর প্রায় বয়স হতে চলল, এখনও বিয়ে দিতে পারলাম না। আমাকে যে নরকে যেতে হবে।

তা, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না কেন?

কি করে দেব মা। দেবার মুরোদ কোথায়?

তারা অল্পক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল।

বেশ, কত টাকা লাগবে বল, আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব।

শুধু টাকার জন্য আটকাচ্ছে না।

তবে?

NOT FOR SALE

তোমার যদি সময় থাকে তাহলে সব কথা বলি মা।

বল।

তারা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল।

প্রৌঢ়ার ভাবভঙ্গী দেখে তারা বুঝতে পারল তার কাহিনী অল্পকথায় শেষ হবে না।

ঠিক তাই।

প্রৌঢ়া সবিস্তারে বলতে শুরু করল।

আমার ওই একটি মাত্র সন্তান মা। ওর বয়স যখন ছ বছর, তখন ওর বাপ কলেরায় মারা যায়। সেই থেকে বুকে করে মেয়েকে মানুষ করেছি। সংসারের কুটোটি নাড়তে দিই নি।

নাম কি তোমার মেয়ের?

মেয়ের নাম থাকমণি। কি বলব মা, মেয়ে যেন সোনার প্রতিমা। যেমন রং তেমনই নাক, মুখ, চোখ আর চুলের ঢাল।

এই পর্যন্ত বলেই প্রৌঢ়া থেমে গেল।

আড়চোখে একবার তারার দিকে চেয়ে বলল।

অবশ্য রূপে তোমার পায়ের যোগ্য নয় মা। আমাদের ঘরের তুলনায় সুন্দরী।

তারা একটু বিব্রত হয়ে বলল। ঠিক আছে। বলে যাও।

হ্যাঁ, বলছি মা। রোজগারের কোন উপায় নেই। পরের বাড়ি ধান ভেনে, মুড়ি ভেজে কোনরকমে মা মেয়ের ভরণ-পোষণ চালাতাম। আকাল এল। চারদিকে নেই নেই রব। লোকেরই পেট চলে না। আমাকে কাজ দেবে কি!

এইখানে প্রৌঢ়া থেমে আঁচল দিয়ে কপাল মুছল। তারপর বলল।

সেই সময় ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়ল, মানে বাঁধা দিতে হল। এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না।

কার কাছে বাঁধা দিলে?

প্রৌঢ়া যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

এই অবেলায় তার নাম কি করে করি বল তো মা।

কেন?

NOT FOR SALE

আর কেন? তার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। সবাই তাকে বলে একাদশী ঘোষাল।

তারা হেসে ফেলল। বা, বেশ নাম রেখেছ তো।

হ্যাঁ মা, নাম করলে সেদিন আর পেটে অন্ন জোটে না। একাদশীর উপোস করতে হয়। তার কাছে সব বাঁধা দিলাম। ব্যস, সেই সর্বনাশের শুরু। এখন একাদশী ঘোষাল উলটো চাপ দিচ্ছে।

কিসের উলটো চাপ?

রোজ দু'বেলা এসে তাগাদা দিচ্ছে। দেনা শোধ কর।

প্রৌঢ়া আকুল দৃষ্টি মেলে তারার দিকে দেখল, তারপর বলল।

কোথা থেকে শোধ দেব বল তো মা? হাতে কি একটা কানাকড়ি আছে? আবার কি বলছে জান?

কি?

বলছে, যদি আমার কথা শোন, তাহলে তোমায় একটি পয়সা ধার শোধের জন্য দিতে হবে না।

বটে? তারা এবারে সোজা হয়ে বসল।

হ্যাঁ মা, কিন্তু নচ্ছার কি বলে জান?

তারা কোন কথা বলল না।

প্রৌঢ়া বলে গেল।

বলে, থাকর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, তাহলে বন্ধকী কাগজপত্র সব ছিঁড়ে ফেলব। তোমার বাড়ি জমি তোমারই থাকবে।

তারা রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বেশ তো তাই দাও না। তোমার মেয়েরও তো বয়স হচ্ছে।

প্রৌঢ়া সশব্দে একটা হাত নিজের কপালে ঠুকল।

মুখপোড়ার বয়স ষাটের কম নয়। বাড়িতে তিন তিনটে বউ। আর চেহারা কি বলব মা, ঠিক যেন বুড়ো চামচিকে।

তবে তো মুশকিল।

তাই তো বলছি মা, আমার হয়েছে উভয় সংকট। ওরকম একটা লোকের হাতে মেয়েকে দিতে পারি না, আবার না দিলে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করে পথে দাঁড় করাবে।

NOT FOR SALE

কত টাকা তোমার দরকার?

একশ টাকা ধার নিয়েছিলাম, একাদশী ঘোষাল বলছে সুদে আসলে তাই নাকি আড়াইশো টাকাতে দাঁড়িয়েছে।

বেশ, তুমি কাল এসে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।

কিন্তু তারার আশ্বাস-বাণীতেও প্রৌঢ়ার মুখ থেকে ভয়ের ছাপ গেল না।

সে বলল। সমস্যা তো এতে মিটবে না মা।

কেন?

একাদশী ঘোষাল টাকা নিতে যদি অস্বীকার করে?

তারা বিস্মিত হল।

কেন, অস্বীকার করবে কেন? টাকা ধার দিয়েছে, সুদসুদ্ধ টাকা শোধ দিয়ে দিচ্ছ। ব্যস, হয়ে গেল।

তার ঝোঁক আমার মেয়েকে বিয়ে করার দিকে।

তুমি যদি বিয়ে না দাও তার সঙ্গে তো কি করবে?

একাদশী ঘোষালকে তুমি চেনো না মা। সে সব পারে। তার হাতে অনেক লেঠেল। আমার মেয়ের বিয়েই বন্ধ করে দেবে। জোর করে মেয়েকে বিয়ের রাতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

পলকের জন্য তারার চোখ জ্বলে উঠল। দুটি ভ্রূর মাঝখানে বিরক্তির আঁচড়।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

ঠিক আছে, তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক কর। তারপর আমি আছি।

এবার প্রৌঢ়া আসল কথা বলল।

বিয়ের কথাবার্তা কিছুটা হয়েই আছে মা।

তাই নাকি? কোথায়?

গোবিন্দপুরের রাখালের সঙ্গে। ছেলেটা চাষবাস করে, বয়সও বেশী নয়।

বেশ, তুমি বিয়ের দিন ঠিক করে আমাকে জানিয়ে যেও।

প্রৌঢ়ার সন্দেহ গেল না।

কিন্তু বিয়ে দিতে কি পারব মা?

আমি নিজে যাব তোমার মেয়ের বিয়েতে। দেখি কে বিয়ে আটকায়।

NOT FOR SALE

এবার প্রৌঢ়ার মুখে হাসি ফুটল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

ঠিক আছে মা। আমি কালই একাদশী ঘোষালের কাছে যাব। সে টাকার কথা কি বলে তোমাকে জানিয়ে যাব।

আর একবার প্রণাম করে প্রৌঢ়া মেঠো পথ ধরে এগিয়ে গেল।

প্রৌঢ়া পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই চৈতন তারার কাছে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণ কি বকবক করছিল মেয়েছেলেটা?

তারা সব বলল। তারপর চৈতনকে প্রশ্ন করল।

তুমি একটা কাজ করতে পারবে চৈতন?

চৈতন অপ্রস্তুত হল। লাঠিটা তারার পায়ের কাছে রেখে বলল এ আবার কি কথা মা। আদেশ কর, কি করতে হবে।

তারা বলল। আমরা যেরকম অবস্থার মধ্যে রয়েছি, তাতে কাকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিছুই বলা যায় না, এ মেয়েছেলেটা হয়তো ইংরেজের চর। ফাঁদ পেতে আমাকে ধরার চেষ্টা করছে।

ঠিক বলেছ মা, কাউকে বিশ্বাস নেই। চারদিকে দুশমনের চর ঘুরছে।

তুমি এক কাজ কর চৈতন!

বল।

মেয়েছেলটা বেশীদূর যেতে পারেনি, তুমি ওর পিছন পিছন যাও। খোঁজ নিয়ে এস, যা বলে গেল, সব সত্যি কিনা।

ঠিক আছে মা। ওই মেয়েছেলেটার বাড়ি ধারে কাছেই হবে। আমি আজ রাতেই তোমার কাছে সব খবর নিয়ে আসব।

চৈতন কোমরের গামছা মাথায় বাঁধল। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

তারা কিছুক্ষণ চৈতনের দিকে দেখে বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করল।

খাওয়া দাওয়া সেরে তারা উঠানে বসেছিল, ঠিক সেই সময় চৈতন এসে দাঁড়াল।

এসে গেছি মা।

কি খবর চৈতন বল?

NOT FOR SALE

চৈতন একটু ব্যবধান রেখে তারার সামনে বসল।

মেয়েছেলেটা মিথ্যা বলেনি মা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে রতনপুরে থাকে। বাড়িতে শুধু ওর একটি মেয়ে। আর কেউ নেই। গিয়ে মেয়ের কাছে সব কথা বলছিল, আমি জানলায় কান রেখে সব শুনেছি।

কি বলছিল?

তোমার কথা মা। তারা মা অভয় দিয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটা কিন্তু অঝোরধারায় কেবল কাঁদছিল, আর বলছিল, আমার বড্ড ভয় করছে মা। লাঠিয়াল দিয়ে যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়। তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচব মা?

আহা, বেচারা। তারা সহানুভূতির সুরে বলল।

ওর মা ওকে অনেক বোঝাল। এমন সময় এক কাণ্ড।

কি কাণ্ড?

সেই মহাদেব ঘোষাল এসে হাজির।

কে মহাদেব ঘোষাল?

ওই যে যার কাছে এদের ভিটেমাটি সব বাঁধা।

একাদশী ঘোষাল?

হ্যাঁ, গাঁয়ের মুদির কাছে খবর পেলাম সবাই ওকে ওই নামেই ডাকে। একেবারে হাড় কৃপণ আর চামারের বেহদ্দ। এসেই লাঠি ঠুকে চিৎকার।

মেয়েছেলেটা বেরিয়ে এসে বোঝাল যে তিনদিনের মধ্যে ঘোষালের দেনা শোধ করে দেবে।

তাই শুনে ঘোষাল একটু যেন থমকে গেল।

চোখ মুখ কুঁচকে বলল, দেবে যে, টাকাটা কি আসমান ফুঁড়ে আসবে?

মেয়েছেলেটা বলল, সে খোঁজে তো আপনার দরকার নেই। আপনার টাকা পেলেই হল।

ঘোষাল বলল, হুঁ। তারপর মেয়ের বিয়ের কি করলে?

মেয়ের বিয়ে এখন দেব না।

NOT FOR SALE

তাই শুনে লাঠি ঠুকে যেতে যেতে ঘোষাল বলল।

বুঝতে পেরেছি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ঠিক আছে, মহাদেব ঘোষালের চোখে কি করে ধুলো দাও ঠাকরুন, আমিও দেখব। মেয়েটা সুখে থাকত, ভাল ঘরে বরে পড়ত, সেটা তাহলে ইচ্ছা নয়। ঠিক আছে। ঠিক আছে।

তারা বলল। চৈতন, তুমি এবার যাও। বিশ্রাম করো। বোঝা যাচ্ছে মেয়েছেলেটা সত্যি কথাই বলেছে।

চৈতন চলে যেতে তারা বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

খাবার নিয়ে মাসী অপেক্ষা করছিল।

তারা ঢুকতে বলল। কিগো বাছা, বিয়ে বিয়ে করে কি বলছিলে? কানে যেন এল।

তারা হাসল। আমার বিয়ে গো মাসী।

তারার কথা শুনে মাসী অবাক্।

ওমা সে কি গো? কবে? কার সঙ্গে?

কবে এখন বলতে পারছি না মাসী। দিনক্ষণ দেখতে হবে। আর বিয়ে বোধ হয় ইংরেজের সঙ্গে।

মাসী এবার একটু সরে এসে বসল।

কি মস্করা করছ?

মস্করা কেন হবে? ইংরেজের সঙ্গে বিয়ে বলেই তো সরকারের লোক আমার এত খোঁজ করছে। দেখতে পেলেই হাতে মালা জড়িয়ে, পায়ে মল পরিয়ে টেনে নিয়ে যাবে।

শেষদিকে তারার গলাটা যেন ভারী ঠেকল।

নাও বাছা খেতে বস। রাত অনেক হল!

মাসী হাই তুলতে তুলতে বলল।

তারা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুল বটে কিন্তু ঘুম এল না। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দলের দু'জন সারারাত কুটীর পাহারা দেয়।

দিনকাল খারাপ। শত্রুর শক্তি প্রবল। কোথা দিয়ে কি হয়ে যায় বলা যায় না।

NOT FOR SALE

তারাও বালিশের নীচে দা নিয়ে শোয়। মাথার কাছে দেয়ালে বন্দুক ঝোলানো থাকে। কখন কোনটার দরকার হয় কে জানে।

দু'দিন পরে প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল।

খাওয়া দাওয়ার পর তারা চুল খুলে রোদে বসেছিল।

সামনে ছায়া পড়তেই চোখ তুলে দেখল, প্রৌঢ়া দাঁড়িয়ে।

তারা মুখ তুলতেই প্রৌঢ়া তারাকে প্রণাম করল।

কি খবর?

প্রৌঢ়া বসল।

খবর তো এদিকে ভালই মা। পাত্রের খুড়ো এসে মেয়ে পছন্দ করে গেছে। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে সামনের মাসের দোসরা।

দোসরা? তাহলে হাতে আর ক'দিন আছে?

আজ হল গিয়ে তোমার সতেরোই। আর দিন পনেরো।

তাহলে তো আর দিনও বেশী নেই।

না মা, একলা মানুষ তো। সবই আমাকে করতে হবে।

তুমি কি টাকাটা আজ নিয়ে যাবে?

তুমি যদি দয়া কর, নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে মা।

আবার কি হল?

একাদশী ঘোষাল রাজী হচ্ছে না।

কিসে রাজী হচ্ছে না?

টাকা নিয়ে আমার জমিজমা ছেড়ে দিতে।

সেকি?

হ্যাঁ মা, ঘোষাল বলছে, টাকার তার দরকার নেই। মেয়ে দিতে হবে তাকে। গাঁয়ে একাদশী ঘোষালের চর চারদিকে মা। আমার মেয়েকে যে দেখতে এসেছিল, সে কথা ঠিক তার কানে গিয়েছে। আমাকে কি বললে জান মা?

কি বললে?

বললে, এসব কায়দা করতে যেও না ঠাকরুন, বিপদে পড়বে। আমি বেঁচে থাকতে, তোমার মেয়েকে কেউ গাঁয়ের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।

NOT FOR SALE

একটু বস, আমি আসছি। তারা উঠে ভিতরে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল একটা তোড়া হাতে করে।

এই নাও এর মধ্যে আড়াইশো টাকা আছে। গুনে নাও।

এ আর কি গুনব মা। তুমি দয়া করে দিচ্ছ, মাথায় করে নিচ্ছি।

প্রৌঢ়া দু হাতে টাকার তোড়াটা বুকে তুলে নিল।

প্রৌঢ়া চলতে শুরু করতেই তারা বলল। দাঁড়াও।

প্রৌঢ়া থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এতগুলো টাকা নিয়ে তোমার এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি একজন লোক সঙ্গে দিচ্ছি।

দলের একজন কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তারা তাকে হাততালি দিয়ে ডাকল।

সে কাছে এসে দাঁড়াতে বলল। তুমি এর সঙ্গে যাও। একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। প্রৌঢ়ার দিকে ফিরে তারা বলল। আর শোন।

বল মা।

মেয়ের বিয়ের ঠিক আগের দিন আমাকে খবর দিয়ে যাবে। বিয়ের দিন আমি যাব।

তুমি যাবে মা?

কথাটা প্রৌঢ়ার যেন বিশ্বাসই হল না।

যাব বইকি। যদি তোমাদের ঘোষাল মশাই গোলমাল করে, ঠেকাতে হবে তো।

হ্যাঁ, মা, আমার আর কেউ নেই। মনে হচ্ছে একাদশী ঘোষাল গোলমাল করবেই।

ঠিক আছে, তুমি আর দেরি কর না। অনেকটা পথ যেতে হবে।

হ্যাঁ, যাই মা।

প্রৌঢ়া আর একবার তারাকে প্রণাম করে চলতে শুরু করল। তারার লোকটি ঠিক তার পিছনে পিছনে রইল।

প্রৌঢ়া চলে যেতে তারা উঠে দাঁড়াল। কে আছ।

ধারে কাছে কেউ ছিল না। কেউ উত্তর দিল না।

তারা একটু এগিয়ে গেল।

NOT FOR SALE

একটা বাবলা গাছের নীচে জনাচারেক বসেছিল। তারাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল।

এই, একবার মেঘাকে খবর দাও তো। বল, খুব জরুরি দরকার, এখনই যেন দেখা করে।

দু'জন লোক ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। মিনিট পনেরোর মধ্যে মেঘা এসে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে তারা চাটাই পেতে শুয়েছিল, ঘুমায়নি। মেঘার ডাকে তারা উঠে বসল।

ভিতরে এস।

মেঘা ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

বস এখানে।

তারা চাটাইয়ের একটা কোণ দেখিয়ে দিল।

মেঘা কিন্তু চাটাইয়ের ওপর বসল না। মাটির ওপর বসল।

কি মা? কোথাও ডাকাতি করতে যেতে হবে? কোন খবর আছে?

তারা মাথা নাড়ল। না।

অস্ত্রশস্ত্রগুলো যে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল মা। আমরা অকেজো হয়ে যাচ্ছি।

তুমি তো জান মেঘা সময় আমাদের অনুকূল নয়। এখন কিছু করতে যাওয়া নিরাপদ হবে না। ইংরেজরা প্রতিজ্ঞা করেছে আমাদের উচ্ছেদ করবেই। আমরা নাকি দেশের শত্রু, সকলের শত্রু! শেষদিকে গলার আওয়াজ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠল।

তারা নিজেকে সংযত করে বলল। শোন মেঘা, তোমাকে বিয়ের নিমন্ত্রণে যেতে হবে।

মেঘা অবাক্।

বিয়ের নিমন্ত্রণে? কোথায়? আমাদের আবার কে নিমন্ত্রণ করবে?

রতনপুরে।

কিছু বুঝতে পারছি না মা। রতনপুরে আমাদের কে আছে?

সব কথাটা খুলে না বললে বুঝতে পারবে না।

NOT FOR SALE

তারা চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে মেঘাকে বোঝাল।

সব শোনার পর মেঘা হাসতে লাগল।

ঠিক আছে মা। লাঠি ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করছে। আমি দলের সবাইকে একবার বলে আসি। মেঘা বেরিয়ে গেল।

ঠিক সময়ে প্রৌঢ়া এসে হাজির। মা, এইবার যে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মা। কালই বিয়ে। আজ আর বেশীক্ষণ থাকতে পারব না মা। এখনই উঠব। কি যে হবে কিছু বুঝতে পারছি না।

কেন?

কাল থেকে একাদশী ঘোষালের লোক বাড়ির আশেপাশে ঘুরছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মা। আমরা যা করছি সব কিছুর ওপর নজর রাখছে।

রাখুক। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি তোমার কাজ করে যাও।

প্রৌঢ়া বলল। সবই তো করে যাচ্ছি মা, তবে ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

বিয়ের লগ্ন কখন?

মাঝ রাতে। আরো একটা মুশকিলে পড়ছি মা।

কি আবার মুশকিল?

কোন ভটচাজ আসতে চাইছে না একাদশী ঘোষালের ভয়ে।

ঠিক আছে, ভটচাজ আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

তুমি কখন যাবে মা?

আমি কাল বিকালের দিকে যাব।

বাড়ি চিনবে কি করে?

আমার যে লোক তোমার সঙ্গে টাকার তোড়া নিয়ে গিয়েছিল, সেই পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে।

তাহলে অভয় দিচ্ছ মা।

NOT FOR SALE

আমি অভয় দেবার কে? তুমি বাশুলীমাকে ডাক। তিনিই রক্ষা করবার মালিক। যা করবার, তিনিই করবেন।

প্রৌঢ়া বাশুলীমায়ের উদ্দেশে কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে শূন্যে প্রণাম করল, তারপর বলল। তাহলে ঠিক সময়ে যেও মা। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।

প্রৌঢ়া চলে গেল।

তারা অনেকক্ষণ দুটো হাত কোলের ওপর রেখে চুপচাপ বসে রইল।

হয়তো এই ব্যাপারের পর ইংরেজরা আরো তৎপর হবে। তারাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু যাই হোক, কথা যখন দিয়েছে, তখন তারাকে প্রতিশ্রুতি রাখতেই হবে।

পরের দিন বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পালকি এসে দাঁড়াল। তারার উঠানের ওপর। দু'জন বেয়ারা বয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে আর দু'জন।

মিনিট পনেরোর মধ্যে তারা বেরিয়ে এল।

পরনে লাল পাড় গরদের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। কপালে সিঁদুরের টিপ। দু'পায়ে আলতা।

শাড়ির ফাঁকে লুকানো ছোরাটা অবশ্য দেখা গেল না।

তারা পালকির কাছে এসে দাঁড়াতেই বেয়ারাগুলো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

জয়, তারামায়িকী জয়।

তারা হেসে নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল।

না, না, আমি এখন তারা মায়ী নয়, আমি চৌধুরীদের ছোট বউ। আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ার মেয়ের বিয়েতে চলেছি।

একজন বেয়ারা মাথা চুলকে বলল। তাহলে কি বলে জয়ধ্বনি করব মা।

কিছু বলতে হবে না। যা বলবার ঠাকুরমশাই বলবেন।

পাশেই পুরোহিত দাঁড়িয়েছিল। বাশুলী মন্দিরের পুরোহিত।

পরনে নামাবলি। টিকিতে জবাফুল বাঁধা।

পুরোহিত হাত নেড়ে বলল।

NOT FOR SALE

তোমাদের কিছু বলতে হবে না বাপু, কেউ খোঁজ নিলে, যা বলবার আমিই বলব।

তারা পালকিতে ওঠবার আগে একবার ফিরে দাঁড়াল।

একটু দূরে মেঘা দাঁড়িয়েছিল।

তারা তার দিকে দেখতেই সে এগিয়ে এল।

কিছু বলবে মা?

সব ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, সব ঠিক। সন্ধ্যার একটু আগেই আমরা রওনা হয়ে যাব। রতনপুরে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে পৌঁছাব।

তাহলে আমি চলি।

তারা পালকিতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল।

হুম, হুম, হুমনা, শব্দ করতে করতে বেয়ারা দু'জন পালকি নিয়ে ছুটল। পিছন পিছন বাকী দু'জন বেয়ারা আর পুরোহিত।

একটু চলার পরেই পুরোহিত চেঁচাল।

ওরে বাবাসকল, একটু আস্তে। আমি বুড়োমানুষ কি ওরকম দৌড়াতে পারি।

পথে কোন বাধা হল না।

নির্বিঘ্নে পালকি চলল।

রতনপুর গাঁয়ে ঢোকবার মুখে একটা বিরাট অশথ গাছ। বাঁধানো বেদী।

পালকি যখন অশথতলা পার হচ্ছে তখন শব্দ এল।

কে যায়?

পালকি-বেয়ারা দু'জন পালকি থামাল না, গতি মৃদু করল।

পুরোহিত বলল।

বাঁশখালির চৌধুরীবাড়ির ছোট বউ, কেন?

এই সময় তারা দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখল।

বাঁধানো বেদীর ওপর একটি কুৎসিত চেহারার বৃদ্ধ। হাতে হুঁকা। তার দু'পাশে আরো দুটি লোক বসে আছে।

তারা বুঝতে পারল এই হচ্ছে মহাদেব ঘোষাল।

NOT FOR SALE

ঘোষাল আবার প্রশ্ন করল। কাদের বাড়ি?

এবার পুরোহিত কোন উত্তর দিল না। চলতে আরম্ভ করল।

কি হে, কথা কানে গেল না?

এবারও পুরোহিত কোন কথা বলল না।

পিছন থেকে ঘোষাল বলল। বৃথাই যাচ্ছ। পালকি ফেরাও, ও বিয়ে হবে না।

কথা শেষ করে ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোক দুটোও।

তারা আস্তে আস্তে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

পালকি প্রৌঢ়ার বাড়ির কাছে যেতেই প্রৌঢ়া ছুটে এল।

পালকি থামল। দরজা খুলে তারা বেরিয়ে এল।

গাঁয়ের যে ক'জন ঝি বউ এসে জড় হয়েছিল, তারা উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

তারা প্রৌঢ়াকে একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল।

শোন, আমার আসল পরিচয় কাউকে দিও না।

না মা, তা দেব না, কিন্তু কি বলব?

কিছু একটা বল।

প্রৌঢ়া কি ভেবে বলল।

মাসীর মেয়ে বলব? আমার এক মাসীর মেয়ে দূরে থাকে।

বল।

প্রৌঢ়া তারাকে কোণের ঘরে নিয়ে বসাল।

এ ঘরে একটা আসনের ওপর কনে বসে আছে।

বিরস মুখ, যেন ভয়ার্ত মনে হল।

তারা তার কাছে যেতেই মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল।

তারা অবাক্ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল।

অপরূপ মুখশ্রী। রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু কালো চুলের ঢাল কোমর ছাপিয়ে পড়েছে। নিটোল গড়ন।

NOT FOR SALE

তারা মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে বলল। তোমার নাম কি?

থাক, থাকমণি।

ও, তোমার মার কাছে শুনেছিলাম নামটা, মনে ছিল না।

তারা একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখল।

পাড়ার বউঝিরা কেউ ধারে কাছে নেই। যে যার কাজে লেগে গেছে।

তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।

আমাকে চেন?

থাক মাথা নাড়ল। না।

তোমার মা আমার কথা কিছু বলেনি তোমায়?

বলেছিল, কে একজন আসবেন। খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।

নিজের মেয়ের কাছেও যে প্রৌঢ়া তারার পরিচয় দেয়নি, এ কথা ভেবে তারা খুব খুশীই হল।

আজ তোমার বিয়ে, কিন্তু তোমার মুখটা এত শুকনো কেন?

থাক ঘাড় নীচু করে রইল। তারা থাকর কাঁধে একটা হাত রাখল। কি, বল?

আমার বড় ভয় করছে।

কিসের ভয়?

মনে হচ্ছে আমার বিয়ের সময় একটা গোলমাল হবে।

কিসের গোলমাল?

থাক একবার তারার দিকে চেয়েই মুখ নামাল।

মাকে জিজ্ঞাসা করবেন। মা বলবে আপনাকে।

তুমি একাদশী ঘোষালের কথা বলছ তো?

থাক চমকে উঠল।

আপনি জানেন সব?

কিছু কিছু জানি। তোমার মা বলেছে। আমি বলছি শোন, কোন ভয় নেই। একাদশী ঘোষাল তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

থাকর চোখে অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠল।

সেটা তারার চোখ এড়াল না। তারা বলল।

NOT FOR SALE

আমার কথা বিশ্বাস কর থাক, কিছু হবে না। তোমার আঁচলে আমি বাশুলী মায়ের পূজার ফুল বেঁধে দিচ্ছি, কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তারা সত্যি সত্যিই নিজের আঁচল থেকে ফুল আর বেলপাতা নিয়ে থাকর মাথায় ছুঁইয়ে তার আঁচলে বেঁধে দিল।

রাত একটু হতেই কনেকে সাজাবার উদ্যোগ শুরু হল।

প্রৌঢ়া তারাকে বলল। তুমিই থাককে সাজিয়ে দাও মা।

তারা মাথা নাড়ল।

না, আমার কিছু করা ঠিক হবে না। আমি সংসারী নই, এসব শুভ কাজে আমার থাকা উচিত নয়। আমি এসেছি শুধু তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য।

তারা জানলার ধারে চুপচাপ বসে রইল।

কনে সাজানো তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ গোলমাল শুরু হল।

একটা লোক ছুটতে ছুটতে উঠানে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করল।

থাকর মা, ও থাকর মা।

প্রৌঢ়া বোধ হয় এই রকম একটা সংবাদের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। কি হয়েছে তারক?

সর্বনাশ হয়েছে থাকর মা। একাদশী ঘোষালের লোক জামাইয়ের পালকি আটকেছে।

ওমা, কি সর্বনাশ হল গো!

প্রৌঢ়া উঠানের ওপর আছড়ে গিয়ে পড়ল।

সব কথাগুলোই তারার কানে গিয়েছিল। সেও বাইরে এসে দাঁড়াল।

কোথায় আটকেছে পালকি?

একেবারে গাঁয়ের মুখে অশথতলায়।

লোক ক'জন?

তা প্রায় জন ছয় সাত লেঠেল হবে।

তারা ফিরে এল।

NOT FOR SALE

বাড়ির পিছন দিকে শরবন, আসশেওড়া আর ঘোড়ানিম গাছের জঙ্গল। কোমর থেকে ছোট একটা রামশিঙ্গা বের করে তারা বাজাল।

একবার, দুবার, তিনবার।

শরবন দুলে উঠল। আসশেওড়া আর ঘোড়ানিমের ডাল থেকে ঝুপঝাপ শব্দ।

ঝাঁকড়া চুল, মাথায় লাল কাপড়ের ফেটি বাঁধা, হাতে কারো ভোজালি, কারো বর্শা। জন কুড়ি পঁচিশ অনুচর তারাকে ঘিরে দাঁড়াল।

চল, গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

বাশুলী মায়িকী জয়। তারা মায়িকী জয়।

গাছপালা, ঝোপঝাড়, রাত্রের আকাশও কেঁপে উঠল।

চল।

তারার মাথায় ঘোমটা নেই। আঁচল কোমরে বাঁধা। চুল খোলা। হাতে ঝকঝকে ছোরা।

আগে তারা, পিছনে যমদূতের মতন অনুচরের দল। বাতাসের বেগে বেরিয়ে গেল।

সেই অশথতলার একটু আগে।

পালকি পথের ওপর। পালকি ঘিরে জন চারেক লাঠিয়াল। বাঁধানো বেদীর ওপর মহাদেব ঘোষাল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে।

হা রে রে রে।

তারার অনুচররা লাঠিয়ালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারা মায়ীকি জয়।

লড়াই আর হল না। তারার নাম শুনেই লাঠিয়ালদের হৃৎকম্প শুরু হয়েছিল। মাথার ওপর বর্শার খোঁচা লাগতেই সবাই পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

তারা নিজে গিয়ে দাঁড়াল মহাদেব ঘোষালের সামনে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল। চল, বিয়ের লগ্নের আর দেরি নেই।

মহাদেব ঘোষাল কাঁপতে কাঁপতে সটান শুয়ে পড়ে তারার দুটো পা জড়িয়ে ধরল। দোহাই মা, আমি কিছু জানি না। আমি বুড়োমানুষ, বসে তামাক খাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই হাঙ্গামা।

NOT FOR SALE

তারা ডান হাতটা তুলল।

অন্ধকারের মধ্যেও ঝকঝক করে ছোরার ফলা জ্বলে উঠল।

একটা কথা নয়। চল, আমাদের সঙ্গে।

মহাদেব ঘোষালের কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়ানো ছিল, তারা সেটা পাকিয়ে তার গলায় টেনে দিল।

বাঁচাও মা, আমি নিরপরাধ।

মেঘা।

আর কিছু বলতে হল না। মেঘা ছুটে এসে সবেগে ঘোষালের গালে একটা চড় বসাল।

ঘোষাল ছিটকে পড়ল হুঁকার ওপর। কলকে থেকে আগুন ছিটকে তার গায়ে গিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাহি চিৎকার।

ওরে বাবারে পুড়ে মলুম। তোমার দুটো পায়ে পড়ছি মা, আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছু জানি না।

তারার দু'জন অনুচর ঘোষালকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল।

প্রৌঢ়ার উঠানে আর তিলধারণের জায়গা নেই। খবর পেয়ে এপাশ ওপাশ থেকে বহু লোক এসে জড় হয়েছে।

একেবারে প্রথমে মহাদেব ঘোষাল। দু'পাশে মেঘা আর চৈতন। তাকে ঠেলা দিতে দিতে নিয়ে আসছে।

পিছনে তারা। হাতে ছোরা।

তারপর পালকি। পালকিতে বর আর বরের খুড়ো। পালকি ঘিরে তারার অনুচরবৃন্দ।

উঠানের ওপর দাঁড়িয়ে তারা বলল।

কই গো তোমরা শাঁখ বাজাও, উলু দাও, একাদশী ঘোষাল এসেছে বিয়ে করতে।

সবাই হেসে উঠল।

যতক্ষণ বিয়ে হল, মহাদেব ঘোষালকে উঠানের পাশে আমগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। বিয়ের পর তারা বাসরঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

NOT FOR SALE

রাখালকে ডেকে বলল। শোন।

রাখাল তারার সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমার দেশে কে আছে?

রাখাল বলল। কেউ নেই, শুধু এই খুড়ো। খুড়ী দু'বছর আগে মারা গেছে।

তাহলে এক কাজ কর, তোমার শাশুড়ীকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। বুঝতেই তো পারছ, ঘোষাল এ গাঁয়ে তোমার শাশুড়ীকে থাকতে দেবে না। অত্যাচার করবে। বার বার তো আর আমার আসা সম্ভব নয়।

রাখাল খুশী।

তাহলে তো ভালই হয়। মা যদি আমাদের সঙ্গে যায়, তাহলে সংসারের ভাবনা আর থাকে না। এ বাড়িঘর তো ঘোষাল মশাইয়ের কাছে বাঁধা। এ বাড়িঘর ছাড়তেই তো হবে।

হ্যাঁ, তা হবে। অবশ্য সে ব্যবস্থাও আমি করতে পারি। একাদশী ঘোষালকে টাকা দিয়ে বাড়ি জমি ছাড়িয়ে নেওয়াও যায়, কিন্তু বললাম যে, তোমার শাশুড়ীর এখানে থাকা মুশকিল।

রাখাল বলল। ঠিক আছে, মা আমাদের সঙ্গেই যাবে।

এবার তারা প্রৌঢ়ার কাছে গেল।

আমি চলি।

ওমা সেকি কথা, তুমি কিছু মুখে দিলে না মা। রাত ভোর হোক, তখন যাবে।

আমি আর কিছু খাব না। একটু মিষ্টি হাতে দাও। বরং আমার দলের যারা এসেছে, সম্ভব হলে তাদের খাইয়ে দাও।

প্রৌঢ়া বলল।

তাদের খাইয়ে দিয়েছি, তুমি একটু বস মা, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।

প্রৌঢ়া পাশের ঘরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এল। হাতে কলাপাতার ওপর কিছু মিষ্টি।

খেতে খেতে তারা বলল।

NOT FOR SALE

আমি তোমার জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। তুমি কাল মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে চলে যাও। বুঝতেই পারছ, এরপর তোমার এখানে থাকতে অসুবিধা হবে।

প্রৌঢ়া একগাল হেসে বলল।

তাহলে তো বেঁচে যাই মা। একটি মাত্র মেয়ে, তাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

তারা যখন খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল, তখন প্রৌঢ়া তার হাতে একটা পুঁটলি দিল।

এটা কি?

ওই আড়াইশো টাকা, যেটা তুমি দিয়েছিলে। আমি যখন গাঁ ছেড়েই চলে যাচ্ছি, তখন তো আর ও টাকাটা দরকার হচ্ছে না।

তারা পুঁটলিটা প্রৌঢ়ার হাতে ফেরত দিয়ে বলল।

ও টাকাটা আমি তোমার মেয়ে জামাইকে যৌতুক দিলাম। তুমি এটা রেখে দাও।

প্রৌঢ়া পুঁটলিটা বুকে চেপে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

তোমার দয়া আমি জীবনে ভুলব না। যাবার আগে একবার আমার মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করে যাও মা। এরা যেন সুখী হয়।

বেশ, চল। তারা বাসর ঘরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

থাক একপাশে ঘুমাচ্ছে। মুখে কনেচন্দন আঁকা। ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস।

রাখাল দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। তারও দুটি চোখ বন্ধ।

প্রৌঢ়া ওদের জাগাতে যাচ্ছিল, তারা বারণ করল।

না, না, ছেলেমানুষ, ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদের ডেক না। আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি।

এর পর তারা উঠানে এসে দাঁড়াল। মহাদেব ঘোষালের সামনে।

এবার আমাকে ছেড়ে দাও মা। বাঁধন খুলে দাও, তোমার সামনে নাক কান মলছি। আর জীবনে এ কাজ করব না।

তারা ঘোষালের কথার কোন উত্তর না দিয়ে মেঘার দিকে ফিরে বলল।

NOT FOR SALE

তোমরা ক'জন থাক। মেয়ে জামাই আর মেয়ের মা গাঁ পার হয়ে গেলে, তবে বুড়োকে ছাড়বে।

তারা পালকিতে উঠল।

দলের কয়েকজন আর পুরোহিত পিছনে রয়ে গেল। মেয়ে জামাই রওনা হলে তবে আসবে।

সারাটা পথ তারা চিন্তামগ্ন রইল।

চোখ বন্ধ করলেই ভেসে উঠল থাকমণির বধূর বেশ।

এ ভাবে ডাকাতেরা যদি তাকে হরণ করে নিয়ে না আসত, তাহলে কবে তারার বিয়ে হয়ে যেত।

এই রকম ইংরেজের ভয়ে বনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকতে হত না।

কিছুক্ষণ পরেই তারা মাথাটা ঝেড়ে চিন্তা দূর করার চেষ্টা করল।

ছি, ছি, এসব কি ভাবছে।

কালু সর্দার তাকে দলের ভার দিয়ে গেছে। বাশুলীমায়ের পা ছুঁয়ে তারা এই দায়িত্ব মাথায় নিয়েছে। সমস্ত দলের মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তা তার।

এই দলের প্রত্যেকটি মানুষ তারার একটি কথায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।

দলের চিন্তা ছেড়ে তারা নিজের চিন্তা করছে।

তারা বাশুলীমায়ের নাম জপ করতে শুরু করল।

যাতে অন্য চিন্তা ধারে কাছে না আসে।

পরের দিনই তারা দলের সর্দারদের ডেকে পাঠাল।

তারা আসতে বলল।

সত্যিই আমরা বড় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। আবার জোর দিয়ে তোমরা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বন্দুকের তাগ শুরু কর।

মেঘা বলল।

এই সময় হই হই করাটা কি ঠিক হবে তারা-মা? আপাততঃ ইংরেজের চর ধারে কাছে নেই বটে, কিন্তু কখন কোথা দিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক আছে?

তারা গম্ভীরকণ্ঠে বলল।

NOT FOR SALE

একদিন তো মরতেই হবে মেঘা। ইংরেজ তাড়া করে টুঁটি চেপে ধরে বন্দুকের গুলিতে মারবে, তার চেয়ে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে করতে মরব। আমরা বাশুলীমায়ের আশ্রিত। মরতে আমাদের ভয় নেই।

সারা দল আবার মেতে উঠল।

মাঝে মাঝে তারাও নেমে যেত তাদের সঙ্গে।

পাকা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলত।

নাও, তোমরা ঢেলা ছোড়। লাগাও আমার গায়ে, দেখি।

চারদিক থেকে ঢিল পড়ত, কিন্তু একটাও তারার শরীর ছুঁতে পারত না। লাঠির ঘায়ে সব গুঁড়িয়ে যেত।

সারাটা দিন তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কাটত, কিন্তু রাত হলেই তারা একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ত।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করত। ঘুম আসত না। অদ্ভুত সব ছবি চোখের সামনে ভাসত।

দিনকয়েক পরেই তারা বলল। এবার ঘটা করে বাশুলীমায়ের পূজা করব।

পুরোহিত বলল।

কিন্তু মা, এ তো মায়ের পূজার সময় নয়।

তারা একটু ইতস্ততঃ করে বলল।

কাল রাত্রে মা স্বপ্ন দিয়েছেন। পূজা চান।

এর ওপর আর কথা চলে না।

পুরোহিত বলল। ঠিক আছে মা সামনের অমাবস্যাতেই ব্যবস্থা করব।

তবে একটা কথা।

পুরোহিত ফিরে দাঁড়াল। কি মা?

এবার আর চারপাশের গাঁয়ের লোকদের বলার দরকার নেই। দিনকাল খারাপ। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে শত্রুর চর ঢুকে পড়া বিচিত্র নয়।

তাই ঠিক হল। মায়ের পূজায় এবার আর অতিথিভোজন হবে না। শুধু মন্দিরের মধ্যে পূজার উৎসব।

সকাল থেকে তারা একলা পূজার সব কাজকর্ম করল। মালা গাঁথা, ফল কাটা, নৈবেদ্য সাজানো।

NOT FOR SALE

তারপর পুরোহিত যখন পূজায় বসল, তখন তারা তার পাশে বসল। দুটি চোখ নিমীলিত, দুটি হাত বুকের উপর জড় করা।

মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে তারার শরীর দুলতে লাগল। চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

আশপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, মেঘা, চৈতন, পরাণ তারা সবাই অবাক্ হয়ে গেল।

পূজা শেষ হবার পরও তারা আবিষ্টের মতন চুপচাপ বসে রইল।

তারপর একসময়ে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতেই, একজন চর এসে নমস্কার করে বললে। খবর আছে মা।

খবর? কিসের খবর?

এক জমিদার শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছেন। সঙ্গে অনুচরের সংখ্যা খুব কম। তবে গোপনে প্রচুর অর্থ নিয়ে চলেছেন। নিজে একেবারে গৈরিক পোশাক পরেছেন। গলায়, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। সঙ্গে বিগ্রহ। বিগ্রহ শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছেন। জগন্নাথদেবকে স্পর্শ করিয়ে ফিরিয়ে এনে নিজের জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বোধহয় শ্রীক্ষেত্রে পূজা দেবার উদ্দেশ্যেই প্রচুর অর্থ নিয়ে চলেছেন। অনেকগুলো ঢোলকের মধ্যে অর্থ ভরে নেওয়া হয়েছে। যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

তারা দলের চাঁইদের সঙ্গে বৈঠকে বসল।

খুব সম্ভবতঃ জমিদারের ধারণা হয়েছে যে দুর্গাপুরে ডাকাতদের উৎপাত আর নেই। ইংরেজরা তাকে হয়তো এই কথাই বুঝিয়েছে। সেই জন্যই সঙ্গে জমিদার বেশী অনুচর নেয়নি।

এই আমাদের অপূর্ব সুযোগ। কোম্পানির বরকন্দাজ যে কোন কারণেই হোক সরে গেছে। এতগুলো টাকা নির্বিবাদে আমাদের এলাকা পার হয়ে যাবে, এ কিছুতেই হতে দেওয়া উচিত নয়।

দলের সবাই চিৎকার করে তারাকে সমর্থন করল।

তারা বলল, চরের মুখে খবর পেলাম পুরন্দরপুরের চটিতে রাত কাটিয়ে জমিদার ভোরবেলা রওনা হবে। তার মানে এখান দিয়ে যাবে রাতের দ্বিতীয়

NOT FOR SALE

প্রহরে। তোমরা সব তৈরী হয়ে নাও। এবার আর কোন কৌশল নয়। সদলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। তবে এ অভিযানের পুরোভাগে থাকব আমি।

এবারেও চাঁইরা হাতের লাঠি আকাশে তুলে তারার জয়ধ্বনি করল।

সন্ধ্যার একটু পর থেকেই সবাই তৈরী হতে শুরু করল। দলের আর সবাই মুখে কালি ভুসো মেখে নিল, কেবল তারা ছাড়া।

সে হেসে বলল, না, আমি কিছু মাখব না। ওসব মেখেও নিজেকে লুকাতে পারব না। সবাই বুঝতে পারবে আমি মেয়ে। আর দুর্গাপুরের জঙ্গলে মেয়ে ডাকাত এই একজনই আছে, তারা।

বেশ একটু অন্ধকার হতে সবাই রওনা হল।

ঘোড়ার পিঠে তারা। তাকে ঘিরে আর সবাই। প্রায় সকলের হাতেই বন্দুক, কোমরে ছোরা। শত্রু খুব কাছে এসে গেলে বন্দুকে সুবিধা হয় না, তখন ছোরাই ভাল। শুধু তারা হাতে বর্শা নিল। অবশ্য তার কোমরেও ছোরা।

আজ প্রায় সারা দুপুর তারা বাশুলীর মন্দিরে কাটিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতজোড় করে বসে থেকেছে মূর্তির সামনে। পূজো দিয়েছে।

এতদিনের গড়ে তোলা একটা দলের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তার কারণ শুরু হয়েছে। তারার অধিনায়কত্বের সময় যদি দল ভেঙে দিতে হয়, বা দল ধরা পড়ে তাহলে তারার লজ্জা সবচেয়ে বেশী।

সেই অপমান যেন তার জীবনে না আসে তারা বাশুলীমায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই জানিয়েছিল।

ঝোপের পিছনে সবাই বসল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। এধারে ওধারে শুধু জোনাকির মেলা। একটু দূরে দূরে শেয়াল ডেকে চলেছে। মশার উৎপাতও বড় কম নয়। দলের প্রায় সবাই গায়ে বেশ করে সরষের তেল মেখে আসে। মশা যাতে গায়ে বসতে না পারে। আর একটা কারণও আছে। কেউ ধরলে যাতে পিছলে যেতে পারে।

শুধু একটা জিনিসে তাদের একটু ভয়। সাপ। এ জঙ্গল বিষধর সাপের আস্তানা। যাদের স্পর্শে মৃত্যু। তাই মাঝে মাঝে সবাই বন্দুকের বাঁট মাটিতে ঠুকছিল। শব্দে যাতে বিষধর না আসে।

NOT FOR SALE

অনেকক্ষণ পরে পথের বাঁকে আলো দেখা গেল। মশালের আলো। সবাই টান হয়ে দাঁড়াল।

তার একটু পরেই বট আর পাকুড় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দু'জন মশালধারী ছুটে আসছে। তার পিছনে গোটা চারেক অস্ত্রধারী পাইক। তাদের মাঝখানে পর পর দুটো পালকি।

দুটো পালকি দেখে তারা একটু চিন্তিত হল। দুটো কেন? একটায় সম্ভবতঃ জমিদার, আর একটায়?

এমন তো নয়, একটা পালকিতে ইংরেজের সশস্ত্র সৈনিক কিংবা রবার্ট সাহেব নিজেই রয়েছে বন্দুক উঁচিয়ে।

এতখানি এগিয়ে এসব চিন্তা করার কোন মানে হয় না। এখান থেকে ফিরে যাওয়া মানে অপমানের চূড়ান্ত। দলের লোকরা মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু মনে মনে টিটকারি দেবে এমন সর্দারকে যে পিছিয়ে আসে। পিছিয়ে আসার মানেই বেইজ্জত হওয়া।

তারা বলল, তোমাদের বন্দুকে গুলি ভরা আছে তো?

সবাই ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ আছে।

ওই দেখ পর পর দুটো পালকি আসছে। এমনও হতে পারে একটাতে বন্দুক নিয়ে ইংরেজ সিপাই বা খোদ রবার্ট সাহেবও থাকতে পারে। আমাদের খুব সাবধানে আক্রমণ করতে হবে। শোন, কাছাকাছি গিয়ে আমরা যেমন হুংকার ছাড়ি, তেমনই ছাড়ব। দেখা যাক, পালকির দরজা খুলে কেউ উঁকি দেয় কিনা।

তাই হল, সড়কের কাছাকাছি গিয়েই সবাই বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠল।

বাশুলীমায়ের জয়! তারামায়ের জয়!

কাজ হল। অনুচরগুলো থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মশালধারীরা জোরে জোরে পা ফেলে রাস্তা ছেড়ে নাবাল জমি বেয়ে চলতে আরম্ভ করল।

প্রথম পালকির দরজা খুলে গেল।

গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, রামলাল আমাকে বন্দুকটা দাও।

পাশের অনুচর বন্দুকটা পালকির দরজার দিকে এগিয়ে দিল।

NOT FOR SALE

বোঝা গেল প্রথম পালকিতে জমিদার। কিন্তু পরের পালকির দরজা খুলল না।

তারার সন্দেহ দৃঢ়তর হল। সাধারণতঃ ডাকাতদের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সবাই পালকির দরজা খুলে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করে। কোন্ দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে। যারা আক্রমণ করছে তারা সংখ্যায় কত জন।

তারা ফিসফিস করে বলল, তোমরা বন্দুক নিয়ে দ্বিতীয় পালকিটা ঘিরে ফেল। আমার মনে হচ্ছে ভিতরে গোলমেলে ব্যাপার আছে। দু'জন শুধু আমার সঙ্গে এস। জমিদারকে আমি শায়েস্তা করতে পারব।

একসঙ্গে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারা বর্শা দিয়ে প্রবলবেগে জমিদারের কবজির ওপর আঘাত হানল। তার বন্দুকটা ছিটকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে গেল।

জমিদার চিৎকার করে উঠল, খবরদার আমার বিগ্রহ কেউ স্পর্শ করবে না। তোমরা নীচ, মহাপাতকী, তোমরা বিগ্রহ স্পর্শ করলে বিগ্রহ অপবিত্র হয়ে যাবে। সে বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না।

জমিদার বিগ্রহ আগলে পালকির মধ্যে উপুড় হয়ে রইল।

তার হাতের ফাঁক দিয়ে তারা স্পষ্ট দেখতে পেল, শুধু বিগ্রহ নয়, গোটা তিনেক বড় আকারের ঢোলকও রয়েছে পাশাপাশি।

তাহলে চর মোটেই ভুল খবর দেয়নি। ওই ঢোলক ভরতি সোনা আর টাকা।

সরে যাও, নইলে খতম করে দেব।

নিজের কণ্ঠের কর্কশতায় তারা নিজেই বিস্মিত হল। যে ভাবে জমিদার তাদের নীচ, মহাপাতকী বলে গালিগালাজ করেছে, তাতে এমনিতেই তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর বিগ্রহ সামলানোর নাম করে জমিদারের অর্থ বাঁচাবার চেষ্টা দেখে তারা ধৈর্য হারাল।

না, কিছুতেই নয়। আমাকে না মেরে আমার বিগ্রহ ছুঁতে পারবে না।

বেশ, তাই হোক।

তারা সবলে হাতের বর্শা জমিদারের পিঠে ঢুকিয়ে দিল। একটা আর্তনাদ, ফিনকি দিয়ে রক্তস্রোত ছুটল। তারার শাড়ি ভিজে গেল সেই রক্তে। এতক্ষণ

NOT FOR SALE

বাহকরা পালকি ধরে থরথর করে কাঁপছিল, এবার পালকি ফেলে দিয়ে যে যেদিকে পারল তীরবেগে ছুটতে লাগল।

পিছনের পালকিটা বাহকরা আগেই রাস্তার ওপর রেখে পালিয়েছিল। ডাকাতের দল পালকিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আর মাঝে মাঝে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পালকির গায়ে আঘাত করছিল। সাহেব বেরিয়ে আসবে এই আশায়।

এগার

জমিদারের আর্তস্বর শোনা যেতেই পালকির দরজা খুলে গেল। গৌরবর্ণের এক প্রৌঢ়া মুখ বের করে জমিদারের অবস্থা দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল।

পালকি থেকে জমিদার গড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়েছে। গৈরিক বসন রক্তাপ্লুত। মুখটা আকাশের দিকে। দুটে চোখ বিস্ফারিত। অন্তিম যন্ত্রণায় ঠোঁটের দুটি প্রান্ত কুঞ্চিত।

পলকের জন্য চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে তারা পালকির দিকে মুখ ফেরাল। ডাকাতের দলের দু'জন মশাল নিয়ে পালকির কাছে দাঁড়িয়েছে। বাকী দু'জন অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত।

সেই মশালের আলোয় তারা স্পষ্ট দেখতে পেল, প্রৌঢ়াও তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। তারা একবার নিহত জমিদারের দিকে আর একবার প্রৌঢ়ার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই চিৎকার করে উঠল। তারপর ঝোপঝাড় ভেদ করে বিদ্যুৎবেগে জঙ্গলের দিকে ছুটতে শুরু করল।

মেঘা, সাধু, চৈতন, রতন সবাই কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার ভাবল পিছনে বোধ হয় পাইক বরকন্দাজের দল আসছে, কিন্তু এদিক ওদিক চেয়েও কাউকে দেখতে পেল না। আবার ভাবল, তারার কি কোথাও চোট্ লেগেছে? তাই বা কি করে হবে। তারাই তো জমিদারের পিঠে বর্শার ফলা গিঁথে দিয়েছে। তার নিজের দেহে তো আঁচড়টি লাগেনি।

NOT FOR SALE

তবে?

সর্দারনী যখন সরে গেছে, তখন দলের অন্য সকলের থাকাটা সমীচীন নয়। তাই যতটুকু অর্থ সংগ্রহ করেছে ততটুকু নিয়েই সকলে ছুটতে আরম্ভ করল।

সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখল ঘোড়া নেই। তার মানে তারা ঘোড়ায় চড়ে আগেই চলে গেছে। দলের কারও জন্য অপেক্ষা করেনি।

সব ব্যাপারটাই কেমন অস্বাভাবিক। এমন কি হল তারার যে লুঠের মাল ভাল ভাবে কুড়োবার অবসর না দিয়ে এভাবে পালিয়ে এল।

দলের সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। জোরপায়ে ঘাঁটির দিকে চলতে আরম্ভ করল।

বাশুলীর মন্দিরে তারা নেই। তার কুঁড়েতেও খোঁজা হল, তারাকে পাওয়া গেল না।

মেঘা মাথায় হাত দিয়ে পথের ওপরই বসে পড়ল।

সর্বনাশ, তারামা গেল কোথায়?

তারা আস্তানায় ফেরেনি। আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাঁশবনে শুয়ে পড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল।

মা বাশুলী, এ কি করলে মা! আমি সত্যিই মহাপাতকী হলাম। কিসে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে!

পালকিতে বসা ভীতা সন্ত্রস্তা প্রৌঢ়াকে একনজরেই তারা চিনতে পেরেছিল। এত বছরের অদর্শন সত্ত্বেও। প্রৌঢ়াও যে মেয়েকে চিনতে পেরেছে সে বিষয়ে তারার কোন সন্দেহই নেই।

আর তারার বর্শার আঘাতে যে জমিদার প্রাণ হারিয়ে পথের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল, তাকেও চিনতে পেরেছে তারা। মায়ের সহোদর ভাই। জমিদার শশীকান্ত রায়।

মনে পড়ছে ছোটবেলায় এই মামা কতবার এসেছেন তারাদের বাড়িতে। তারাকে কোলে পিঠে করে কত আদর করেছেন। কত রঙিন খেলনা এনেছেন তার জন্য।

সেই মামাকে তারা নিজের হাতে শেষ করে দিয়ে এল।

NOT FOR SALE

চরের কাছ থেকে আর একটু বিশদভাবে খোঁজ নিলে বোধহয় এ বিপদ্ ঘটত না। জমিদার আসছে প্রচুর অর্থ নিয়ে এইটুকু খবর শুনেই তারা লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। ছি ছি!

আঁচলে চোখ মুছে তারা উঠে দাঁড়াল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে নিজেই করতে হবে। এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

নিজের কুটিরের সামনে এসে দেখল দলের প্রধানরা সব গোল হয়ে বসে রয়েছে।

তারাকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল।

সাধু বলল, কোথায় ছিলে তারামা? আমরা চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজলাম।

তারা কোন উত্তর দিল না। পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল।

পিছন পিছন আর সকলে ঢুকে পড়ল।

তারা মেঝের ওপর বসে পড়ে বলল।

আমি এবার তোমাদের কাছে বিদায় নেব। আর কারো ওপর দলের ভার দাও।

সবাই অবাক্। পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

মেঘা বলল, একি কথা তারামা। কালু সর্দার আমাদের ভার তোমার ওপর দিয়ে গেছে। আমাদের ফেলে তুমি কোথায় যাবে?

আমার প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার মেঘা। আমি ঘোরতর অন্যায় করেছি।

অন্যায়?

এ পথই হয়তো অন্যায়ের পথ। লোভ আর উত্তেজনার জন্য এতদিন এ কথাটা ভাবিনি। মানুষ মেরেছি নির্ব্বিবাদে। লোকের জীবন আর টাকাপয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি কিন্তু আজ নিজের মামাকে বর্শাবিদ্ধ করে বুঝতে পেরেছি, যাদের মেরেছি, যাদের কপর্দকহীন করেছি, তাদের আত্মীয়স্বজনের মনের অবস্থার কথা। নিজের মামার রক্ত আর মায়ের চোখের জল আমাকে সব কিছু নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। এ পাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।

প্রায়শ্চিত্ত? কি প্রায়শ্চিত্ত করবে?

আমি ধরা দেব।

NOT FOR SALE

এবার দলের সকলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

সে কি তারামা ধরা দেবে কি? আমরা বেঁচে থাকতে কার সাধ্য তোমায় স্পর্শ করে।

না, পরান, আমি অনেক ভেবেছি। বাশুলীমায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে সাধু।

বল তারামা।

আমার একটা চিঠি নিয়ে ইংরেজের তাঁবুতে দিয়ে আসতে হবে। যদি রবার্ট সাহেবকে দিতে পার তো ভালই হয়।

কি লেখা থাকবে চিঠিতে?

লেখা থাকবে বাশুলীমায়ের মন্দিরের চাতালে আমি অপেক্ষা করব। রবার্ট সাহেব এসে যেন আমাকে ধরে নিয়ে যান।

মেঘা মুচকি হাসল।

তোমার কি ধারণা সাহেবরা এ কথা বিশ্বাস করবে তারামা? তারা ভাববে এটা তাদের বিপদে ফেলার নতুন একটা জাল।

বিশ্বাস করা না করা তাদের খুশি। যদি সাহেবদের এ জঙ্গলে ঢুকতে ভয় করে, তাহলে তাদের অধীনে যত সিপাই আছে নিয়ে আসতে পারে। সিপাই, গোলাগুলি, কামান। আমাদের কোথাও কোন লোক থাকবে না। কেউ বাধা দেবে না।

কিন্তু তোমাকে ধরার পর যদি নির্যাতন শুরু করে?

তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ পরান, যতই নির্যাতন করুক আমাদের দলের সম্বন্ধে একটি কথাও জানতে পারবে না। আমি বাশুলীমায়ের সেবিকা। আমার দ্বারা দলের কোন অনিষ্ট হবে না।

পরান জিভ কাটল।

না তারামা, সে কথা আমি একবারও মনে আনিনি। আমি বলছিলাম, সাহেবরা তোমায় দারুণ কষ্ট দেবে।

তারা হাসল, কষ্টই তো পেতে চাই। মানুষকে অযথা অনেক দুঃখ দিয়েছি, অনেক কষ্ট দিয়েছি।

NOT FOR SALE

আর কোন কথা হল না। সারাটা রাত তারা চুপচাপ বসে রইল। তাকে ঘিরে দলের আর সবাই।

ভোর হতে তারা উঠে দাঁড়াল। এলো চুল। উদাস দৃষ্টি। মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হল যেন অনেকদিন রোগভোগের পরে সবে উঠেছে।

আমি বাশুলীমায়ের মন্দিরে যাচ্ছি। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। সমস্ত দিন সেখানে থাকব। বিকালে একবার জন্মেজয়কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।

জন্মেজয় চিঠিপত্র সব লিখে দেয়। দলের লোকেরা বুঝতে পারল, আজ বিকালেই তারা চিঠি লেখার কাজ শেষ করবে। তারপর সেই চিঠি নিয়ে সাধুকে ইংরেজের তাঁবুতে যেতে হবে।

সত্যিই সারাটা দিন তারা মন্দিরেই রইল। নিজের হাতে মালা গেঁথে বাশুলীমায়ের গলায় পরিয়ে দিল। ধূপ ধুনো জ্বেলে আরতি করল। তারপর মূর্তির পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। মাঝে মাঝে শুধু কান্নার বেগে তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

বিকালে মন্দিরের দরজা খুলে যখন তারা বের হয়ে এল, তখন তার চেহারা অনেক শান্ত। চোখে জল নেই। গলায় বাশুলীমায়ের প্রসাদী মালা।

সিঁড়ির চাতালে সবাই অপেক্ষা করছিল। জন্মেজয়ও। তারা সিঁড়ির চাতালে তাদের মাঝখানে এসে বসল।

জন্মেজয়, লেখ।

জন্মেজয় তৈরী ছিল। লিখতে শুরু করল।

পরের দিন ভোরে চিঠি নিয়ে সাধু রওনা হল বাউলের বেশে। ইতিমধ্যে এটুকু খবর সংগ্রহ করেছিল সে রাতের ডাকাতির খবর ইংরেজদের কানে পৌঁছেছে। রবার্ট সাহেব তার সিপাই বরকন্দাজ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। জমিদারের বোনকে মূর্ছিত অবস্থায় পেয়েছে। জমিদারের দেহ তুলে নিয়ে গেছে। একটা ব্যাপারে রবার্ট সাহেব খুব আশ্চর্য হয়েছে। টাকাপয়সা সোনাদানা সব ডাকাতরা লুঠ করেনি। মনে হয়েছে লুঠ করতে করতে হঠাৎ

NOT FOR SALE

যেন ভয় পেয়ে পালিয়েছে। জঙ্গলের এধারে ওধারে বেশ কিছু টাকাপয়সা ছড়ানো ছিল।

এবার রবার্ট তাঁবু পেতে বসল ঠিক এই জায়গায়। কলকাতা থেকে কড়া নির্দেশ এসেছে যেমন করে হোক এই সব ডাকাতদের দলকে উচ্ছেদ করতেই হবে। এর জন্য যত সৈন্যসামন্ত প্রয়োজন, সরকার দিতে প্রস্তুত।

লাটসাহেব বেণ্টিংক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দেশের বুকে শান্তি আনতেই হবে।

শুধু দুর্গাপুরের জঙ্গলেই নয়, সুন্দরবনে, গঙ্গানদীর ওপর জলদস্যুর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য অভিযান শুরু হয়েছে। প্রলোভন দেখিয়ে ডাকাতের দলের লোককে ইংরেজ সরকার সিপাই করে নিচ্ছে। ভাল মাইনে, ভাল পোশাক, নিশ্চিন্ত জীবন।

বাউলবেশে সাধু যখন ইংরেজের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছল, তখন রবার্ট সাহেব বসে বসে তামাক টানছে। পাশে হুঁকোবরদার হাজির। দু'জন সিপাই বিরাট আকারের তালপাখা দিয়ে বাতাস করছে।

গোপীযন্ত্রের শব্দ শুনে রবার্ট নল থেকে মুখ সরাল।

কে বাজাচ্ছে?

পাখা রেখে একজন সিপাই বাইরে থেকে দেখে এসে বলল, একজন বাউল হুজুর, গান শোনাতে চায়।

নিয়ে এস।

সাধু সামনে এসে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল।

কি খবর?

একটা গান বেঁধেছি। হুজুরকে শোনাব।

রবার্ট সরিয়ে রাখা নলটা আবার মুখে তুলে বলল, শোনাও।

সাধু গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান শুরু করল। ইংরেজের বন্দনাগান। ইংরেজরা নররূপী দেবতা। লোকের দুঃখ মোচন করতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। শান্তি ও সম্পদের দূত।

গান শেষ করে সাধু হাত পেতে দাঁড়াল।

বকশিস হুজুর।

NOT FOR SALE

রবার্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলল, সিপাই।

দু'দিক থেকে দু'জন সিপাই এসে দাঁড়াল।

এই বাউলকে আটক করে চাবুক লাগাও।

এর জন্য সাধু তৈরী ছিল না। পালাবার আগেই সিপাই দু'জন বাঘের মতন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর টানতে টানতে তাকে রবার্টের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আধঘণ্টা পর রবার্ট যখন আহারে ব্যস্ত, তখন একজন সিপাই এসে দাঁড়াল।

হুজুর, ওই বাউলের পোশাকের ভিতর থেকে এই চিঠিটা পাওয়া গেছে।

রবার্ট হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। চিঠির ওপর তার নাম লেখা।

ফোর্ট উইলিয়ামে পণ্ডিতদের কাছে রবার্ট কিছুটা বাংলা পড়েছে। চিঠি পড়তে তার কোন অসুবিধা হল না।

মান্যবর ইংরেজ বাহাদুর রবার্ট সাহেব,

আমাদের শাস্ত্রে পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি আছে। আমি স্বজনহত্যার পাপ করিয়াছি। তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজেকে আপনার হাতে অর্পণ করিতে চাই। আগামী কাল বাশুলীমায়ের মন্দিরের চাতালে আমি একাকিনী থাকিব, আপনি আমাকে গ্রেফতার করিবেন।

ইতি

বাশুলীমায়ের সেবিকা

তারা।

অনেকবার রবার্ট চিঠিটা পড়ল। পড়তে পড়তে তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। খাঁজ পড়ল দুটি ভ্রূর মাঝখানে।

আহার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, সেই বাউল কোথায়?

দীঘির পারে একটা তালগাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সিপাইয়ের সঙ্গে রবার্ট দীঘির পারে এসে দাঁড়াল।

NOT FOR SALE

সর্বাঙ্গে চাবুকের রক্তাক্ত দাগ। অর্ধঅচেতন সাধু গাছতলায় পড়ে আছে।

রবার্ট কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, এবার নিগারটাকে চাঙ্গা করে তোল। কাল ওকে আমাদের প্রয়োজন হবে।

রবার্ট মনে মনে ঠিক বুঝতে পেরেছিল ডাকাতের দলের সর্দারনীর এ একটা কায়দা। বোধহয় ভেবেছে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রবার্ট একলাই, কিংবা জন দুয়েক সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলে ঢুকবে, আর ডাকাতের দল সুবিধামত তাদের ঘেরাও করে ফেলবে।

সে রাত্রেই রবার্ট ব্যাপারটা লিখে একজন বিশেষ বাহককে দিয়ে চিঠিটা কলকাতায় পাঠিয়ে দিল।

তারপর সিপাই বরকন্দাজদের নিয়ে বৈঠকে বসল। পরামর্শ করতে।

পরের দিন বিকাল হতেই রবার্ট বরকন্দাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করল। একটা ঘোড়ার ওপর সাধুকে বসিয়ে দিল। পিছমোড়া করে বেঁধে। ঠিক তার পিছনে দু'জন সিপাই। তাদের দুটো বন্দুকের নল একেবারে সাধুর পিঠে ঠেকানো। আশপাশে বন্দুক, বল্লম, বর্শা নিয়ে অসংখ্য বরকন্দাজ।

মাঝখানে কালো ঘোড়ার ওপর রবার্ট। হাতে বন্দুক।

ব্যাপার দেখে মনে হল যেন সব লড়াইয়ে চলেছে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই রবার্ট একটা টিনের চোঙা মুখে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, ডাকাতরা যদি আক্রমণের কোন চেষ্টা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই ডাকাতকে গুলি করে মারা হবে। খুব সাবধান।

জঙ্গলের ভিতর অনেকটা প্রবেশ করার পরও কোন দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। গাছের ডালে ঝিমিয়ে পড়া পাখিগুলো শুধু ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে গেল।

আর একটু এগোতেই জঙ্গল অনেক ফাঁকা হয়ে গেল। মশালের আলোয় বাশুলীর মন্দিরের কাঠামোটা দেখা গেল।

রবার্ট দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সমস্ত সিপাই বরকন্দাজ।

ওই তো মন্দির? রবার্ট সাধুকে প্রশ্ন করল।

নির্জীব সাধু কোনরকমে ঘাড় নাড়ল।

NOT FOR SALE

রবার্ট কয়েক পা এগিয়ে চোখ কুঁচকে দেখল। মন্দিরের চাতালে কেউ অপেক্ষা করছে না। চাতাল ফাঁকা।

তার মানে মিথ্যা হয়রানি করিয়েছে তাকে। বলা যায় না, হয়তো কৌশল করে সব সিপাই বরকন্দাজদের এদিকে সরিয়ে এনে ডাকাতের দল অন্যদিকে ডাকাতি করতে বেরিয়েছে।

নিজেকে রবার্টের বড় বোকা মনে হল। ছি ছি, একটা মেয়েছেলের ধাপ্পাবাজিতে ভুলল! ঊর্ধ্বতন সাহেবরা হাসাহাসি করবে এই নিয়ে। শ্রীম্যান তাকে অপদার্থ ভাববে।

এতটা যখন এসেছে তখন শেষ দেখে যাবে।

রবার্ট আদেশ দিল বরকন্দাজদের, মন্দির ঘিরে ফেল।

সাধুকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে দু'জন সিপাই পাহারায় রইল। বাকী সবাই ঘিরে ফেলল বাশুলীর মন্দির।

রবার্ট আর একবার সাবধান করে দিল।

গাছের ওপরেও চোখ রেখ। গাছের ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াও কিছু বিচিত্র নয়।

রবার্ট দু'জন সিপাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির দু'পাশে দুটো মশাল মাটির মধ্যে পোঁতা। সমস্ত জায়গাটা আলোয় ভরে গেছে। কোথাও ছিটেফোঁটা অন্ধকার নেই।

চাতালে কেউ নেই, রবার্ট সেটা আগেই দেখেছিল। তবু একবার এদিক ওদিক দেখল।

তারপর একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়াল।

ঠিক চৌকাঠের ওপর। মাথাটা মূর্তির দিকে। এলোচুল মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পরনে লালপাড় শাড়ি। গলায় জবাফুলের মালা। বুকের মাঝখানে শাড়িটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

রবার্ট উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

একটা মশাল এদিকে নিয়ে এস।

মশাল নিয়ে একজন রবার্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

নীচু হয়ে রবার্ট নিরীক্ষণ করে দেখল।

NOT FOR SALE

একটু দূরে রক্তমাখা খাঁড়া পড়ে রয়েছে। শুধু বুকে নয়, মন্দিরের দেয়ালেও রক্তের ছোপ।

রবার্ট বিস্মিত হয়ে গেল। ডাকাতরা নৃশংসভাবে মেয়েটিকে হত্যা করে রেখে গেছে আর এই নারকীয় দৃশ্য দেখবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

রবার্ট আবার চেঁচাল।

শয়তানকে নিয়ে এস এখানে।

দু'জন সিপাই দড়িবাঁধা অবস্থায় সাধুকে এনে দাঁড় করাল।

কর্কশকণ্ঠে রবার্ট বলল, দেখ নিগার, তোদের দলের কীর্তি। কচি একটা মেয়েকে মূর্তির সামনে বলি দিয়ে গেছে।

সাধু একবার দেখেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। আছড়ে পড়ল চৌকাঠের পাশে।

এ কে? চিনিস একে তুই?

সাধু মুখ তুলল না। ক্রন্দনরতকণ্ঠে বলল, আমাদের মা, আমাদের তারামা। দলের প্রাণ, দলের শক্তি।

এই তারা। দুর্ধর্ষ একটা দলের নেত্রী। এত কম বয়স!

তাহলে তারা কথা রেখেছে। বাশুলীর মন্দিরে নিজেকে অর্পণ করার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে। অনায়াসেই রবার্ট তাকে গ্রেফতার করতে পারে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। অনেক বছর। রক্তের পথ পার হয়ে, অনেক প্রাণ অর্ঘ দিয়ে দেশে স্বাধীনতা এসেছে।

জননেতারা দেশকে নবরূপে গড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। দুর্গম অরণ্য বুলডোজারের আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে নানাজায়গায় জেগে উঠেছে কলকারখানা। জাতীয় শিল্পপ্রচেষ্টার বাস্তব রূপ।

দুর্গাপুরের জঙ্গলও পরিষ্কার করা শুরু হল। গাছপালা উধাও, বিল, সায়র, জলা ভরাট হল। জোনাকির আলোর বদলে নিওনের বিদ্যুৎ-দীপ্তি।

জঙ্গল সাফ করতে করতে কুলী মজুররা দেখল, ভাঙা জরাজীর্ণ এক

NOT FOR SALE

মন্দির। গাছপালা সমাচ্ছন্ন। বিগ্রহ নেই। মন্দিরের তিন দিকের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। শুধু সামনের দেয়ালের কিছুটা আছে। সে দেয়ালে গাঢ় রক্তের ছোপ।

কুলীরা পিছিয়ে গেল, ভাঙতে পারব না সাহেব। ঠিকাদারের দিকে চেয়ে বলল, দেয়ালের ওই রক্তের দাগ তারামার রক্তের। বাপ্ ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেছি, এই সেই মন্দির যেখানে তারামা নিজেকে নিবেদন করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

সে মন্দিরও আর নেই। ঠিকাদাররা অন্য প্রদেশ থেকে কুলী আনিয়ে বেশী টাকা রোজ দিয়ে, সে মন্দির ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

আজ সেখানে দুর্গাপুর কারখানার বিরাট একটা ফারনেস বসানো হয়েছে। রক্তের চেয়েও লাল আগুনের আভা তার বুকে।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

ভয়ের মুখোশ

চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। তার ওপর দুজনে একেবারে পাশাপাশি। দীপু আর তপু। দীপক আর তপেন।

দুজনে একই বাড়ির ছেলে। গলির একেবারে কোণে যে লাল রংয়ের বাড়ি, তারই একতলার ভাড়াটে। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই। প্রায় একবয়সী। খুব হিসাব করে দেখলে জানা যায় দীপু তপুর চেয়ে মাস দুয়েকের বড়।

পাড়ার হিন্দুনিকেতনে দুজনে আট ক্লাসে পড়ে। পড়ে মানে বই খাতা হাতে করে স্কুলে যায় ওই পর্যন্ত, ক্লাসে বেশীক্ষণ থাকে না। বেরিয়ে পড়ে। তারপর সারাটা দুপুর টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়।

এখন লোকের বাগান বিশেষ নেই। গাছপালা কেটে কারখানা চালু হচ্ছে। কাজেই পরের বাগানের ফলপাকুড় চুরি করার সুবিধা নেই। খাল বিলে মাছ ধরার সুযোগও কম।

দুজনে শহরতলির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও সাধুর ভেলকিবাজি দেখে, কোথাও বানরনাচ, আবার কোন কোনদিন বই খাতা মাথায় পার্কে টানা ঘুম লাগায়।

এর জন্য বাড়িতে যে লাঞ্ছনা জোটে না, এমন নয়।

তপেনের বাপ নেই। অনেকদিন মারা গেছে। দীপুর বাবাই অভিভাবক। ধরেন যখন, তখন দুজনকে আধমরা করেন। আস্ত কঞ্চি পিঠের ওপর ভাঙেন।

দিন কয়েক ঠিক থাকে। স্কুলে যায়। বাড়িতে মাস্টারের কাছেও পড়তে বসে। তারপর আবার যে কে সেই।

দীপু তপুর মায়েরা কান্নাকাটি করে। বিশেষ করে তপুর মা। এখন থেকে যদি লেখাপড়া না করে, এভাবে দুরন্তপনা চালায়, তবে ভবিষ্যতে দুজনে যে দুটি ডাকাত হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

সেদিন রবিবার। স্কুলের বালাই নেই, লেখাপড়ার পাঠ নয়। ভোরবেলা দু কাপ চা আর দুখানা রুটি খেয়ে দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বেঞ্চে বসে বসে ভাবছে এরপর কি করা যায়।

NOT FOR SALE

ন্যাশনাল আয়রন কোম্পানির পিছনের মাঠে বিরাট শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। কলকাতা থেকে বিখ্যাত যাত্রার দল এসেছে। মাথুর পালা হবে।

তপু আর দীপু দুজনেই বসে বসে ভাবছে, বাড়িতে কি বলে তারা দুজনে ওই যাত্রার আসরে গিয়ে বসবে। সারা রাতের ব্যাপার। বাড়ি থেকে যেতে দেবে এমন সম্ভাবনা কম।

দীপু বলল, তপু, একটা মতলব বের কর।

তপু বসে বসে হাতের আঙুল কামড়াচ্ছিল, আঙুলটা মুখ থেকে বের করে বলল, আমি বলি কি, চলেই যাই দুজনে, ভোর ভোর চুপি-চুপি ফিরে আসব এখন।—

দীপু মাথা নাড়ল, দূর, তা হবে না। বাবা কি রকম কড়া লোক জানিস তো। রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো একবার দেখবে, আবার ভোরবেলা উঁকি দেবে ঘরে ঘরে। সব ঠিক আছে কি না। রাত বারোটার আগে বাবা শুতে যায় না, আবার ওঠে সেই ভোর চারটেয়।

তপু বলল, ঘরে ঢুকে জ্যাঠা গায়ে হাত দিয়ে তো আর দেখবে না। জানালা দিয়ে দেখবে। আমরা দিব্যি বালিশের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে রাখব। জ্যাঠা বুঝতে পারবে না।

ব্যবস্থাটা দীপকের খুব মনঃপূত হল না।

নিজের বাপকে সে খুব ভাল করেই চেনে। পাশবালিশ দিয়ে তাঁকে ঠকানো যাবে না। অন্য কিছু একটা ভাবতে হবে।

কিন্তু অন্য কিছু ভাববার আর সময় পেল না। হইচই চীৎকারে চমকে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল।

একটা কানা ভিখারী রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল, লাঠি ঠুকে ঠুকে, হঠাৎ ইঁটবোঝাই একটা লরি এসে পড়ল।

দীপু আর তপু যখন গিয়ে পৌঁছল দেখল চাপ চাপ রক্তের মাঝখানে ভিখারীটা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

লরিটা পালাতে পারে নি। লোকেরা আটকে রেখেছিল।

দীপু আর তপু ধরাধরি করে ভিখারীকে লরির ওপর তুলল। ড্রাইভারকে বলল দ্রুত হাসপাতালের দিকে চালাতে।

মাঝপথ থেকে একটা পুলিসও উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে।

শহরের হাসপাতালে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন দুপুরের রোদ চারদিক জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রায় আধঘন্টার ওপর অপেক্ষা করার পর

NOT FOR SALE

ভিখারীকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল। দীপু আর তপু বাইরে বসে রইল।

একটা নার্স এসে তাদের সামনে যখন দাঁড়াল তখন প্রায় পাঁচটা। দীপু আর তপু দুজনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

কি হল? কেমন আছে?

দীপু প্রশ্ন করল।

নার্স ধীরে ধীরে মাথা দোলাল।

খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, মারা গেছে। বাঁচানো গেল না।

দীপু আর তপু উঠে দাঁড়াল। ওই কানা ভিখারীকে তারা চিনত। লাঠি হাতে করে বাড়ির দরজায় দরজায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। চমৎকার গানের গলা।

মনে আছে, কতদিন বাড়ির লোকের চোখ এড়িয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে দীপু আর তপু চাল আলু এনে ভিখারীর ঝুলিতে ফেলে দিয়েছে।

ভিখারীটা শেষ হয়ে গেল। আর কোনদিন তার গান শোনা যাবে না।

দুজনে ক্লান্ত পায়ে, পরিশ্রান্ত দেহে যখন বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

দরজার কড়ায় আর হাত রাখতে হল না, দীপকের বাবা লিকলিকে বেত হাতে উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুজনের ওপর। তারপরই এলোপাথাড়ি মার।

সেই সাতসকালে চা আর রুটি খেয়ে দুজনে বেরিয়েছিল, সারাটা দিন পেটে কিছু পড়ে নি, তারপর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দুজনেই ব্যাকুল ছিল।

চীৎকার করে আসল ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করল, কোন ফল হল না। রাগ চণ্ডাল, রাগলে দীপকের বাবা চণ্ডালেরও অধম। দুজনের চুলের মুঠি ধরে অবিশ্রান্ত প্রহার। বাড়ির লোক দীপকের বাপকে খুব চেনে, সেইজন্য কেউ বাড়ির বাইরে এল না।

দীপকের বাবা নিজে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন বেতটা উঠানে আছড়ে ফেলে দিয়ে পাশের ছোট দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

একটা পেঁপেগাছের তলায় দীপু আর তপু নির্জীবের মতন পড়ে রইল। শরীরের অনেক জায়গা কেটে রক্তপাত হচ্ছে। দু'এক জায়গায় কালশিটে পড়েছে। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ।

এই সময়ে একটু জল পেলে হতো। কিন্তু কোথায় জল। কে দেবে জল?

NOT FOR SALE

তপু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

টলতে টলতে দীপুর কাছে গিয়ে চাপাকণ্ঠে ডাকল।

দীপু, এই দীপু।

দীপু চোখ চেয়েই ছিল, বলল, কি?

এ বাড়িতে আর থাকব না। কোন কথাই জ্যাঠা শুনতে চাইল না। বেমালুম পেটালে শুধু।

দীপুও উঠে দাঁড়াল। জামা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

আমারও থাকতে ইচ্ছা করছে না এ বাড়িতে। চল, কোথাও চলে যাই।

কোথায় যাবি?

যে কোন দিকে হোক। এদেশে বনজঙ্গল কম আছে।

বনজঙ্গল যেমন আছে, তেমনই বাঘ ভালুকও আছে তো।

থাক না, এভাবে নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে, বাঘ ভালুকের পেটে যাওয়া ঢের ভাল।

ঠিক বলেছিস, চল।

দীপু আর তপু চলতে শুরু করল।

রাত তখনও বেশী হয় নি। পথে লোকচলাচল রয়েছে। দীপু আর তপু আলোর সীমানা থেকে সরে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে লাগল; যাতে কারো চোখে না পড়ে। তা ছাড়া আলোয় শরীরের রক্তাক্ত চিহ্নগুলো দেখা যাবে। লোকে হয়তো প্রশ্ন করবে তা নিয়ে। এই এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

প্রায় মাইলখানেক চলার পর দুজনে থামল।

আর তাদের চলার শক্তি নেই। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা।

দীপু বলল, আর পারছি না রে তপু।

তপুর অবস্থাও তথৈবচ। চলতে চলতে সে পথে অনেকবার দাঁড়িয়েছিল। এমন কি মনে মনে একবার ভেবেওছিল, দীপুকে বলবে বাড়িতে ফিরে যাবার কথা। লজ্জায় পারে নি।

তপু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমারও দুটো পা টনটন করছে।

দীপু এদিক ওদিক দেখল তারপর উৎসাহের সুরে বলল, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

কি মতলব?

বলছি।

NOT FOR SALE

দীপু বলল না। অনেক দূরে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা লরি আসছিল, সেইদিকে চেয়ে রইল।

লরিটা কাছে আসতে দীপু দুটো হাত মাথার ওপর তুলে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে লাগল, থাম, থাম। জরুরী দরকার আছে।

ব্রেক কষে লরিটা থামল। একটু দূরে।

দীপু আর তপু দৌড়ে লরির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করল।

কি হয়েছে? থামতে বললে কেন?

দীপু বলল, কোথায় যাচ্ছে লরি?

শহরে। খিদিরপুর ডকে।

আমাদের নিয়ে যাবে লরিতে?

ড্রাইভার বিস্মিত হল।

তোমরা দুটো বাচ্চা, এই রাতে কোথায় যাবে?

খিদিরপুরেই যাব আমরা। মাসীমার বাড়ি। পয়সা হারিয়ে ফেলেছি, তাই বাসে উঠতে পারছি না। আমরা খিদিরপুরে নেমে যাব।

ড্রাইভার কিছুক্ষণ কি ভাবল। ঝুঁকে পড়ে দুজনকে দেখল, তারপর দরজা খুলে বলল, উঠে এস।

দীপু আর তপু দুজনে কেউ হেডলাইটের সামনে যায় নি, পাছে ড্রাইভার তাদের শরীরের অবস্থা দেখতে পায়।

তারা লরির ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই লাফিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল।

তারপর একটানা যাত্রা। মসৃণ পথ। মাঝে মাঝে অন্য যানবাহনের আসা-যাওয়া। ড্রাইভার একমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

দীপু আর তপু কেউ কথা বলতে সাহস করল না।

ড্রাইভারই একসময়ে কথা বলল।

খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। পকেট থেকে পয়সা চুরি গেল ভারি লজ্জার কথা। শহরে কিন্তু আরো সাবধান হয়ে থাকবে। শহর বড় খারাপ জায়গা। চোর জোচ্চোরদের আস্তানা।

দুজনেই মাথা নেড়ে ড্রাইভারের কথায় সায় দিল।

শহরে যে কটা দিন থাকবে, খুবই সাবধানে থাকবে তারা।

তপু জিজ্ঞাসা করল, লরিতে কি যাচ্ছে?

NOT FOR SALE

পাট। পাট নিয়ে যাচ্ছি।

কোথায় যাবে পাট?

আমি তো খিদিরপুরের ডকে মাল নামিয়ে দেব। সেখান থেকে জাহাজে উঠে পাট বিলেত চলে যাবে।

দীপু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানুষ না হয়ে পাট হলেই বুঝি ভাল হতো। এভাবে মেরে কেউ লোপাট করে দিতে পারত না। তাছাড়া মহানন্দে ঢেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে দেশদেশান্তরে পাড়ি দেওয়া যেত।

একটু বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল দুজনের, হঠাৎ ড্রাইভারের কথায় চমকে উঠল।

এই তো খিদিরপুর। তোমরা কোথায় নামবে?

দীপু আর তপু চোখ খুলে বাইরে দেখল।

সারি সারি অনেক জাহাজ দেখা যাচ্ছে। কিছু জাহাজ মাঝনদীতেও নোঙর করা রয়েছে। রাত বলে মনেই হচ্ছে না। চারদিকে আলোর রোশনাই।

এখানেই থামাও, আমরা নেমে পড়ি।

লরি থামল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

দীপু আর তপু রাস্তার ওপর নেমে দাঁড়াল।

লরিটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দীপু বলল।

চল, গঙ্গার জলে মুখ হাত ধুয়ে নিই। রক্ত শুকিয়ে রয়েছে, সেগুলোও মোছা দরকার।

দুজনে সাবধানে ধাপ বেয়ে বেয়ে নেমে গেল।

মুখ হাত তো ধুলোই, আঁজলা করে সেই অপরিষ্কার জলই পান করল।

তারপর দুজনে ইতস্তত: মাল ছড়ানো জেটির ওপর বসল।

তপু বলল, এবার কোথায় যাবি?

জাহাজের মাস্তুলের দিকে চেয়ে দীপু বলল, জাহাজে চড়ে দূরে কোথাও চলে যাব।

তপু আপত্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিঠের যন্ত্রণাটা বেড়ে উঠল, মনে পড়ে গেল জ্যাঠার অমানুষিক অত্যাচারের কথা।

সে বলল, ঠিক বলেছিস। অনেক দূরে চলে যাব। এদেশে আর ফিরে আসব না।

NOT FOR SALE

দুজনেরই দুঃখ, আজকের দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণটা একবার শুনলও না। কিছু বলতেই দিল না। অন্য দিনের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু আজ তারা কোন অন্যায় করে নি। ভিখারীটাকে বাঁচাতে অবশ্য পারল না, সে আর কি করবে। পরমায়ু দেবার মালিক তারা নয়, কিন্তু চেষ্টা তো করেছিল। লোক তো ধারেকাছে অনেক জমেছিল, শুধু তারা দুজনেই তোড়জোড় করে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে।

পৃথিবীর কোন লোক এমন কাজকে অন্যায় বলবে না। বইয়ের পাতায় পাতায় পরোপকারের আদর্শের ব্যাখ্যা থাকে। ক্লাসে শিক্ষকেরা নীতির কত কথা বলেন, অথচ জীবনে এসব করতে যাওয়ার ফল প্রহার।

তপু বুঝতে পারল তার দুটি চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

দীপু উঠে দাঁড়াল।

চল, একটু ঘোরাফেরা করে দেখি।

এক জেটি থেকে বেরিয়ে দুজনে পাশের জেটিতে গিয়ে ঢুকল। এখানেও একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। জেটিভর্তি নানারকমের কলকব্জা। বড় বড় যন্ত্রপাতি।

একেবারে কোণের দিকে গোল গোল লোহার বাটি। বিরাট আকারের। ওপরে অর্ধেক ঢাকা ডালা।

দীপু উঁকি দিয়ে বলল।

ঢুকতে পারবি এর মধ্যে?

তপুও ঝুঁকে একবার দেখল। দীপুর দিকে চেয়ে বলল।

তারপর?

তারপর দুজনে জাহাজে উঠব।

সেকি!

দেখ না। আমি আগে উঠি, তারপর তুই উঠিস।

এদিক ওদিক চেয়ে দীপু ডালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কুলিরা জেটির ওপর কেউ নেই। রাস্তার ওপর জটলা করছে।

খুব সাবধানে তপুও ঢুকে পড়ল।

একটুও শব্দ না করে।

ভিতরে অনেকটা জায়গা।

দুজনে গুটিসুটি হয়ে শুতে কোন অসুবিধা হল না।

বরং বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রকোপ থেকে বাঁচল।

NOT FOR SALE

দুজনে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তপুর ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল সবসুদ্ধ কে যেন তাদের শূন্যে তুলছে।

প্রথমে সে মনে করল বুঝি ভূমিকম্প, দীপুকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই দীপু, দীপু, ভূমিকম্প হচ্ছে।

দীপু একটা হাত তপুর মুখের ওপর চেপে ধরে বলল।

চুপ, চেঁচাস নি। ভূমিকম্প নয়।

তবে?

ক্রেনে করে আমাদের জাহাজে ওঠাচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ জেগেছি, সব দেখেছি। যেমন শুয়ে ছিলি, তেমনই শুয়ে থাক।

তপু শুয়েই ছিল। দীপুর কথায় আরো সরে এসে কুঁকড়ে শুয়ে রইল, দু হাত দিয়ে দীপুকে জাপটে ধরে।

বড় বাটিটা খুব দুলছে। মনে হল এদেশের মাটি থেকে দীপু আর তপুকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশে। সব মায়া, সব সম্পর্ক কাটিয়ে।

খুব জোর একটা শব্দ হল। মনে হল বাটিটা মাটির ওপর কে যেন আছড়ে ফেলল।

দীপু আর তপুর শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল।

বাইরে কুলির স্তিমিত কোলাহল, লোহার চেনের আওয়াজ।

দুজনেরই অদম্য ইচ্ছা হল উঠে একবার অবস্থাটা দেখবে, কিন্তু অনেক কষ্টে কৌতূহল দমন করল।

এখন ধরা পড়ে গেলেই সব মাটি। এই ক্ষতবিক্ষত শরীরের ওপরই আবার হয়তো প্রহার চলবে। দুজনকে টেনে নামিয়ে দেবে জেটির ওপর।

এত রাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বাড়ি ফিরে গেলেও সেখানে কি ধরনের অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে, তাও তাদের অজানা নয়।

মনে হল চাকার ওপর বসিয়ে বাটিটাকে কারা যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গড়গড় করে শব্দ।

আবার ঘটাং করে আওয়াজ।

এবার ফাঁক দিয়ে খুব ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বোধ হয় রেলিংএর ধারে বাটিটা রেখেছে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দও শোনা যাচ্ছে।

একটু একটু করে বাইরের হট্টগোল কমে গেল। ঘুম নেমে এল দীপু আর তপুর চোখে।

NOT FOR SALE

একসময়ে অনেকগুলো লোকের কথা বলার আওয়াজে দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ঠিক কিছু বুঝতে পারল না। মনে হল, নিজেদের বিছানাতেই বুঝি শুয়ে আছে। কিন্তু এত হট্টগোল কিসের। আবার কেউ লরি চাপা পড়ল নাকি, যে জন্য লোকেদের চেঁচামেচি শুরু হয়েছে।

দুজনে প্রায় একসঙ্গেই চোখ খুলল।

দেখল, ডালার ফাঁকে গোটা তিনচার মুখ উঁকি দিচ্ছে।

ছোট ছোট চোখ, শুকনো কঠিন চেহারা, মাথায় সাদা টুপি।

দীপু আর তপু উঠে বসল।

কে তোমরা? এর মধ্যে এলে কি করে?

পরিষ্কার বাংলা ভাষা। উচ্চারণে একটু জড়তা আছে, কিন্তু বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

কি? কথা বলছ না কেন? বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস।

ঢোকা যত সহজ ছিল, বেরিয়ে আসা মোটেই তত সহজ নয়। বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়েই দীপু আর তপু সেটা বুঝতে পারল।

বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলোও বোধ হয় বুঝল।

একজন লোহার মতন শক্ত দুটো হাত বাড়িয়ে দীপুকে ধরল, তারপর তাকে টেনে বের করে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল।

আবার সেইভাবে তপুকেও বাটি থেকে বাইরে নিয়ে এল।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়েই দুজনে অবাক্।

চারদিকে শুধু জল আর জল। গঙ্গার মত ঘোলাটে কাদা জল নয়, ফিকে সবুজ জলের রঙ। মাঝারি আকারের ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউয়ের ধাক্কায় সাদা ফেনার সৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও স্থলের চিহ্নমাত্র নেই।

বিরাট জাহাজ। মাস্তুলে নিশান উড়ছে। কালো একটা চোঙের মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হচ্ছে।

ডেকের ওপর সার দিয়ে দাঁড়ানো একদল লোক। সবার পরনে একই রঙের পোশাক। হাতে লম্বা ঝাৰ। কোণের দিকে অনেকগুলো লাল রঙের বালতি।

যে লোকটা ওদের তুলেছিল, সে এগিয়ে এসে বলল।

কই, বললে না কে তোমরা? এর মধ্যে কি করে এলে?

দীপু একবার সকলের মুখের দিকে দেখে নিল, তারপর বলল, আমার নাম দীপক, আর ওর নাম তপেন। আমরা দুই ভাই।

NOT FOR SALE

দুই ভাই, তা এর মধ্যে কি করে এলে?

জেটিতে যখন এগুলো রাখা ছিল, তখন আমরা এর মধ্যে ঢুকেছি।

কেন?

এ পর্যন্ত বলতে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু এবার কি বলবে।

কি করে বলবে, বাড়িতে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিল? এ দেশের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিল!

দীপুকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা ধমক লাগাল।

কি, চুপ করে আছ যে? কথা বল।

তপু এতক্ষণ চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালচাল দেখছিল, এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল।

আমাদের কেউ কোথাও নেই। শুধু এক সৎমা আছে, ভীষণ নির্যাতন করে। বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

কয়েকদিন আগেই তপু একটা গল্পের বই পড়েছিল। তাতে এক সৎমার অত্যাচারের কাহিনী ছিল। সেটা মনে পড়ে গেল।

মনে হল লোকটার মুখের কঠিন রেখাগুলো একটু যেন সরল হল। চোখের ভাবও কিঞ্চিৎ করুণ।

কিন্তু এভাবে মালের জাহাজে লোক যাওয়ার নিয়ম নেই।

এ কথার দীপু আর তপু কোন উত্তর দিল না।

ইতিমধ্যে লোকগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জটলা করছে নিজেদের মধ্যে।

একটু পরে সেই লোকটাই এগিয়ে এল। বলল।

চল, তোমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে হবে।

আগে আগে দীপু আর তপু, পিছনে জন তিনেক লোক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

ডেকের ওপর আবার একটা ডেক। তার মাঝখানে সাদা রঙের ছোট সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে সবাই আরো ওপরে উঠল।

সিঁড়ির শেষে ছোট একটা ঘর। গোল কাঁচের জানলা। ঝকঝকে তকতকে ব্রাসের হ্যাণ্ডেল দরজার। দরজার গোড়ায় মোটা পাপোশ।

একটি লোক বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিল।

সাব। সাব।

দরজা খুলে গেল।

NOT FOR SALE

দীর্ঘ চেহারার একটি লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

হাঁসের পালকের মতন সাদা ধবধবে পোশাক। সার সার বোতাম বসানো। মাথায় হেলমেট ধরনের টুপি।

এই তাহলে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন ভ্রূ কুঁচকে বলল।

কি হয়েছে?

মেসিন কভারের মধ্যে দুটো ছেলে, সাব।

কি?

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল কেবিনের চৌকাঠ পেরিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে গেল।

একপাশে জড়াজড়ি করে দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে।

আরে, এ তো একদম বাচ্চা।

ক্যাপ্টেন হাতের ইশারায় দুজনকে কাছে ডাকল।

দীপু আর তপু আস্তে আস্তে পা ফেলে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কে তোমরা? জাহাজে চড়েছ কেন?

দীপু আর তপুকে কিছু বলতে হল না। দলের লোকটাই বলল, এরা বুঝি দুই ভাই সাব। বাড়িতে মার অত্যাচারের জন্য পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু জাহাজে উঠলে জাহাজের ভাড়া দিতে হবে।

তপু আর দীপু হিসাব করল।

তপুর পকেটে আট আনা আছে, আর দীপুর পকেটে একটা সিকি। টিফিনের পয়সা থেকে বাঁচানো। একজনের কাছে কত আছে, আর একজনের জানা।

তাই তপু বলল।

আমাদের কাছে বারো আনা আছে। এতে আপনার জাহাজের ভাড়া হবে?

রাগ করতে গিয়েও ক্যাপ্টেন হেসে ফেলল।

ক্যাপ্টেন বাঙালী নয়, কিন্তু বাংলায় কথা বলতে পারে। ভাঙা ভাঙা বাংলা। বুঝতেও পারে।

হাসি চেপে বলল।

এ জাহাজ প্রথমে রেঙ্গুন যাবে। এক জনের ভাড়া ডেকে পঁচিশ টাকা। দিতে পারবে?

NOT FOR SALE

প্রায় একসঙ্গে দীপু আর তপু মাথা নাড়ল।

না।

তাহলে?

তাহলে কি হবে দীপু তপুর জানা নেই। কি নিয়ম জাহাজের? জলে ফেলে দেয় বিনা টিকিটের যাত্রীদের?

যা ইচ্ছা করুক। এভাবে আর পারছে না। ক্লান্তিতে সারা দেহ ভেঙে পড়ছে। যাই করুক—মেরে ফেলে দিক, জলে ফেলুক, তার আগে দুজনকে পেট ভরে অন্ততঃ খেতে দিক। তা না হলে, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালাতেই দুজনে মারা যাবে।

কি ব্যাপার, ভিড় কিসের এত?

পিছন থেকে ভারি গলার আওয়াজে চমকে দীপু আর তপু মুখ ফেরাল।

বেশ মোটাসোটা চেহারা, গোলগাল মুখ, মাথাটা ডিমের মতন মসৃণ। একগাছা চুল নেই। চোখে চশমা।

ক্যাপ্টেন উত্তর দিল।

এই যে ডাক্তার, আপনার দেশের লোকের কাণ্ড দেখুন।

কি হল?

ডাক্তার ঠিক দীপু আর তপুর পিছনে এসে দাঁড়াল।

রাত্রিবেলা চুপিচুপি কখন মেসিন কভারের মধ্যে ঢুকে বসেছিল। বিনাভাড়ায় জাহাজ চড়বার শখ।

ডাক্তার চোখ ফিরিয়ে দীপু আর তপুকে দেখল, তারপর বলল।

আমাদের দেশের ছেলেরাই তো এসব করে। পাহাড় পর্বত লীন করে, ময়ূরপঙ্খী ভাসায় ঢেউয়ের বুকে, গুলির সামনে বুক পেতে দেয়। কিন্তু এরা দেখছি নিতান্ত বাচ্চা।

কিন্তু মাঝদরিয়ায় এদের নিয়ে কি করা যায়?

উপস্থিত এদের চেহারা দেখে যা বুঝছি, অনেকক্ষণ বোধ হয় পেটে কিছু পড়ে নি। এদের কিছু খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর।

ক্যাপ্টেন হেসে বলল, তারপর?

তারপর আর কি, রেঙ্গুনে পৌঁছবার পর ফিরতি জাহাজে যাদের বাছা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কই, এস তোমরা আমার সঙ্গে।

ডাক্তারের পিছন পিছন দীপু আর তপু সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

জাহাজের সামনের দিকে মাঝারি সাইজের একটা কেবিন।

ঢুকেই দীপু আর তপু অবাক্ হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

ভিতরে এলে মনে হয় যেন কোন সাজানো বাড়ির কামরা। জাহাজের মধ্যে আছে তা মনেই হয় না।

একদিকে ধবধবে বিছানা পাতা। দেয়াল আলমারি। গোল টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ার।

ডাক্তার বিছানার ওপর বসল। তার নির্দেশে দীপু আর তপু দুটো চেয়ারে বসল।

নাম কি তোমাদের বল তো এইবার।

কি জানি কেন, বোধ হয় ডাক্তারের কথা বলার ভঙ্গীতে, দীপু আর তপু দুজনেরই মনে হল যেন নিরাপদ একটা আশ্রয়ে এসেছে। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। এমন একটা মানুষের কাছে নিশ্চিন্তে মনের কথা বলা যায়।

তাই দীপু বলল, আমার নাম দীপক সেন, ওর নাম তপেন সেন। তপেন আমার খুড়তুতো ভাই।

তা বেশ তপেনবাবু, মাঝরাত্রে ওভাবে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে গেলে কেন?

তপু ভেবেছিল ডাক্তারের কাছে সত্যি কথাটা বলবে, কিন্তু একটু ভেবেই সাবধান হয়ে গেল।

কিছু বলা যায় না, সকলের কাছে এক ধরনের কথা বলাই ভাল। এক একজনের কাছে এক এক রকমের কথা বললে ধরা পড়ে যাবে। কেউই তাদের বিশ্বাস করবে না।

তাই সৎমার নির্যাতনের কথাটাই আবার বলল।

কিন্তু বিদেশে গিয়ে তোমরা করবে কি? লেখাপড়া এমন জান না যে চাকরি করবে। হাতে কলমে কোন কাজ জান না যে কারখানায় কাজ পাবে।

তপু বলল, আমরা অত কথা কিছু ভাবি নি। রাগের মাথায় বেরিয়ে এসেছি।

এমন সময় দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল।

তার হাতে একটা ট্রে। তাতে দু কাপ দুধ, অনেকগুলো পাঁউরুটির টুকরো, দুটো ডিমসেদ্ধ আর একরাশ ফল।

লোকটা সেগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার আগেই দীপু আর তপু সাগ্রহে জিনিসগুলো টেনে নিল।

কিন্তু খেতে যাবার মুখেই বিপদ।

একটু দাঁড়াও। ডাক্তারের গম্ভীর গলার স্বর।

দুজনেই চমকে উঠল। আবার কি হল? খাবার ব্যাপারে জাহাজের জন্য কোন নিয়ম আছে নাকি!

NOT FOR SALE

তপু, তোমার হাতে লালচে দাগটা কিসের?

শুধু হাতে! অবশ্য হাতটাই দেখা যাচ্ছে। পিঠ আর বুক তো জামায় ঢাকা।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে সার্টটা টেনে খুলে ফেলল, ডাক্তারের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, দেখুন পিঠের অবস্থা। সারা পিঠ জুড়ে কালশিটে আর রক্তাক্ত আঁচড়।

দীপুর দেখাদেখি ততক্ষণে তপুও জামা খুলে ফেলেছে। তার পিঠেরও একই অবস্থা।

ঈস্! আহা, কচি ছেলেকে এভাবে কেউ মারে!

ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে দেয়াল আলমারি খুলে তুলো আর ওষুধ বের করল, তারপর খুব সাবধানে তপু আর দীপুর আঘাতচিহ্নের ওপর লাগিয়ে দিল।

ওষুধ লাগানো হতে দুজনে খেতে বসল।

অত খাবার শেষ হতে মিনিট দশেকের বেশী লাগল না। পেটের মধ্যে যে যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠছিল, সেটার উপশম হল!

এবার তোমরা বাইরের ডেকে চলে যাও। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা একটা করছি।

দুজনে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসেই অবাক্।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবিনে বাতি জ্বলছিল বলে কিছু বোঝা যায় নি।

আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। জল এখন আর ফিকে সবুজ নয়, গাঢ় কালো। ঢেউয়ের আকার দারুণ বেড়েছে। হাওয়ার বেগের জন্য এগোনোই দুঃসাধ্য। ঠেলে যেন পিছনে হটিয়ে দিচ্ছে।

একটা লোক দৌড়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ওদের দেখে বলল, নীচে চলে যাও তোমরা। ভীষণ ঝড় উঠছে।

নীচে? নীচে আর কোথায় যাবে? এ জাহাজের কোথায় কি আছে কিছুই তাদের জানা নেই। জানার অবকাশই পায় নি।

ছুটতে ছুটতে তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে চলে এল। একেবারে জাহাজের খোলে। নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশ্রী একটা গন্ধ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে যাবার দাখিল।

একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একগাদা ছাগল বাঁধা রয়েছে। এদিকে খাঁচার ওপর খাঁচা। তার মধ্যে মুরগী, হাঁস আর কুঁকড়ো।

NOT FOR SALE

গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকাই মুশকিল।

কিন্তু ওপরে উঠবারও উপায় নেই। বোঝা গেল জাহাজটা বেশ দুলছে। একবার এদিক থেকে ওদিক, আর একবার ওদিক থেকে এদিক।

দোলার সঙ্গে পাঁঠা, মোরগ, হাঁসের ঐক্যতানে কানে তালা ধরবার যোগাড়।

দুজনে নাক চেপে সিঁড়িতেই বসে পড়ল।

একটু আগে যে সব সুখাদ্য পেটে গিয়েছিল, সেগুলো পাক দিয়ে উঠতে লাগল। গন্ধে আর জাহাজের দোলানিতে।

দু হাতে মুখ চেপে ধরে দুজনে বমির বেগ সামলাল।

প্রায় আধঘণ্টার ওপর, একভাবে চলল, তারপর মনে হল জাহাজ যেন একটু সামলে নিল। বোধ হয় ঝড়ের বেগ কম।

ওরা সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল।

সমস্ত ডেকটা ভিজে গিয়েছে। বোধ হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল।

এক জায়গায় কুণ্ডলীপাকানো ম্যানিলা দড়ি ছিল, দুজনে তার ওপর গিয়ে বসল।

সকালের মতন একদল লোক লম্বা ঝাৱ দিয়ে ঠেলে ঠেলে জল ফেলে দিতে লাগল রেলিংয়ের ফাঁকে।

একটা লোক কাছে আসতে তপু জিজ্ঞাসা করল।

খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি?

ঝাৱ রেখে লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল।

বৃষ্টি কোথায়? এ তো ঢেউয়ের জল।

ঢেউ?

হ্যাঁ, ঝড়ের সময় ঢেউয়ের সাইজ তিনতলা চারতলা পর্যন্ত হয়। এদিক দিয়ে ঢেউ উঠে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একেবারে ডেক ভাসিয়ে।

বিস্ময়ে দীপু আর তপু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরেই দমকলের ঘণ্টার মতন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল।

দীপু আর তপু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ, জাহাজে আবার আগুন লাগল নাকি?

সবাই ঝাৱ বালতি সরিয়ে সার হয়ে দাঁড়াল তারপর চলতে শুরু করল।

দীপু আর তপুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন বলল।

চল, খাবার ঘণ্টা পড়েছে। খেতে যাবে না?

NOT FOR SALE

ওটা দমকলের ব্যাপার নয়, খাবার ঘণ্টা। দীপু আর তপু একটু আশ্বস্ত হল। দুজনে আর সকলের পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করল।

এভাবে দু'দিন দু'রাত কাটল।

শোবার জন্য দুজনে একটা কেবিন পেয়েছে। ডাক্তারের কেবিনের মতন অমন চমৎকার সাজানো নয়। শুধু দুটো বিছানা, আর একটা আয়না।

ওদের পক্ষে এই যথেষ্ট।

তিনদিনের দিন সকাল থেকেই সারা জাহাজে বেশ একটু চাঞ্চল্য। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সবাই চোখের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে জলের ওপারে চেয়ে চেয়ে কি দেখছে।

জলের রং আর ঘন নীল নয়, ফিকে সবুজ।

ক্যাপ্টেনও চোখে দুরবীন লাগিয়ে নিজের ছোট ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ ক'দিনে ওরা শিখে গেছে। যে লোকগুলো জাহাজের কাজ করে, তাদের সারেং বলে।

একজন সারেংকে ডেকে তপু জিজ্ঞাসা করল।

কি হয়েছে? তোমরা সবাই ওরকম করে কি দেখছো?

সারেং হাসল।

একটু পরেই মাটি দেখা যাবে। বর্মার মাটি। মংকি পয়েন্ট। ওই দেখ, ডাঙা আর দূরে নেই।

দীপু আর তপু চেয়ে দেখল।

রেলিংয়ের পাশে পাশে বিরাট আকারের সাদা সাদা পাখী। উড়ছে। ঠিক যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজটাকে।

কি ওগুলো?

ওই তো সি-গাল পাখী। ওরা ডাঙার খবর নিয়ে আসে। সেইজন্য ওদের মারা বারণ। কেউ মারতেও পারবে না, ধরতেও নয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা রেলিংয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ওই তো কালো দাগ। জল শেষ হয়ে, মাটির রেখা।

দীপু আর তপু কিন্তু চোখ কুঁচকে সেদিকে চেয়েও কিছু দেখতে পেল না।

তবে একটু পরেই ফিকে সবুজ জল ঘোলাটে হয়ে এল। কাদাগোলা।

এবার সবুজ রেখাও স্পষ্ট দেখা গেল।

NOT FOR SALE

গাছপালাঢাকা মাটির চিহ্ন।

বিরাট একটা আর্তনাদ করে জাহাজটা দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে।

কি হল?

তপু প্রায় চীৎকার করে উঠল।

কি হবে?

জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল যে?

সারেং হাত নেড়ে দীপু আর তপুকে ডাকল।

এদিকে এস। ওই দেখ।

দীপু আর তপু এদিকের রেলিং-এ এসে দাঁড়াল।

ঠিক জাহাজের পাশে একটা সাদা মোটরলঞ্চ এসে দাঁড়িয়েছে। জাহাজ থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে জলের ওপর।

সারেং বলল, ওটা পাইলটের লঞ্চ। ওই দেখ সাদা পোশাক পরা পাইলট সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে।

কি করবে পাইলট?

সমুদ্রের পথঘাট ক্যাপ্টেনের সব জানা। জাহাজ নিয়ে আসতে তার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু নদীতেই মুশকিল। কোথায় জল কম, কোথায় জলের চোরাটান আছে সে সম্বন্ধে পাইলট ওয়াকিবহাল। তাই মোহানা থেকে রেঙ্গুন বন্দর পর্যন্ত এই পাইলটই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

এটা কি নদী?

এর নাম লেইং। ইরাবতীর একটা শাখা।

সারেংয়ের কথা শেষ হবার আগেই জাহাজ চলতে শুরু করল। জল কেটে কেটে।

এখন দু'পাশের তীরভূমি বেশ স্পষ্ট। লোকজনও দেখা গেল। দু'একটা কলকারখানা।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জাহাজ জেটিতে নোঙ্গর ফেলল।

জাহাজ থামতেই ডাক্তার এসে পাশে দাঁড়াল।

শোন, তোমরা যেন নেমো না। অচেনা জায়গা, বিপদে পড়বে। এখানে জাহাজ দিন দুয়েক থাকবে। মাল খালাস করে সিঙ্গাপুর চলে যাবে। তার আগে জাহাজ কোম্পানির অফিসে তোমাদের দিয়ে আসব। আজ বৃহস্পতিবার, শনিবার ফেরার জাহাজ আছে। এস. এস. এ্যাডাভানা কলকাতায় ফিরে যাবে, সেই জাহাজে তোমাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করব।

NOT FOR SALE

দীপু আর তপু কোন কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।

ডাক্তার সরে যেতে দীপু তপুকে বলল।

তপু, যে রকম করেই হোক এদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের পালাতে হবে, না হলে ভীষণ বিপদ্।

কি বিপদ্?

কি বিপদ্ বুঝতে পারছিস না? আরো দুটো কঞ্চি বাবা আমাদের পিঠে ভাঙবে। বাড়ি থেকে পালানোর কি শাস্তি ভাবতে গেলেই তো বুক কেঁপে উঠছে।

কিন্তু এখানে কোথায় যাব? কেউ তো আমাদের চেনে না।

তপু যেন একটু সন্দেহ প্রকাশ করল।

এই জাহাজেই কি কেউ আমাদের চিনত? একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল তো?

আর কোন কথা হল না। মাল নামানো শুরু হল। কুলির দল লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের ওপর উঠল। কতকগুলো সারেং সেজেগুজে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

দুই ভাই রেলিংয়ের ধারে বসে বসে দেখল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে চা খাওয়া সেরে দুজনে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। ক্যাপ্টেন বেরিয়েছে। ডাক্তার ওপরের ডেকে বসে বই পড়ছে।

চল, নামি।

দুজনে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে এসে দাঁড়াল।

জেটির বাইরে সোজা রাস্তা। দু'ধারে আলো জ্বলছে। জেটির ওপর তখনও কিছু মাল পড়ে রয়েছে।

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দীপু বলল, ওই দেখ বর্মী যাচ্ছে।

পরনে কালো ছোট কোট, রঙিন লুঙ্গি, পায়ে চটি একটা লোক হনহন করে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল।

তপু বলল, এ তো আবার আর একটা মুশকিল।

কি?

এদের ভাষাও তো বুঝব না। এক কথা বললে আর এক কথা শুনবে। মহা ঝামেলা হবে তাই নিয়ে।

দীপু বলল, এগিয়ে চল। এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। ডাক্তার একবার দেখতে পেলে লোক দিয়ে ধরে ফেলবে।

NOT FOR SALE

ছোট একটা পার্ক। দুজনে পার্কের মধ্যে ঢুকল।

কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল।

ঝাঁকড়া গাছের নীচে একটা বেঞ্চ। জায়গাটা অন্ধকার। লোকটাকে দেখা গেল না। তার গলার স্বর শোনা গেল।

কে তোমরা?

দুজনে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

বেঞ্চ থেকে যে লোকটা এগিয়ে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল, তার পরনে কালো জামা, কালো ঝলঝলে প্যান্ট। গোঁফজোড়া সরু হয়ে দু'পাশের ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। চোখের বালাই নেই। নাকের অবস্থাও তাই।

লোকটা চীনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু চীনে এত সুন্দর বাংলা বলছে কি করে?

দীপু বলল।

আমরা বাঙালী। কলকাতা থেকে জাহাজে করে বেড়াতে এসেছি।

এখানে কোথায় যাবে?

কোথায় যাব এখনও ঠিক করি নি। এখানে আমাদের জানাশোনা কোন লোক তো নেই।

তোমাদের সঙ্গে কে আছে?

কেউ নেই। আমরা দুজনেই বেরিয়েছি।

চীনেটি আরো কয়েক পা এগিয়ে দীপু আর তপুর মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দুটো হাত রাখল দুজনের কাঁধে।

হেসে বলল, চাকরি করবে তোমরা?

ওরা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেল।

তপু বলল, চাকরি পেলে আর কে না করে, কিন্তু আমাদের মতন এত ছোট ছেলেকে কে চাকরি দেবে?

চীনেটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। একসময়ে হাসি থামিয়ে বলল।

ছোট ছেলেদের জন্যও চাকরি আছে বৈকি। এমন চাকরি আছে যা কেবল ছোটদেরই উপযুক্ত। তোমরা করবে কিনা বল?

দীপু বলল, বললাম তো করব।

বেশ, তাহলে এস।

চীনে এগিয়ে চলল। দীপু আর তপু তাকে অনুসরণ করল।

NOT FOR SALE

পার্কের বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

চীনে কাছে গিয়ে দু'হাতে তালি দিল। গাড়োয়ানটা একটু দূরে ছিল, ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

চীনে হাসতে হাসতে বলল, উঠে পড় খুদে ভাইরা। তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

প্রথমে দীপু আর তপু তারপর চীনেটি গাড়িতে উঠে বসল।

দীপু আর তপু পাশাপাশি। উলটোদিকে চীনে।

গাড়ি ছাড়তে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা তুমি তো জাতে চীনে, তাই না?

চীনে হাসতে হাসতে বলল, আমার নাক দেখে বুঝতে পারছ না? যখনই দেখবে এক চোখের জল গড়িয়ে আর এক চোখে পড়ছে, তখন বুঝবে লোকটা চীনে।

চীনের কথায় দীপু আর তপু দুজনেই খুব জোরে হেসে উঠল।

এবার তপু বলল।

কিন্তু এত ভাল বাংলা শিখলে কি করে?

এবার চীনেটা আরো জোরে হেসে উঠল।

আরে আমি জাতে চীনে হলে কি হবে, কোনদিন কি আমি গেছি চীনদেশে! আমরা তিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। ট্যাংরায় আমাদের চামড়ার কারখানা। আমি অবশ্য বছর কুড়ি বর্মায় এসেছি ব্যবসা করতে।

তোমার কিসের ব্যবসা।

ব্যবসা কি আমার একটা, নানারকমের ব্যবসা। তোমরা থাকতে থাকতেই সব জানতে পারবে। তোমাদের মতন সেয়ানা ছেলেই তো খুঁজছিলাম এতদিন।

সেয়ানা বলাতে দীপু আর তপু দুজনেই খুব খুশী হল।

দীপু বলল, আমাদের মাইনে কিন্তু একটু বেশী দিতে হবে। আমাদের এই একটি সার্ট আর একটি প্যান্ট সম্বল। জামা কাপড় কিনতে হবে আমাদের।

তাছাড়া কিছু টাকা আমরা দেশেও পাঠাতে চাই।

তপুর হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। বিধবা মাকে কিছু টাকা পাঠানো দরকার।

গাড়ির মধ্যেটা অন্ধকার। চীনেটা হেসে উঠতেই তার দুটো সোনাবাঁধানো দাঁত চকচক করে উঠল।

NOT FOR SALE

চীনে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সব হবে, সব হবে। এখন নাম, আমরা এসে গেছি।

ছোট্ট কাঠের একতলা বাড়ি। সবই অন্ধকার। কেবল একটা ঘর থেকে মিটমিটে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

দীপু আর তপু আশা করেছিল লোকটা যে রকম ব্যবসার ফিরিস্তি দিচ্ছিল, বাড়িটাও সেই অনুপাতে জমজমাট হবে।

বাড়ির পিছনেই নদী। অন্ধকারে গোটা দুয়েক পালতোলা নৌকার কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

এস এস, নেমে এস।

চীনেটা হাসতে হাসতে আপ্যায়ন করল।

দীপু বলল, বাড়িটা এত অন্ধকার কেন?

আমি ছিলাম না বাড়িতে তাই অন্ধকার। এইবার আলো জ্বলবে। চলে এস তোমরা। ঠাণ্ডায় আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেক না।

দীপু আর তপু চীনের পিছন পিছন বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

একতলায় পৌঁছে চীনে বলল, ডানদিকে একটা ঘর আছে সেটাতে ঢুকে পড়। আমি বাতির বন্দোবস্ত করছি।

হাত দিয়ে অনুভব করে তপু বলল, দরজা যে বন্ধ।

অন্ধকারে চীনের হাসির শব্দ শোনা গেল।

দূর বোকা ছেলে, বন্ধ হবে কেন? ভেজানো আছে, ঠেললেই খুলে যাবে।

সত্যিই তাই। তপু হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে দীপু আর তপু ভিতরে ঢুকল।

তারপরই চমকে উঠল।

পিছনে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল বাইরে থেকে যেন শিকলও তুলে দেওয়া হল।

দীপু আর তপু দুজনেই দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আরে, দরজা বন্ধ করলে কেন? শুনছো, দরজা খোল।

কোন উত্তর নেই। ফাঁকা ঘরে ওদের চীৎকারের প্রতিধ্বনিই ফিরে এল।

দুজনে প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

খুট করে একটা শব্দ।

দীপু আর তপু ফিরে দাঁড়াল।

NOT FOR SALE

পিছনের কাঠের দেয়ালে চৌকো একটা গর্ত। তার মধ্যে চীনের মুখটা দেখা গেল। কাছে বোধ হয় বাতিও রয়েছে কারণ সেই বাতির আলো চীনের মুখের ওপর এসে পড়েছে।

পৈশাচিক একটা হাসি, তারপরই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

খোকাবাবুরা বিশ্রাম কর, একটু পরে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দীপু চীৎকার করে উঠল।

এভাবে আমাদের বন্ধ করে রাখলে কেন? কি মতলব তোমার?

চীনে দুটো চোখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল।

ছেলেমানুষ, বিদেশে পথ হারাবে, তাই ভাল জায়গায় রেখে দিয়েছি।

আমরা চেঁচাব। পুলিসে খবর দেব।

দীপু আর তপু দুজনেই প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে লাগল।

কেন চেঁচিয়ে নিজেদের গলা ভাঙবে? এ ঘরের আওয়াজ বাইরে যায় না।

বদমায়েশ কোথাকার, তোমাকে খুন করব।

শূন্যে ঘুষি ছুঁড়তে গিয়ে দুজনে দেখল, চীনের মুখটা গর্ত থেকে সরে গেছে, তার বদলে ম্লানদীপ্তি একটা লণ্ঠন লোহার শিকে ঝুলছে।

সেই আলোয় কামরাটা দীপু আর তপু ভাল করে দেখল।

এক কোণে খড়ের বিছানা পাতা। এদিকে কাঠের ছোট টেবিল, নীচে দুটো টুল। মেঝেটা সিমেন্টের, কিন্তু অনেক জায়গায় সিমেন্ট উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

দীপু খড়ের বিছানার ওপর বসল।

তপু টুলের ওপর।

দীপু ক্লান্ত গলায় বলল, মনে হচ্ছে আমরা ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি।

ডাকাতের পাল্লায়? তপুর কেমন একটু সন্দেহ হল, ডাকাত আমাদের ধরে কি করবে। আমাদের না আছে টাকাপয়সা, না আছে সোনার গয়না। বোধ হয় লোকটার উদ্দেশ্য অন্য।

কি উদ্দেশ্য?

আমাদের ওপর নির্যাতন করে আমাদের ঠিকানা যোগাড় করবে, তারপর জ্যাঠাকে লিখবে তোমাদের ছেলে যদি ফেরত চাও, তাহলে দশ হাজার টাকা অমুক জায়গায়, অমুক লোকের হাতে দিয়ে এস।

কিন্তু বাবা অত টাকা পাবে কোথায়?

না দিতে পারলে আমাদের হয়তো কেটে ফেলবে।

NOT FOR SALE

তাহলে উপায়?

উপায়, বলা যে আমাদের তিনকুলে কেউ নেই। কে উদ্ধার করবে টাকা দিয়ে।

তাতে কি রেহাই পাব?

কি জানি, লোকটার কি মতলব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নদী খুব কাছে। জলের ছলাৎ ছল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দীপু আর তপু দুজনেই দুর্দান্ত ছেলে। ভয় কাকে বলে জানে না। বয়সের চেয়ে অনেক সাহসী।

কিন্তু এই থমথমে পরিবেশে, নিজের দেশ থেকে এত দূরে একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ল।

আজ রাতটা হয়তো কিছু করবে না, কাল ভোরে চীনে আবার সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন তার মতলব বোঝা যাবে।

ঠিক দীপুর মাথার কাছে একটা শব্দ হতে সে লাফিয়ে খড়ের বিছানা থেকে উঠে এল।

মাথার ওপর একটা ফোকর, তার মধ্য দিয়ে একটা টিফিন কেরিয়ার টেবিলের ওপর নেমে এল।

বোঝা গেল একটা বাঁকানো তারের সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারটা আটকানো ছিল। টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ারটা বসিয়েই তারটা ফোকর দিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল।

দুজনেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

তাদের মনে হয়েছিল অদৃশ্য জায়গা থেকে চীনেটা হয়তো খাবার নির্দেশ দেবে।

দশ মিনিট কেটে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই।

দীপু বলল, আয় দেখি টিফিন কেরিয়ারে কি আছে।

সে এগিয়ে টিফিন কেরিয়ার খুলে বাটিগুলো টেবিলের ওপর সাজাল। দুটো বাটিতে লম্বা লম্বা চালের ভাত। দুটো বাটিতে থোড়ের ঝোল। আর একটা জায়গায় দুটো পেঁয়াজ।

খাবারের চেহারা দেখে চোখে জল এল। ক'দিন জাহাজে খাওয়াটা বেশ ভালোই হচ্ছিল। সেরকম জিনিস তারা বাড়িতেও কোনদিন চোখে দেখে নি।

তপু বলল, আয়, আরম্ভ করে দিই।

হাত বাড়িয়েও দীপু হাত গুটিয়ে নিল।

NOT FOR SALE

এতে বিষ মেশানো নেই তো?

তপু বলল, এখন আমাদের মেরে ফেলে চীনের লাভ কি? মেরে ফেলবার জন্য নিশ্চয় কষ্ট করে এতদূর নিয়ে আসে নি। আমরা যদি ওর উদ্দেশ্য সফল না করতে পারি, তখন মেরে ফেলার কথা ভাববে।

আর দ্বিধা না করে দুজনে খেতে শুরু করল।

খাওয়া শেষ করে দুজনে খড়ের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

শরীর খুবই পরিশ্রান্ত, কিন্তু উদ্বেগের জন্য ঘুম এল না। দুজনেই এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

একসময়ে কামরা অন্ধকার হয়ে গেল। বোধ হয় লণ্ঠন নিভে গেল কিংবা সেটাকে কেউ ফুটো দিয়ে টেনে ওপরে তুলে নিয়েছে।

রাত গভীর হতে, সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কেবল নদীর জলের আছড়ানির শব্দ একটু একটু করে জোর হতে লাগল।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিন্তু একটা হাসির আওয়াজে তপু জেগে উঠল।

দীপু, দীপু।

খুব ফিসফিস করে তপু ডাকল।

বল, আমি জেগে আছি।

দীপুর গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

হাসির আওয়াজ শুনতে পেলি?

হ্যাঁ।

কেউ বোধ হয় এ ঘরে ঢুকবে।

কি জানি বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আবার হাসির শব্দ। একজনের নয়, একাধিক লোকের। মনে হল হাসির আওয়াজটা যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

দীপু পিছনের দেয়ালে কান পাতল। ঠিক পিছন থেকেই যেন শব্দটা আসছে।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনের আর ঘুম এল না।

খুব জোর একটা আওয়াজ হতে দুজনেই চমকে উঠে বসল।

দরজা খোলা। ঠিক দরজার গোড়ায় চীনেটা দাঁড়িয়ে আছে।

কি, ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

NOT FOR SALE

দীপু চোখ মুছতে লাগল। তপু একদৃষ্টে চেয়ে রইল চীনের দিকে।

বিনা মতলবে চীনে নিশ্চয় এসে দাঁড়ায় নি।

দীপু চেঁচিয়ে উঠল।

কেন তুমি এভাবে আমাদের আটকে রেখেছ?

চীনের হাসি অম্লান। হাসলে মাংসের আড়ালে দুটো চোখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

হাসতে হাসতেই বলল, তোমাদের একটা ভাল চাকরি দেব, তাই এখানে রেখেছি। তোমরা যদি আমার কথা শোন, তাহলে খুব উন্নতি হবে তোমাদের। ভাল জামা কাপড় পাবে, আর পকেটবোঝাই পয়সা। দু'হাতে খরচ করবে। আর কথা যদি না শোন—

না শুনি তো কি হবে?

হাসি না থামিয়ে চীনে বলল, না শোন তো—

কথা শেষ না করে সে পা দিয়ে দেয়ালের গায়ে একটা বোতামে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় করে একদিকের পার্টিশন সরে গেল। লোহার গরাদ। তার পিছনে একটা চিতাবাঘ গর্জন করে উঠল।

দীপু আর তপু লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল।

ভয় নেই, ভয় নেই জোড়া খোকাবাবু, ওটা বন্ধ রয়েছে। এখন কিছু করতে পারবে না। তবে বোতামটা আর একটু জোরে টিপলে ওই গরাদগুলোও সরে যাবে, তখন ও এ-ঘরে ঢুকে পড়বে তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করতে।

চীনের অসাধ্য কোন কাজ নেই, সেটা দীপু আর তপু বেশ বুঝতে পারল।

তপু বলল, কি কাজ করতে হবে?

বলব, বলব, সময়ে সব বলব। ব্যস্ত হয়ো না। তোমাদের বয়সী একটি ছেলে একবার খুব তেজ দেখিয়েছিল; হুঁ হুঁ, মাংসটা গেল লালীর পেটে, আর হাড়গুলো বস্তাবন্দী করে নদীর জলে ফেলে দিলাম। তাই বলছি, কখনও গুরুজনের অবাধ্য হতে নেই। তোমাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো?

কেউ ভয়ে কোন উত্তর দিল না।

চীনে একটু বাইরে ঝুঁকে সজোরে হাততালি দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বেঁটে কদাকার একটা লোক এসে দাঁড়াল।

চীনে তাকে খুব চেঁচিয়ে বলল।

এই চা নিয়ে আয়।

NOT FOR SALE

লোকটা চলে যেতে চীনে বলল, এ ব্যাটা আবার বোবা আর কালা। খুব চেঁচাতে হয় আমাকে।

তপু একবার মুখ ধোবার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে সামলে নিল।

চা এল, সঙ্গে আধপোড়া রুটি।

চীনেটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপু আর তপু ভাবল, এইবার চীনেটা বোধ হয় আস্তে আস্তে দেশের বাড়ির খোঁজখবর নেবে। ঠিকানা চাইবে। যাতে চিঠি লিখতে পারে।

কিন্তু সেরকম কিছু করল না।

শুধু বলল, আজ রাতে একটু জেগে থেকো খোকারা। আজ থেকেই তোমাদের চাকরিতে লাগিয়ে দেব।

দীপু বলল, কিসের চাকরি?

আরে, বেশী জিজ্ঞাসা কর না। বললাম যে ভাল চাকরি। জীবনভোর চাকরি করতে হবে।

কথা শেষ করে চীনেটা হাসল।

চীনের এই হাসিতেই ভয় লাগে। এর চেয়ে যদি গালাগাল দিত কিংবা ধমক, দীপু আর তপু সহ্য করত, কিন্তু এই হাসি অসহ্য।

তপু বলল, আমাদের চাকরিতে দরকার নেই, তুমি আমাদের জাহাজেই রেখে এস।

দূর, তা কি হয়! আগে কেমন মজার চাকরি তাই দেখ।

চীনেটা সরে গেল।

বোঝা গেল বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালাচাবি দেবার শব্দও কানে এল।

সারাটা দুপুর একভাবে কাটল। ঠিক বারোটায় রেকাবিতে ভাত আর তরকারি এল। কয়েক গ্রাস মুখে ঠেকিয়েই দুজনে রেকাবি সরিয়ে রাখল।

ঠাণ্ডা, শক্ত ভাত। বিস্বাদ তরকারি।

দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

দুপুর কেটে বিকাল হল। বিকালের পর সন্ধ্যা।

রাতের খাওয়া শেষ করে দুজনে সবে শুয়েছে। একটু তন্দ্রার ভাব নেমেছে চোখে, এমন সময় ঝনাৎ করে দরজা খোলার শব্দ হল।

কই হে ওঠ, ওঠ, চাকরি করবে তো উঠে পড়।

NOT FOR SALE

দুজনে ধড়মড় করে উঠে বসল।

চীনেটা এগিয়ে এসে দু'হাতে দুজনকে ধরল তারপর আধো-অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোতে আরম্ভ করল।

চারপাশে ঘন আগাছা, ইঁটের পাঁজা, মাঝখানে সংকীর্ণ রাস্তা। খুব কাছে না গেলে দেখাই যায় না।

চীনে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, খুব সাবধানে নেমে যাও।

তপু বলল, নামব কি, পথই যে দেখতে পাচ্ছি না।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের উজ্জ্বল আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল।

দীপু আর তপু দুজনেই দেখল, চওড়া সিঁড়ির ধাপ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে।

নামো, নামো, দেরি করো না।'

তাড়া খেয়ে দীপু আর তপু নামতে শুরু করল। ঘোরানো সিঁড়ি। দু'ধারে কাঠের রেলিং। একেবারে চাতালে নেমে দুজনেই অবাক্ হয়ে গেল।

টর্চের আলোর আর দরকার নেই। চারদিকে আলোর ব্যবস্থা। দিনের মতন পরিষ্কার।

কাঠের একটা পার্টিশন। তার ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

এবার দীপু আর তপু বুঝতে পারল, কাল রাতে এই হাসির শব্দই তারা শুনতে পেয়েছিল।

এবার চীনে একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল।

এস, আমার সঙ্গে। এদিক ওদিক দেখবার দরকার নেই।

এভাবে সতর্ক না করলে দীপু আর তপু হয়তো কোন দিকেই দেখত না। সোজা চলে যেত।

কিন্তু চীনের কথাতে দুজনেরই সন্দেহ হল।

তাহলে এদিকে ওদিকে নিশ্চয় কিছু দেখবার আছে।

লাল পর্দা টাঙানো। শীতের মধ্যেও ভিতরে পাখা ঘুরছে। সেই পাখার বাতাসে মাঝে মাঝে পর্দাটা উড়ছে।

তার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল।

সামনে পাশার মতন একটা ছক ফেলা। চারদিকে চারজন বসে আছে। পরনে ছোট ছোট কোট আর রঙিন লুঙ্গি। মাথাতেও রঙিন কাপড়ের টুকরো বাঁধা।

একটা কৌটায় হাড়ের একটা ঘুঁটি নিয়ে ফেলছে আর যে জিতছে, সে-ই বোধ হয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠছে।

NOT FOR SALE

চারজনের পাশেই চারটে গড়গড়া। কেউ নলটা হাতে ধরে আছে, কেউ টানছে।

একেবারে কোণের দিকে একটা ঘরে গিয়ে চীনে চেয়ারে বসল।

তারপর দুজনের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল।

এইখানে তোমাদের কাজ করতে হবে। যারা খেলছে, সেবা করতে হবে তাদের।

সেবা?

সেবা মানে যে লোকগুলো খেলছে তাদের তরিবত করা। সময়ে চা খাবার দেওয়া, অন্য সব ফাইফরমাশ খাটা।

দীপু আর তপু কোন উত্তর দিল না। বুঝতেই পারল উত্তর দিয়ে কোন লাভ নেই। চীনে যা বলবে, তা করতেই হবে। অমান্য করলেই সর্বনাশ।

পরের দিন থেকেই দুজনে কাজে লেগে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজের আসল চেহারা মালুম হল। পাঁচ মিনিট অন্তর কালো চা দেওয়া, একটু দেরি হলেই লোকগুলো খেপে যেত। কাছে ডেকে চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক প্রহার।

কত রাত পর্যন্ত যে খেলা চলত, তার ঠিক নেই। দীপু আর তপুকে জেগে অপেক্ষা করতে হত আসরের একপাশে।

তারপর সবাই চলে গেলে সেই বোবা আর কালা লোকটা এসে দাঁড়াত। ইঙ্গিতে দুজনকে পিছন পিছন যেতে বলত।

সেই পুরোনো কামরা, পুরোনো খড়ের শয্যা।

দিন পনেরো পরেই বিপদ হল।

যেটা শুধু খেলার আসর বলে দীপু আর তপু মনে করেছিল, ক'দিনেই বুঝতে পারল সেটা আসলে জুয়ার আড্ডা।

এক একজন খেলোয়াড়ের পাশে স্তূপীকৃত নোট। খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই নোট হাত বদল করে। যে হারে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, এবং তার সব তাল পড়ে দীপু আর তপুর ওপর।

মাঝরাতে দুজনে কালো চা এনে আসরে রাখছিল। লোকগুলোর তন্ময়তা দেখে মনে হল খেলাটা খুব জোর জমেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কেবল ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ।

হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ। মনে হল বন্দুকের।

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো পাশে রাখা নিজেদের নোটগুলো নিয়ে পকেটে পুরল।

আবার দুম করে আওয়াজ। এবার যেন আরো কাছে।

NOT FOR SALE

একটা লোক হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে ঝুলন্ত লণ্ঠনগুলোর ওপর সজোরে আঘাত করল। লণ্ঠনের কাঁচগুলো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাতি নিভে সব অন্ধকার।

দীপু আর তপু বুঝতে পারল, সেই জমাট অন্ধকারে একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে। সবাই যেন একটা দিক লক্ষ্য করে ছুটেছে।

দীপু অন্ধকারের মধ্যে তপুর হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল।

এই তপু, শীগগির ওদের পিছনে পিছনে চল। ওরা অন্য দিক দিয়ে বের হবার রাস্তা জানে।

দুজনে ছুটতে শুরু করল।

ততক্ষণে সিঁড়িতে একটা টর্চের আলো দেখা গেল। টর্চ নিয়ে কে যেন দ্রুত নেমে আসছে।

সেই টর্চের স্বল্প আলোতেই দেখা গেল একটা আলমারি। তার পাল্লা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

দীপু আর তপু আর একটুও বিলম্ব করল না। আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই আলমারির পাল্লাদুটো একেবারে এঁটে বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকগুলো কোন্ দিকে গেল কিছু বুঝতে পারল না।

এটুকু বুঝতে পারল, এতদিন যেটাকে আলমারি ভেবে এসেছে, আসলে সেটা আলমারি নয়, বাইরে যাবার রাস্তা।

বোধ হয় কোথাও কোন স্প্রিং আছে, যার সাহায্যে আলমারির পাল্লাদুটো খোলা এবং বন্ধ করা যায়।

আস্তে আস্তে তপু পা ঘষতে লাগল।

মনে হল ভিতরে যেন ধাপ রয়েছে। নীচে নামবার সিঁড়ি।

দীপু।

উঁ।

মনে হচ্ছে নামবার সিঁড়ি আছে। লোকগুলো এখান থেকেই কোথাও চলে গেছে। আমরা নামবার চেষ্টা করি।

দুজনে হাত আঁকড়ে ধরে খুব সাবধানে পা ফেলে নামতে লাগল।

যেন অনন্ত সোপান। শেষ নেই। বেশ কয়েকবার দুজনেই আছাড় খেতে খেতে সামলে নিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল, আবার নামতে শুরু করল।

NOT FOR SALE

যত নামতে লাগল, ততই নদীর কল্লোল স্পষ্ট হতে লাগল। নদী তো কাছেই, এই সিঁড়ি বোধ হয় নদীতেই শেষ হয়েছে।

ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই তপু চেঁচিয়ে উঠল, দীপু।

চেঁচাবার কারণ দীপুর বুঝতে অসুবিধা হল না।

জলে দুজনের গোড়ালি ডুবে গেছে।

তপু বলল, আর এগোলে আমরা তো নদীর মধ্যে গিয়ে পড়ব।

দীপু কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও তো নিরাপদ নয়। জোয়ারের জল এসে আমাদের ডুবিয়ে দেবে। যদি আমরা সিঁড়ি দিয়ে আরো ওপরে উঠে যাই, তাহলেও বাঁচব না। কতক্ষণ এই অন্ধকার গহ্বরে থাকব?

তপু বলল, তার চেয়ে জল ঠেলে এগোই চল। লোকগুলো তো এই পথেই গেছে।

দুজনে এগোতে আরম্ভ করল।

জল হাঁটুর ওপর। স্রোত দেখে বুঝতে পারল, এ জল নদীর।

বেশ কিছুটা যাবার পর সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে এল।

মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। দু'একটা তারা জ্বলছে।

নদীর প্রায় মাঝবরাবর একটা মোটর লঞ্চ দেখা গেল।

তপু সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল।

হয়তো লোকগুলো ওই লঞ্চেই পালিয়েছে।

দীপু বলল, খুব সম্ভব, কিন্তু আমরা কি করব?

চল, এপাশ দিয়ে যাই। নদীর জল ছেড়ে আমাদের ডাঙায় উঠতে হবে।

এদিকে জল কম, কিন্তু কাদা হাঁটু পর্যন্ত। খাড়া পাড়।

দুজনে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

সামনেই একটা জেটি। বোধ হয় ব্যবহার হয় না। একদিকটা ভেঙে গেছে।

তপু আর দীপু কাঠে পা দিয়ে দিয়ে সেই জেটির ওপর উঠল।

সর্বাঙ্গে কাদা, বুক পর্যন্ত ভেজা, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। আর চলবার শক্তি নেই। জেটির এককোণে একটা ছেঁড়া ত্রিপল পড়ে ছিল, কোনরকমে গিয়ে দুজনে তার ওপর শুয়ে পড়ল।

ব্যাস, আর চোখ খুলে রাখার ক্ষমতা নেই। দুজনে গাঢ় ঘুমে অচেতন।

কিছু লোকের কলরবে ঘুম ভেঙে গেল।

রোদ উঠেছে। নদীতে বোধ হয় জোয়ার। জলের শব্দ খুব জোর।

NOT FOR SALE

দুজনে উঠে বসল।

জেটির ওপর কয়েকজন ভদ্রলোক পায়চারি করছে। নানাজাতের লোক। ভারতীয় আছে, বর্মীও আছে। দু'একজনের সঙ্গে ছেলে-পুলেরাও রয়েছে।

ছেলেরা অবাক্ চোখ মেলে তপু আর দীপুর দিকে চেয়ে রয়েছে।

অবশ্য তাদের দোষ নেই। একজন আর একজনের দিকে চেয়েই বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারল। সারা মুখে কাদা, তখনও জামা প্যান্ট কিছু ভিজে। কিম্ভূতকিমাকার দুটি মূর্তি।

তপু বলল, এবার? এবার কি করবি?

দীপু উঠে দাঁড়াল।

চল এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি পাক দিচ্ছে। অন্ধকার দেখছি চোখে।

আমারও তো সেই অবস্থা।

দুজনে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

দীপু বলল, আয়, আগে মুখ হাতের কাদা ধুয়ে ফেলি। এমন অবস্থায় দেখলে সবাই পাগল ভাববে।

তপু বলল, কোথায় ধুবি?

চল, ওই চায়ের দোকানে একটু জল চেয়ে দেখি। নদীতে নামলে আবার তো কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে।

রাস্তার পাশেই ছোট একটা চায়ের দোকান।

বিরাট এক কেটলি চাপানো। পাশে একটা বড় উনানে রুটি সেঁকা হচ্ছে। সে রুটির সাইজও বিরাট।

টিনের চেয়ার টেবিল। যারা চা রুটি খাচ্ছে তাদের দেখে শ্রমিক শ্রেণীরই মনে হল।

দুজনে দোকানের এক ছোকরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু মুখ ধোবার জল দেবে?

ছোকরা একবার মুখটা তুলে ওদের দিকে দেখল, তারপর বলল।

বাইরে বালতি আর মগ আছে।

দোকানে ঢোকবার মুখে জলভরা বালতি ছিল। পাশে মগ।

মুখ হাত ধোয়া শেষ করে দুজনে আবার দাঁড়াল দোকানের সামনে।

ভীষণ খিদে পেয়েছে। যদি কেউ দয়াপরবশ হয়ে একটু চা কিংবা রুটির টুকরো খেতে দেয়। কারুর প্লেটের ভুক্তাবশেষ খেতেও আজ তাদের কোন আপত্তি নেই।

NOT FOR SALE

কিন্তু কেউ তাদের দিকে একবার ফিরেও দেখল না!

দু'একজন করে শ্রমিকরা উঠে যেতে লাগল।

এই শোন।

খুব মোলায়েম কণ্ঠস্বরে দুজনেই চমকে উঠল।

এতক্ষণ শ্রমিকদের ভিড়ের জন্য চোখে পড়ে নি। এবার দেখা গেল।

চোখে কালো চশমা, পরনে দামী ছোট কোট আর লুঙ্গি, একজন বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, সেই কথা বলল।

তবু নিশ্চিত হবার জন্য তপু বলল।

আমাদের?

লোকটা এবার কথা নয়, ইশারায় ওদের কাছে ডাকল।

চল, লোকটা কিছু খেতে দিতেও পারে।

দুজনেই আস্তে আস্তে এগিয়ে লোকটার টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তোমরা দুজনে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। কি ব্যাপার বল তো?

তপু একটু ইতস্ততঃ করল।

দীপু বলল, আমরা এদেশে নতুন। জাহাজ থেকে নেমে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

তাই বুঝি? তাহলে তো তোমরা ভীষণ মুশকিলে পড়েছ।

হ্যাঁ, এইবার তপু বলল, কাল থেকে আমাদের পেটে কিছু পড়ে নি।

আহা হা, তাই তোমাদের মুখ এত শুকনো দেখাচ্ছে। বস, বস, সামনের চেয়ারে বসে পড়।

কথা শেষ হবার আগেই দুটো চেয়ার টেনে দুজনে বসে পড়ল।

লোকটা দোকানের ছোকরাকে হাত নেড়ে ডেকে বলল।

এই এদের পেট ভরে খাইয়ে দাও তো।

যতক্ষণ দীপু আর তপু খেল, লোকটা বসে বসে কাগজ পড়তে লাগল।

খাওয়া শেষ হতে কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

চল, তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।

দীপুর সঙ্গে তপুর দৃষ্টি বিনিময় হল।

অর্থাৎ, আবার কি ব্যবস্থা! নতুন কোন বিপদের মধ্যে পড়ব না তো!

দীপু ফিসফিস করে বলল।

NOT FOR SALE

পৃথিবীর সব লোক অসৎ, তা কি হতে পারে। কিছু ভাল লোকও তো আছে।

তপুর সন্দেহ গেল না।

জিজ্ঞাসা করল, আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করবেন?

চীনেটা পরিষ্কার বাংলা বলত, এ লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। ঘোরতর বিপদের মধ্যে না পড়লে এ ধরনের বাংলা শুনলে দীপু আর তপু দুজনেই হাসাহাসি করত।

লোকটা বলল, জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা। তোমাদের কথা তাদের জানিয়ে দেব, যাতে অন্য একটা জাহাজে তোমাদের ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়।

আবার ভারতবর্ষ, তার মানে অভিভাবকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

যে অপরাধ দুজনে করেছে তাতে এবার হয়তো পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবে।

তবু বিদেশে এই অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে, এভাবে বিপদের পর বিপদের ঝুঁকি নেবার চেয়ে, দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল।

রাস্তার ওপর কালো একটা মোটর।

লোকটা মোটরের দরজা খুলে বলল।

একটু সাবধানে উঠ, ভিতরে আমার অনেক জিনিস রয়েছে।

সত্যিই তাই। সীটের ওপরে, নীচে ছোট বড় অনেক প্যাকেট।

দুজনে গুঁড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে লোকটা দুজনের নাকের ওপর রুমাল চেপে ধরল দু'হাতে। তীব্র ওষুধের গন্ধ। মাথা ঘুরে গেল। আস্তে আস্তে চোখের ওপর কালো যবনিকা নেমে এল।

প্রথমে তপু চোখ মেলল। তারপর দীপু।

দুজনে বড় একটা খাটে শুয়ে ছিল।

এদিক ওদিক চোখ ফেরাতেই চায়ের দোকানে দেখা লোকটা নজরে পড়ল। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে ছিল।

এদের চোখ মেলতে দেখে সে খাটের পাশে এসে দাঁড়াল।

কি, শরীর কেমন লাগছে?

তপু চেঁচিয়ে উঠল।

শরীরের খোঁজ নিচ্ছ? তুমিই তো নাকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে দিয়েছিলে।

NOT FOR SALE

লোকটা হাসল। আকর্ণবিস্তৃত হাসি, কিন্তু নিঃশব্দ।

হাসি থামতে বলল, এমনি কি আর তোমরা আসতে। চেঁচামেচি শুরু করে লোক জড়ো করে ফেলতে। আমি পড়তাম মুশকিলে।

দরজায় খট্ করে একটা শব্দ হল।

দীপু আর তপুকে সচকিত করে সেই চীনেটা ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখে বর্মী লোকটা বলল।

এই যে আ লিম খুড়ো এসে গেছে। তোমাদের সঙ্গে খুড়োর তো চেনা আছেই।

আ লিম এগিয়ে এসে দীপু আর তপুর পিঠ চাপড়াল।

বাহাদুর ছেলে। কাল রাতে পুলিসের লোকটাকে খুব ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছ। তোমরা ধরা পড়লেই মুশকিলে পড়তাম। তোমাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত।

দীপু হঠাৎ বলল।

পুলিসের লোকই বা তোমার আড্ডায় হামলা করল কেন?

খাটের এক প্রান্তে বসে পড়ে আ লিম মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

আর বল কেন। ওদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। যত শান্তিপ্রিয় লোকদের পিছনে লাগাই ওদের স্বভাব।

দীপু আর তপু কিছু বলল না। ওটা জুয়ার আড্ডা সেটা যে ওদের অজানা নয় এ কথা জানতে পারলে আ লিম হয়তো খেপেই যাবে।

আ লিম বলল।

যাক, তোমরা খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। বিকালে তোমাদের একজায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব।

কথা শেষ করে আ লিম আর দাঁড়াল না। খাট থেকে নেমে বেরিয়ে গেল।

তখন দীপু বর্মীটাকে বলল।

তুমি যে বলেছিলে আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবে!

বর্মী মুখ মুচকে হাসল।

কি হবে দেশে ফিরে। এখানে থেকে যাও। এ বড় মজার দেশ। যাক. আগে তোমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করি।

খাওয়াদাওয়া ভাল। থাকার ব্যবস্থাও উত্তম।

তবে জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল দুজন বর্মী ছোকরা পাহারা দিচ্ছে। দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ।

NOT FOR SALE

আ লিম এল বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে।

এই নাও তোমাদের জন্য নতুন পোশাক এনেছি, পরে নাও। এবার আমরা বেড়াতে বের হব।

আ লিম খাটের ওপর দুটো নতুন সার্ট আর নতুন প্যান্ট ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীপু বলল, এই জামা প্যান্টটার আর পদার্থ নেই। নতুন পোশাক পরি, কি বল?

তপু ম্লান হাসল, খুড়ো যখন বলেছে, তখন পরতেই হবে। এখানে আমাদের মতামতের কোন দাম নেই।

একটু পরে আবার আ লিম ঢুকল।

পরা হয়ে গেছে। বেশ বেশ, চল, বের হই এবার।

তিনজনে বের হল।

কালো একটা মোটর সামনে। সমস্ত কাঁচগুলো কালো রং দেওয়া। বাইরে থেকে ভিতরের কিছু দেখার উপায় নেই।

এরা উঠতেই মোটর ছেড়ে দিল।

বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না, ভিতর থেকে কাঁচে চোখ রাখলে বাইরের সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

দীপু আর তপু কাঁচে চোখ রেখে দেখতে লাগল।

একটু গিয়েই চোখে পড়ল সোনালী রং করা গম্বুজাকৃতি একটা মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে অনেকে উঠছে।

এটা কিসের মন্দির?

তপু জিজ্ঞাসা করল।

আ লিম দেখল না। গাড়ির মধ্যে চোখ রেখেই বলল, ওটা হচ্ছে সুলে প্যাগোডা। মানে, ছোট ফয়া। বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে এখানে।

প্যাগোডা পার হয়ে মোটর ছুটল। অনেকটা যাবার পর দুপাশের দৃশ্য দেখে তপু আর দীপুর মনে হল, মোটর শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামে ঢুকছে। বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। বিরাট সাইজের কাঠের গুঁড়ি কোথাও স্তূপাকার করা।

একসময়ে মোটর থামল।

চারদিকে ফাঁকা মাঠ। ছোট ছোট ঝোপ। একটা বড় নালা। তার ওপর বাঁশের সাঁকো।

NOT FOR SALE

আ লিম বলল।

আমার একটা উপকার করতে পারবে?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করল।

এই মাঠটা পার হয়ে একটা কাঠের একতলা বাড়ি দেখতে পাবে। তার মালিকের হাতে এই প্যাকেটটা দিয়ে আসতে হবে। বলবে, এ মাসের খোরাক। আমিই যেতাম কিন্তু সকাল থেকে কোমরে একটা ব্যথা হয়েছে, চলতে কষ্ট হচ্ছে।

দীপু বলল, কিন্তু আমাদের ভাষা ও লোকটা বুঝবে কেন?

বা, ঠিক কথা বলেছ, আ লিম খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কথাটা আমার খেয়ালই হয় নি। কোন কথা বলতে হবে না, তোমরা দুজনে বরং একসঙ্গে মাথায় একটা হাত রেখ। তাহলেই আমার বন্ধু বুঝতে পারবে।

দীপু আর তপু সাঁকো পার হয়ে এগিয়ে চলল।

অনেকটা যাবার পর পিছন ফিরে দেখল। আ লিম মোটরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

এটার মধ্যে কি আছে বল তো তপু?

বোঝাই যাচ্ছে কোন নিষিদ্ধ জিনিস। গাঁজা, আফিং কিংবা কোকেন। বুড়োর কোমরে ব্যথার কথা সব বাজে, বিপদটা আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিল। ধরা পড়ি তো আমরা পড়ব।

দীপু একবার এদিক ওদিক দেখে বলল।

চারদিক ফাঁকা। পালাবার চেষ্টা করলে হয়।

উঁহু, নিশ্চয় চারদিকে বুড়োর চর আছে। পালানো সম্ভব হবে না। ধরা পড়লে নির্যাতন শুরু হবে। একেবারে খতম করে দেওয়াও বিচিত্র নয়।

দুজনে দ্রুত পা ফেলে চলতে লাগল।

একটা খালের ধারে একতলা বাংলো। চারদিকে বাগান। ধারেকাছে যখন আর কোন বাড়ি নেই, তখন এটাই হবে।

লোহার ফটক। বন্ধ।

কাছে গিয়েই দীপু আর তপুর খেয়াল হল, কি বলে ডাকবে? লোকটার নাম তো জানা নেই। এ বাড়িতে অনেকগুলো লোক যদি থাকে, তাহলে প্যাকেটটা কার হাতে দেবে?

দুজনে আলোচনা করতে করতে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

হাত দিয়ে গেটটা তো নাড়ানো যাক। দেখি কে আসে।

NOT FOR SALE

গেটটা হাত দিয়ে ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ।

চমকে দুজনে পিছিয়ে এল।

গেটের ওপারে নেকড়ে বাঘের সাইজের এক কুকুর। লকলক করছে জিভ। দুটো থাবা গেটের ওপর দিয়ে বিকট গর্জন করে চলেছে।

কি ভাগ্যিস, গেটটা বন্ধ ছিল, না হলে বাঘের মতন ওই কুকুরটা এতক্ষণে দুজনের টুঁটি কামড়ে ধরত।

পালিয়ে যাবে কিনা ভাববার মুখেই বারান্দায় একটি লোক এসে দাঁড়াল। মাথাজোড়া চকচকে টাক, ঝোলা গোঁফ, চোখদুটো এত ছোট যে আছে কিনা বোঝাই দুষ্কর।

কে? কি চাই।

উত্তরে দীপু প্যাকেটটা তুলে ধরল। তপু একটা হাত রাখল নিজের মাথায়।

মনে হল প্যাকেটটা দেখে লোকটা যেন একটু প্রসন্ন হল।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে কি বলল। অমন বাঘের মতন তেজী কুকুর পলকে শান্ত হয়ে গেল।

গেটটা খুলতেই দীপু আর তপু কিন্তু বেশ কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু না, কুকুরটা এল না। ল্যাজ গুটিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

লোকটা এগিয়ে এসে এদিক ওদিক দেখল তারপর কোন কথাবার্তা নয়, চিলের মতন ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেট বন্ধ করে দিল।

দীপু আর তপু তো অবাক্।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ফেরার পথ ধরল।

পথে তপু বলল, আমাদের দিয়ে কেন এসব করাচ্ছে বুঝতে পারছিস?

পারছি বইকি। পুলিস যদি ধরে আমাদের ধরবে। তাছাড়া আমরা এদেশে নতুন, পথঘাট চিনি না, ওদের আস্তানাও জানি না। কাজেই পুলিসের কাছে কিছুই বলতে পারব না।

আমাদের তাহলে সাবধান হওয়া উচিত।

সাবধান আর কি করে হব? এদের কাজ করব না বললে হয়তো মেরেই ফেলবে।

তা সত্যি।

সাঁকো পার হয়ে দুজনে রাস্তায় এসেই অবাক্।

NOT FOR SALE

রাস্তা ফাঁকা। মোটর কোথাও নেই। আ লিমও নয়।

চারদিকে একটু একটু করে অন্ধকার নামছে। কাছাকাছি বসতি নেই বলে, আলোও দেখা যাচ্ছে না। এধারে ওধারে জোনাকির মেলা।

তাইতো মোটর কোথায় গেল?

তপুর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল সে ভয় পেয়েছে।

আমাদের ফেলে চলে গেল নাকি?

কিন্তু তাতে চীনের লাভ?

কি জানি, হয়তো পুলিস ঘোরাফেরা করছিল, দেখে মোটর নিয়ে সরে পড়েছে।

উপায়?

চল, যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকে হাঁটতে আরম্ভ করি।

দুজনে তাই করল। বুঝতে পারল এতটা পথ হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক করল, রাস্তায় যদি কোন বাড়ি পায়, সেখানে আশ্রয় চাইবে।

তাতেও অসুবিধা কম নয়। এদেশের ভাষা জানে না। নিজেদের বিপদের কথা বোঝাবে কি করে?

কিছুটা গিয়েই দুজনে চমকে উঠল।

মোটরের হর্ন, অথচ ধারেকাছে কোথাও মোটর নেই।

দুজনে দাঁড়াল।

একটু পরেই ঝোপের আড়াল থেকে একটা মোটর বেরিয়ে এল।

মোটর থেকে আ লিম নামল।

আরে, দুজনে হনহন করে চলেছ কোথায়?

কি করব, রাস্তায় মোটর দেখতে পেলাম না।

আ লিম হাসল। আধো-অন্ধকারে তার সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো চকচক করে উঠল।

রাস্তার মাঝখানে মোটর রাখতে আছে! ফাঁকা রাস্তা, কখন আর কোন গাড়ি এসে ধাক্কা লাগিয়ে দেবে, তাই একপাশে মোটর সরিয়ে রেখেছিলাম। নাও নাও, উঠে এস।

দীপু আর তপু মোটরে উঠে বসল।

মোটর চলতে শুরু হতে আ লিম জিজ্ঞাসা করল।

জিনিসটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ তো?

তপু বলল, তা দিয়েছি, কিন্তু কি সাংঘাতিক কুকুর। কামড়ালে আর বাঁচতে হত না আমাদের।

NOT FOR SALE

আ লিম আবার হাসল।

বুঝলে না, ওরকম ফাঁকা জায়গায় থাকে, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। সেইজন্যই বাঘা কুকুর রেখেছে।

দীপু প্রশ্ন করল।

আচ্ছা, ও জিনিসটা কি? যেটা আমরা দিয়ে এলাম।

অন্ধকারে আ লিমের মুখ দেখা গেল না। মনে হল দাঁতে দাঁত চেপে সে যেন অস্ফুট একটা শব্দ করল।

তারপর ঢোঁক গিলে বলল।

ওষুধ, ওষুধ। বেচারী হাঁপানিতে ভুগছে। বাড়ি থেকেও বের হতে পারে না, তাই ওষুধ পাঠিয়ে দিলাম।

সারাটা রাস্তা আর কোন কথা হল না।

পুরোনো আস্তানায় পৌঁছে বর্মী লোকটির হাতে দুজনকে ছেড়ে দিয়ে আ লিম চলে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর তিনজনে কথা হল।

দীপুই শুরু করল।

তুমি আমাদের দেশে ফেরার কি করলে?

একটা কাঠি দিয়ে বর্মী দাঁত খুঁটছিল। খুঁটতে খুঁটতেই বলল।

দেশে ফিরে আর কি করবে তোমরা? এখানেই থেকে যাও, তোমাদের ভাল হবে।

দীপু রেগে উঠল।

ছাই ভাল হবে। রোজ রোজ আমাদের দিয়ে গাঁজা কোকেন চালান দেবার চেষ্টা। পুলিসের কাছে ধরা পড়লে কি হাল হবে আমাদের?

দীপুর কথার সঙ্গে সঙ্গে বর্মীর সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে বজ্রকঠিনস্বরে বলল।

বেশী চালাক হবার চেষ্টা করো না, বিপদে পড়বে। ঠিক যা বলব, সেইটুকু করে যাবে। কোন কথা বলবে না। তোমাদের মতন অবাধ্য গোটা তিনেক ছেলে আমাদের হাতে এসেছিল। মেজাজ দেখিয়েছিল, তিনটেই চিতাবাঘের খোরাক হয়ে গেছে। সাবধান।

বর্মীটা উঠে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত দুজনের চোখে ঘুম এল না। বিছানায় চুপচাপ বসে রইল। কথা বলতেও সাহস হল না। এরা বাংলা বোঝে। বলা যায় না, চারদিকে হয়তো কান পেতে রেখেছে।

NOT FOR SALE

পরের দিন উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

যখন উঠল, তখন রোদের তেজ খুব কড়া।

বিছানায় বসে দেখল, টেবিলের ওপর দু কাপ চা আর দু বাটি শিমের বীচিসিদ্ধ পড়ে রয়েছে।

মুখ হাত ধুয়ে দুজনে খেয়ে নিল।

আ লিম এল বিকালের দিকে।

নাও নাও, মুখ হাত ধুয়ে নাও। বিকালে একটু না বের হলে শরীর থাকবে কি করে?

ওদের স্বাস্থ্যের জন্য এত উদ্বেগের আসল কারণ বুঝতে দুজনেরই কোন অসুবিধা হল না।

কিন্তু এও বুঝল, এটা আদেশ।

এ আদেশ মানতেই হবে।

সেই মোটর, তবে আজ মোটর নদীর ধার দিয়ে চলল।

কয়েকটা জাহাজও দীপু তপুর চোখে পড়ল আর সেই সঙ্গে তাদের দুটো চোখ জলে ভরে উঠল।

কোনরকমে যদি একটা জাহাজে ওরা উঠতে পারত তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে পায়ে ধরে যেমন করে হোক দেশে ফেরার ব্যবস্থা করত।

মোটর থামল। যেখানে থামল সেখানে কোন জেটি নেই। কাদাভর্তি জমি। কিছু সাম্পান মাঝখানে ঘোরাফেরা করছে।

আ লিম নেমে এদিক ওদিক দেখল তারপর চাপাগলায় ড্রাইভারকে কি বলল। ড্রাইভার বিচিত্র ঢংয়ে হর্ন বাজাতে শুরু করল। প্যাঁ প্যাঁ পোঁ। প্যাঁ প্যাঁ পোঁ।

বারকয়েক বাজাতেই মাঝদরিয়া থেকে একজন মাঝি সাম্পানের ওপর দাঁড়িয়ে, দুটো হাত মুখের পাশে দিয়ে চীৎকার করল, তারপরই জল কেটে কেটে সাম্পান ডাঙ্গার দিকে নিয়ে এল।

বাঁশের একটা খুঁটিতে সাম্পান বেঁধে মাঝি কাদা ভেঙে ওপরে উঠে আ লিমকে সেলাম করল।

আ লিম দীপু আর তপুকে দেখিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল। মাঝি ঘাড় নাড়ল।

তারপর আ লিম দীপু আর তপুর দিকে ফিরে বলল।

তোমরা সাম্পানে ওপারে চলে যাও। ঘাটে একজন লোক থাকবে। তোমরা যেতেই জিজ্ঞাসা করবে, ওপারে চালের দর কি রকম? তোমরা

NOT FOR SALE

বলবে, এপারের মতনই। ব্যস্, তারপর লোকটা তোমাদের পথ দেখিয়ে যে বাড়িতে নিয়ে যাবে, সে বাড়ির মালিককে এই প্যাকেটটা দিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছ?

ঘাড় নেড়ে, আ লিমের কাছ থেকে মাঝারি সাইজের একটা প্যাকেট নিয়ে দীপু আর তপু মাঝির সঙ্গে নেমে গেল।

খুব সন্তর্পণে কাদার ওপর দিয়ে দীপু আর তপু সাম্পানে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মোটর ছেড়ে দিল।

দীপু চুপিচুপি তপুকে জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের ফেরার কি হবে?

তপু বলল, ভগবান জানেন। বোধ হয় ওপারের লোকটাই তার নির্দেশ দেবে।

ওপারে পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল।

ভাঙা একটা ঘাট। ইঁট-বের-করা। কাছেপিঠে কেউ নেই।

দুজনে সমস্যায় পড়ল। তাহলে কে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে।

মাঝি নামিয়ে দিয়েই সাম্পান নিয়ে সরে গেল।

দীপুর হাতে প্যাকেটটা ছিল। সার্টের মধ্যে।

দুজনে ঘাটের চাতালে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল। কাউকে দেখতে পেল না।

অনেক দূরে কয়েকটা বস্তি। দু একটা কারখানাও দেখা যাচ্ছে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ওগুলো বোধ হয় চালের কল। বইতে দীপু আর তপু পড়েছিল বর্মাদেশ চালের জন্য বিখ্যাত।

কিন্তু লোক না থাকলে কি করবে এই প্যাকেট নিয়ে। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

ফিরেই বা যাবে কি করে। সাম্পান অনেক দূরে চলে গেছে।

মুশকিল হল তো!

তপু বলল।

ঘাটের কাছে বিরাট ঝাকড়া একটা বটগাছ। বড় বড় ঝুরি মাটিতে নেমেছে। নীচেটা অন্ধকার।

দুজনে এসে বটগাছতলায় দাঁড়াল।

তারপর একটু উঁকি দিয়েই তপু দীপুকে বলল।

ওই দেখ।

NOT FOR SALE

দীপু সেদিকে দেখেই ভ্রূ কোঁচকাল।

বটগাছের নীচে একজন বুড়ো মুচী। খুব বুড়ো। মুখের গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। চোখে চশমা। চশমার ডাঁটি নেই, সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে জড়ানো। একমনে একটা চটিতে পেরেক ঠুকছে।

দীপু বলল, এ ছাড়া তো আর ধারেকাছে লোক দেখছি না।

তপু বলল, চল, ওর সামনে গিয়েই দাঁড়ানো যাক।

দুজনে মুচীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুচী মুখ তুলল না। ওদের ছায়ার দিকে চোখ রেখে বলল।

চাউলকা ও তরফমে কেয়া দাম?

দীপু আর তপু দুজনেই সামান্য হিন্দী জানত। তাদের বাড়ির গয়লা হিন্দুস্থানী। তাছাড়া তাদের বাড়ির আশেপাশে কলকারখানা। সেখানে অনেক হিন্দুস্থানী শ্রমিক ছিল। তাদের কল্যাণে ওরা দুজনেই হিন্দী শিখেছিল।

দীপু বলল, এ তরফকা মাফিক একই হ্যায়।

এবার মুচী মুখ তুলে দুজনকে দেখল, তারপর জুতো সারাবার সরঞ্জাম বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দু এক মিনিট, তারপরই মুচী চলতে আরম্ভ করল।

দীপু আর তপু পিছন পিছন চলতে লাগল।

একটু পরেই মুচী এত দ্রুত চলতে লাগল যে, দীপু আর তপুর পক্ষে তাল রাখাই দুষ্কর হয়ে উঠল।

তপু বলল, চলা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না মুচীটা এত বুড়ো।

দীপু চাপাগলায় বলল, কিছু বলা যায় না। সবই হয়তো ছদ্মবেশ।

পাকা রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা পথ শুরু হল। দু পাশে জলা। ছোট ছোট কুঁড়ে। শুয়োর আর মুরগীর পাল চরছে।

এঁকে বেঁকে অনেকটা চলার পর মুচী থামল।

একটা প'ড়ো বাড়ি। ইঁটের ফাটলের পাশে পাশে বট অশথের চারা। পিছন দিকটা ধসে গিয়েছে। ইঁটের টুকরো সাজানা ছোট রাস্তা। পাঁচিল বোধ হয় একটা ছিল একসময়ে, এখন তার চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে কেবল ইঁটের চাঙড়।

একদম সিধা আন্দার চলা যাও। একদম আন্দার।

মুচী হাত প্রসারিত করে বাড়ির মধ্যেটা দেখিয়ে দিল।

দীপু আর তপু আশা করেছিল, মুচী আর দাঁড়াবে না। চলে যাবে।

NOT FOR SALE

হলও তাই। মুচী হনহন করে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকছে কি না এটা একবার ফিরেও দেখল না।

দীপু আর তপু আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল।

চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ঝাঁক পায়রা ঝটপট করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

ওরা একটু অপেক্ষা করে চৌকাঠ পার হল।

কেউ কোথাও নেই। ঘরদোরের ধুলোভরা অবস্থা দেখে মনে হয়, এ বাড়িতে অনেকদিন বোধ হয় কোন লোকের বাস ছিল না।

এমন এক জায়গায় আ লিম প্যাকেট দেবার জন্য কেন পাঠাল?

আরো ভিতরে ঢুকল।

একটা হলঘর। বড় একটা খাবার টেবিল। দু পাশে গোটা ছয়েক চেয়ার। টেবিল খালি। কোন খাবার জিনিস নেই।

হলঘর পেরিয়ে ওরা পাশের একটা ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘর। এপাশে একটা ক্যানভাসের খাট। কোণের দিকে একটা চেয়ার। তার সামনে টেবিল।

দরজার কাছে দাঁড়াতেই দেখতে পেল।

একটা লোক চেয়ারে পিছন ফিরে বসে আছে। একটু যেন ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের ওপর। বোধ হয় কিছু পড়ছে।

একেবারে তন্ময় হয়ে, কারণ দীপু আর তপুর পায়ের শব্দেও লোকটি ফিরল না।

দীপু বলল, কি করা যায়?

তপু বলল, চেঁচিয়ে ডাকব।

কি বলে ডাকবি?

তার চেয়ে এক কাজ করি।

কি কাজ?

দরজায় ঠকঠক করি, তাহলেই ফিরে দেখবে।

তাই ঠিক হল।

প্রথমে তপু, তারপর দীপু, শেষকালে একসঙ্গে দুজনে ঠকঠক করতে লাগল দরজায়।

লোকটার সাড় নেই।

তাইতো, লোকটা বসে বসে ঘুমাচ্ছে নাকি?

কিন্তু কি ঘুম রে বাবা, এত আওয়াজেও ঘুম ভাঙছে না!

NOT FOR SALE

আমাদের যে দেরি হয়ে যাবে। এতটা পথ হেঁটে ফিরতে হবে, তারপর নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। কি করা যায়?

চল, আমরা এগিয়ে টেবিলের ওপর প্যাকেটটা রেখে আসি।

দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

অদ্ভুত ঘর। একটা জানালা পর্যন্ত নেই। টেবিলের ওপর ল্যাম্প জ্বলছে। খুব জোর পাওয়ার। দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি, দুটো সরু মাদুর টাঙানো, মাদুরের ওপর প্রাকৃতিক দৃশ্য।

দুজনে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটার ঝুঁকে পড়ে বসাটা যেন অস্বাভাবিক।

পরনে সার্ট আর প্যান্ট। পা খালি। লোকটার মুখটা দেখা গেল না।

এবারে সাহস করে দীপু লোকটাকে একটা ঠেলা দিল। মৃদু ঠেলা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কাত হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

চেয়ারটা ছিটকে পড়ল এপাশে।

দীপু আর তপু চীৎকার করে একদিকে সরে গেল।

লোকটা মারা গেছে।

দীপু কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো বলল।

কিন্তু মরেও এভাবে চেয়ারে বসে ছিল কি করে?

বোধ হয় চেয়ারের হাতলে কোনরকমে আটকে গিয়েছিল, ধাক্কা দিতে পড়ে গিয়েছে।

বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনের মনে সাহস এল।

তপু টেবিল ল্যাম্পটা নামিয়ে মেঝের ওপর নিয়ে এল।

লোকটা বোধহয় এদেশী। দুটো চোখ বিস্ফারিত। যেন কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। অথচ কোথাও গুলির কিংবা ছোরার দাগ দেখতে পেল না।

তাহলে কি করে মরল লোকটা?

বিষে মৃত্যু হলে, দীপু আর তপু শুনেছিল যে, মৃতদেহ নীল হয়ে যায়। সে রকম তো কিছু হয় নি।

আর নয়, চল আমরা পালাই এখান থেকে।

তপু বাতিটা মেঝের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল।

চল।

দুজনে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে এগোতে লাগল।

দুটো পা ঠকঠক করে কাঁপছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া তাদের এই প্রথম।

NOT FOR SALE

কোনরকমে মুক্ত আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে যেন বাঁচে।

যেতে যেতে তপু হোঁচট খেল। দেয়ালে টাঙানো মাদুরটা চেপে ধরে কোনরকমে টাল সামলাল।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য কাণ্ড।

সমস্ত দেয়ালগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক যেন ভূমিকম্প।

কাছে দড়াম করে একটা শব্দ হল।

কিসের শব্দ তখন ওরা বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারল চৌকাঠের কাছে গিয়ে।

বাইরে যাবার ভারি কাঠের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ!

দীপু আর তপু প্রাণপণ শক্তিতে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। চীৎকার করল।

দরজা এক ইঞ্চি ফাঁক হল না। বাইরে থেকে কেউ এল না সাহায্যের জন্য।

দুজনে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল।

অন্য কোন দিক দিয়ে বাইরে যাবার পথ আছে কিনা তার খোঁজে এদিক ওদিক দেখল। পাশে একটা খুব ছোট ঘর রয়েছে। আপাতত ঘুটঘুটে অন্ধকার।

দীপু টেবিল ল্যাম্পটা টেনে এদিকের ঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। ছোট তার। বেশীদূর আনা গেল না।

অল্প আলোতে যেটুকু দেখা গেল তাতেই দীপু আর তপুর আতঙ্কে দুটো চোখ কপালে উঠল।

কাঁচের ছোট বড় জার। তার মধ্যে নানারকমের সাপ। কেউ চুপচাপ নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে, কেউ ফণা প্রসারিত করে কাঁচের ওপর ছোবল দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নীল বিষ গড়িয়ে পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখে দীপু এত ভয় পেয়ে গেল যে তার হাত কেঁপে টেবিল ল্যাম্পটা আছড়ে পড়ল। মাটিতে পড়বার আগে সেটা কাছের একটা কাঁচের জারের ওপর পড়ল।

ছোট্ট জার, তার ভিতরের সাপটাও ছোট। হলদে রং, তার ওপর কালো কালো ফোঁটা।

কিন্তু জার থেকে বাইরে এসে সেই ছোট্ট সাপটা ল্যাজে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুটো চোখ যেন জ্বলছে। লকলক করছে চেরা জিভ। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ।

NOT FOR SALE

প্রথমেই সাপটা টেবিল ল্যাম্পটার ওপর ছোবল দিল। ল্যাম্পটা মাটিতে পড়ে ছিল, ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে আরো গড়িয়ে গেল। তারটা সরে যাওয়াতে নিভে গেল।

ঘন অন্ধকার। কোথাও একটু আলো নেই। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিষাক্ত, ক্রুদ্ধ সেই সাপ গর্জন করে বেড়াচ্ছে। অন্য জারের কাঁচে তার ল্যাজের আছড়ানি শোনা যাচ্ছে। সামনে যা পাচ্ছে, তাতেই বোধ হয় ছোবল দিচ্ছে।

সেই ঘরে দীপু আর তপু পাগলের মতন একদিক থেকে আর এক দিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোনরকমে যদি কোন জারের ওপর গিয়ে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না। বিষাক্ত দংশনে দুজনেই শেষ হয়ে যাবে।

আর চুপচাপ একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেই মৃত্যু এড়াতে পারবে, এমন সম্ভাবনাও কম। সাপটা নিষ্ফল আক্রোশে সারাটা ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে।

কোনরকমে পাশের ঘরে চলে যাবে তাও সম্ভব নয়। দরজার গোড়াতেই জারের ভাঙা কাঁচ আর টেবিল ল্যাম্প পড়ে রয়েছে। ছুটতে গিয়ে পায়ে কাঁচ ফুটলে, কিংবা তার জড়িয়ে গেলেও বিপদ কম নয়।

দীপু আর তপু ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ ছপাৎ করে একটা শব্দ।

দীপুর পাশের দেয়ালে সাপটা আছড়ে পড়ল।

মাগো! বলে দীপু লাফিয়ে উঠল।

লাফিয়ে উঠতেই দেয়ালে একটা হাতলে হাত ঠেকে গেল।

সেটা আঁকড়ে ধরে সে ঝুলতে লাগল।

পায়ের তলায় সাপটা গর্জন করে চলেছে।

তপু বেগতিক দেখে দীপুর কোমর জড়িয়ে দুটো পা গুটিয়ে নিল।

কিন্তু এভাবে ছোট একটা হাতল ধরে দীপু কতক্ষণ ঝুলে থাকবে তার ওপর তপুর ভারও তার ওপর।

সাপটাও বোধ হয় ওদের সন্ধান পেয়েছে।

লাফিয়ে উঠে বার বার দেয়ালে ছোবল দিচ্ছে। প্রায় তপুর পায়ের কাছ বরাবর।

হাতদুটো পিছলে যাচ্ছে, তাই দীপু প্রাণপণ শক্তিতে হাতলটা আঁকড়ে ধরল।

NOT FOR SALE

হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ, তারপরই ঘড়ঘড় করে একটানা আওয়াজ। মনে হল দেয়ালটা আস্তে আস্তে যেন সরে যাচ্ছে।

কি হচ্ছে বোঝবার আগেই দীপু আর তপু গড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালের ওপাশে। আবার শব্দ করে দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তপু প্রথমে উঠে বসল।

জায়গাটা খুব অন্ধকার নয়। কোথা থেকে ম্লান নীলচে আলো আসছে।

তপু আস্তে আস্তে ডাকল।

দীপু, দীপু।

একটু দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল।

উঁ।

শব্দ অনুসরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে তপু এগিয়ে গেল। এত নীচু ছাদ, উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

দুটো বস্তার মাঝখানে দীপু পড়ে রয়েছে।

তপু কাছে গিয়ে হাত ঠেকাতেই দীপু উঠে বসল।

বেশী লেগেছে?

দীপু মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল।

না, আচমকা ছিটকে পড়ে কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসল।

তপু বলল।

আমাদের সঙ্গে সাপটা তো এদিকে ঢুকে পড়ে নি?

দীপু একবার এদিক ওদিক চেয়ে বলল।

বোধ হয় না। দেয়াল ফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাদুটো ছুঁড়তেই মনে হল সাপটা পায়ের ধাক্কায় যেন ছিটকে গেল। খুব ঠাণ্ডা বরফের মতন একটা স্পর্শ।

কিন্তু এ জায়গাটা কি?

কিছু বুঝতে পারছি না। একবার ঘুরে দেখা যাক।

সিঁড়ির মতন দুটো ধাপ। তারপর প্রশস্ত একটা হল।

একটা টেবিল, চারটে চেয়ার। পাশে একটা আলমারি।

দীপু আলমারি খুলে ফেলল।

পাঁউরুটি, বিস্কুট, টিনভরতি মাছ, সিরাপ, আরও নানারকমের জিনিস সাজানো।

NOT FOR SALE

দীপু আর থাকতে পারল না।

বলল, জায়গাটা পরে দেখব, আগে আয় খেয়ে নিই। খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুজনে পেট পুরে খেয়ে নিল।

শরীর কিছুটা ঠিক হল। পেটের মধ্যে মাঝে মাঝে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেটা কমল। দীপু আর তপু দুজনেরই।

চল, এদিক ওদিক দেখি এইবার।

আমার মনে হয়, এটা বোধ হয় ওদের লুকোবার জায়গা।

কাদের?

যারা এই সব গাঁজা আফিং কোকেনের ব্যবসা করে। সেইজন্য সারা বাড়িতে এত সব কলকবজা বসানো। পুলিস হানা দিলে এইখানে কিছুদিন লুকিয়ে থাকে।

লোকটাকে মারলে কে?

দীপু বলল, কি জানি! দলের কেউ হয়তো। এসব ব্যবসায় ভাগ নিয়ে রেষারেষি হয়। বইতে পড়িস নি?

তপু ঘাড় নাড়তে গিয়েই থেমে গেল। লাফিয়ে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে বলল, সাপ, সাপ।

ঠিক পাশেই সোঁ সোঁ করে শব্দ। একটানা।

দীপুও তপুর মতন টেবিলের ওপর উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল।

ছাদ ফুঁড়ে একটা টিনের নল ওপরে উঠেছে। বাইরে থেকে বাতাস সেই নলের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, তারই সোঁ সোঁ আওয়াজ।

ব্যাপারটা বুঝলি তপু, সাপ নয়।

তবে?

বিজ্ঞানের বইতে পড়িস নি, অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না? মাটির তলার এই সব কামরায় ওই নল দিয়ে বাতাস আসছে।

কিন্তু কোনরকমে যদি ওই বাতাস বন্ধ হয়ে যায়?

তাহলেই আমরা খতম।

তপু টেবিল থেকে নেমে পড়ল। এখানে ছাদ খুব নীচু নয়, তারা কোনরকমে দাঁড়াতে পারে।

বলল, চল, এদিক ওদিক ঘুরে দেখি, বের হবার কোন রাস্তা আছে নাকি।

NOT FOR SALE

দুজনে হাঁটতে লাগল। বেশী হাঁটতেও হল না। সামনেই বাধা। পাথরের শক্ত দেয়াল। অর্থাৎ, পথ বন্ধ।

দীপু বলল, তার মানে?

তপু পাথরের দেয়ালের নানা জায়গায় ঘুষি মেরে দেখল। সবটাই নিরেট, কোথাও ফাঁপা নয়।

মেঝের ওপর বসে পড়ে তপু বলল।

তাহলে বুঝতে হবে বের হবার অন্য কোন পথ নেই। যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম, সেখান দিয়েই বের হতে হয়।

কিন্তু তা কি করে হবে, সে দরজা তো বন্ধ।

বন্ধ হোক, এদিক থেকেও খোলবার কোন কলকব্জা নিশ্চয় আছে। বোধ হয় বিপদের আশঙ্কা দেখলে হাতল টেনে এই সুড়ঙ্গঘরে সবাই চলে আসত, কিছুদিন কাটিয়ে আবার কোনরকমে এদিক থেকে দেয়াল সরিয়ে ওদিকে চলে যেত। চল, ওই দেয়ালের কাছে গিয়ে একবার দেখি।

দুজনে যেখান দিয়ে ছিটকে পড়েছিল, আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে পাথর নয়, পালিশকরা কাঠের দেয়াল।

দীপু আর তপু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন হাতল বা বোতাম দেখতে পেল না।

ক্লান্ত হয়ে দুজনে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

দীপু বলল, আচ্ছা, খাবার ঘর তো রয়েছে, কিন্তু লোকগুলো শোয় কোথায়?

দুজনেই এদিক ওদিক দেখল।

প্রথমে আলো থেকে এসে আধ-অন্ধকারে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। এখন এখানে কিছুকাল কাটাবার পর চারদিক বেশ পরিষ্কার।

দীপুই এদিক ওদিক দেখে বলল।

আমার মনে হচ্ছে এই নরম বস্তাগুলোর ওপরই বোধ হয় শুত। ভিতরে কি আছে কে জানে, বেশ নরম বলে মনে হচ্ছে।

দীপু আর তপু উঠে দাঁড়িয়ে বস্তাগুলো দেখল। কোণের দিকে গোটা তিনেক ছোট ছোট বস্তা। বোঝা গেল, এগুলো মাথার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর বড় বস্তাগুলো শোবার গদি।

এত নরম, ভিতরে কি আছে?

দীপু টিপে টিপে দেখল।

NOT FOR SALE

দাঁড়া, দেখছি আমি।

তপু খাবার ঘরে চলে গেল। আলমারির মধ্যে সে ছুরি কাঁটা চামচ দেখেছিল। একটা কাঁটা হাতে করে ফিরে এল।

কাঁটাটা সজোরে বস্তার এক কোণে বসিয়ে দিতেই কালো গুঁড়ো হাতের ওপর ঝরে পড়ল।

সেগুলো নিয়ে আলোর নীচে গিয়ে দুজনে দাঁড়াল।

দেখেই বুঝতে পারল এগুলো কাঠের মিহি গুঁড়ো।

এইজন্যই এগুলোর ওপর ছিটকে পড়তে দুজনের বিশেষ লাগে নি।

এবার তপু বলল, এবার আমাদের কি কর্তব্য?

কি আর কর্তব্য। শুয়ে পড়া উচিত। নিশ্চয় অনেক রাত হয়েছে। অবশ্য এখানে ঘড়ি যখন নেই আমাদের কাছে, তখন রাত দিন সবই সমান। তবে বিকালে আমরা প্যাকেট হাতে লোকটার ঘরে ঢুকেছিলাম, তারপর অনেক সময় কেটেছে। এখন যে রাত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

দুজনে দুটো বস্তার ওপর শুয়ে পড়ল। ছোট বস্তা মাথায় দিয়ে।

ভেবেছিল, শুলেই ঘুম আসবে, কিন্তু এল না। নানারকম চিন্তা মাথায় এল।

এমনও তো হতে পারে আর কোনদিনই দরজা খুলল না। ক্রমে ক্রমে খাবার সব শেষ হয়ে গেল, কিংবা বাইরের বাতাস কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে দীপু আর তপুর নিশ্চল দেহ বিদেশের এই অন্ধকূপে পড়ে থাকবে। কেউ কোনদিন খোঁজ পাবে না।

যদি দরজা খুলে যায়, তাহলে যারা খুলবে তারা দীপু আর তপুকে ছাড়বে না। কি করে এখানে এল তার কৈফিয়ত তলব করবে।

যদি প্রয়োজন বোধ করে, কিংবা সন্দেহ করে, তাহলে এদের মতন দুটো ছোট ছেলেকে শেষ করে দেওয়া একটা সমস্যাই নয়।

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই তপু বিছানার ওপর উঠে বসল।

দীপু, দীপু, ঘুমালি?

দীপু ঘুমায় নি। একটা হাত চোখের ওপর রেখে আকাশ পাতাল ভাবছিল।

সে উত্তর দিল।

কি রে তপু?

সেই প্যাকেটটা আমরা কোথায় ফেলে এসেছি?

NOT FOR SALE

ওই লোকটার টেবিলের ওপর।

ওই প্যাকেটে কোনরকম চিহ্ন নেই তো?

কি জানি লক্ষ্য করি নি। কেন?

ভাবছি যদি কোনরকম সংকেতচিহ্ন থাকে, আর মৃত্যুর কিনারা করতে এসে পুলিসের হাতে ওই প্যাকেট পড়ে, তাহলেই সর্বনাশ।

কেন, সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়? পুলিশ হয়তো সেই সংকেতচিহ্ন অনুসরণ করে আ লিমকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

করুক, আমাদের কি।

ওদের দলে তো অনেক লোক থাকে। তাদের রাগটা থাকবে আমাদের ওপর। যদি এখান থেকে কোনরকমে উদ্ধারও পাই, তাহলেও আর নিরাপদে দেশে পৌঁছতে পারব না। দলের লোক আমাদের শেষ করে দেবে।

তপু চুপ করে শুনল। কিছু বলল না। বলার মতন তার কিছু ছিলও না।

অনেক রাতে, কত রাতে জানবার উপায় নেই, ওদের মনে হল কাঠের দেয়ালের ওপাশে যেন কতকগুলো মানুষের চলার শব্দ পাওয়া গেল। কারা যেন জোরে জোরে হাঁটছে।

দীপু আর তপু দুজনেই উঠে বসল।

কিছু বলা যায় না, এখনই হয়তো কাঠের পার্টিশন ফাঁক হয়ে যাবে। সেই ফাঁক দিয়ে পিস্তল হাতে লোকেরা এপাশে ঢুকে পড়বে।

ঠিক যেমন রসহ্যকাহিনীতে ওরা পড়েছে।

তারপর! তারপর কি হবে ওরা ভাবতে পারল না। ভাবতে সাহসই হল না।

দেশের বাড়ির কথাটা মনের সামনে ভেসে উঠল। সেখানকার আত্মীয়স্বজনের কথা।

কিন্তু না, কিছুক্ষণ পরে সব নিঃঝুম। আওয়াজ থেমে গেল।

দীপু আর তপু ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীপু যখন জাগল, তখন তপু ঘুমাচ্ছে।

তপুকে আর ডাকল না। দীপু উঠে খাবার ঘরে গেল।

জলের বোতল থেকে জল ঢেলে চোখ মুখ ধুয়ে ফেলল।

ফিরে এসে দেখল তপুও উঠেছে।

দুজনে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার সারা এলাকাটা পর্যবেক্ষণ শুরু করল। একেবারে কোণে একটা স্নানের ঘরও আছে। বস্তা আড়াল ছিল বলে দেখতে পায় নি।

NOT FOR SALE

একভাবে দুটো দিন দুটো রাত কাটল।

অবশ্য দীপু আর তপুর হিসাবে। বাইরে দিন না রাত বোঝবার উপায় নেই।

তিনদিনের দিন বিপদে পড়ল! আলমারি খালি। খাবার সব শেষ। শুধু জলের বোতল রয়েছে।

দীপু কপাল চাপড়াল।

সর্বনাশ, কি হবে?

তপু কিছু বলল না।

দুজনেই বুঝতে পারছিল খাবার ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু দুজনেরই মনের গোপনে আশা ছিল, কিছু একটা হবে। ওরা হয়তো এই পাতাল থেকে মুক্তি পাবে।

কি হবে এইবার!

থালায় পাঁউরুটির গুঁড়ো পড়ে ছিল, দুজনে সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেল। সিরাপের বোতলে জল দিয়ে তাই পান করল।

বিকালে দুজন আলমারির প্রত্যেকটি তাক ভাল করে খুঁজল।

সব পরিষ্কার। কোথাও একটি দানাও নেই।

একটু তাড়াতাড়ি দুজনে শুয়ে পড়ল।

ভোরে উঠে আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।

বস্তায় হেলান দিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে রইল।

এতদিন যে আশাটুকু নির্ভর করে বাঁচছিল, সেটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচে এই অন্ধকূপে যে তাদের মৃত্যু এ বিষয়ে আর তাদের কোন সন্দেহ নেই।

একসময়ে দুজনে উঠল।

জলের বোতলও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অবশ্য স্নানের ঘরের চৌবাচ্চায় তখনও জল রয়েছে। দরকার হলে সেই জলই পান করবে।

দুজনে একচুমুকে বোতলের জল শেষ করে ফেলল।

টিন আর বোতলগুলো আছড়ে ফেলল মাটিতে। একেবারে তলায় কিছু সিরাপ, কিছু জেলি লেগে ছিল, আঙুল দিয়ে দীপু আর তপু যার নাগাল পাচ্ছিল না, কাঁচের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তাই চাটতে লাগল।

খেতে খেতে একটু পরে নোনতা স্বাদ লাগতেই দুজনে চমকে উঠল।

হাত দিয়ে দেখল, ঠোঁট কেটে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছে।

জল দিয়ে দুজনে ঠোঁট ধুয়ে ফেলল।

NOT FOR SALE

তারপর আবার ফিরে গিয়ে বসল বিছানায়।

কথা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। শরীর ভীষণ দুর্বল।

অনেকক্ষণ পরে তপু বলল।

দীপু, কে আগে শেষ হবে কিছু ঠিক নেই। যদি আমি আগে যাই, আর কোনরকমে তুই মুক্তি পাস, তাহলে দেখিস আমার দেহটা যেন শেয়াল কুকুরে না খায়; একটা সদগতি হয়।

কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তপু আর কথা বলতে পারল না।

দীপুর চোখেও জল। দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

সারারাত দুজনে এপাশ ওপাশ করল। চোখে একফোঁটা ঘুম এল না।

পরের দিন দীপু উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তপু পারল না।

সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল।

দীপু বলল, কি মনে হচ্ছে জানিস তপু।

তপু কোন উত্তর দিল না। শুধু দুটো ভ্রূ তুলল।

যদি সুড়ঙ্গের মধ্যে না থেকে, ওপরে কোন জঙ্গলের ধারে এই অবস্থা হত, তাহলে গাছের একটা পাতাও আস্ত থাকত না। সব খেয়ে শেষ করতাম।

আবার দীপু খোঁজা শুরু করল।

শুধু আলমারির ভিতরটা নয়, সারা মেঝে।

যদি অন্য দিনের খাবারের একটু অংশও মেঝের ওপর পড়ে থাকে।

কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই।

নিজের জন্য দীপু অতটা ভাবছে না। ভাবছে তপুর জন্য। বয়সের অল্প ব্যবধান, ভাই হলেও দুজনে বন্ধুর মতন। ছেলেবেলা থেকে একভাবে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে।

যদি দুজনে একসঙ্গে শেষ হয়ে যায়, তাহলে ক্ষোভের কিছু নেই। একজনের চরম দুর্দশা আর একজনকে চোখে দেখতে হবে না।

কিন্তু তা কি হবে!

ঈশ্বর কি এত করুণাময় হবেন!

অন্ততঃ দীপু আর তপুর প্রতি ঈশ্বরের করুণা যে কম, সে পরিচয় তারা পেয়েছে এর আগে। কোনদিনই তিনি এদের প্রতি সদয় নন।

সদয় হলে তাদের এমন অবস্থা হবে কেন?

আচ্ছন্নের মতন দুজনে শুয়ে রইল।

মাঝরাতে হঠাৎ দুম দুম শব্দে দীপুর ঘুম ভেঙে গেল।

NOT FOR SALE

বিছানার ওপর উঠে বসেই সে চমকে উঠল।

তপু উঠে পাগলের মতন কাঠের দেওয়ালে ঘুষি মারছে।

তার চুল উস্কখুস্ক, দুটো চোখ লাল।

জড়ানো গলায় কেবল বলছে।

খোল, খোল, খোল।

দীপু বুঝতে পারল তপু প্রকৃতিস্থ নয়। অনাহারে তার মাথার গোলমাল হয়েছে।

দীপু লাফিয়ে গিয়ে তপুকে জড়িয়ে ধরল।

এই তপু, তপু, কি করছিস!

তপু কোন উত্তর দিল না। দীপুর দিকে ফিরেও দেখল না।

দেয়ালে অনবরত ঘুষি মারতে লাগল।

এত জোরে তপু ঘুষি মারছে, একটু পরেই তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

দীপু তপুকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল দেয়ালের কাছ থেকে।

পারল না। তপুর গায়ে যেন অসীম শক্তি।

দীপু প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে সরিয়ে আনার জন্য টানল।

দুজনেই জড়াজড়ি করে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

পাছে গড়িয়ে আরো নীচে পড়ে যায়, সেই ভয়ে দীপু জোরে সিঁড়ির একটা ইঁট আঁকড়ে ধরল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে ইঁটটা খসে পড়ল।

ফাঁকের মধ্যে চকচকে একটা হাতল।

কিছু না ভেবেই দীপু হাতলটা ধরে টানল।

ঘড়ঘড় শব্দে কাঠের দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল।

দু তিন মিনিট তপু আর দীপু কোন কথা বলতে পারল না। নির্বাক্ বিস্ময়ে সেই ফাঁকের দিকে চেয়ে রইল।

তপু ছুটে এপারে আসছিল, দীপু বাধা দিল।

দাঁড়া তপু, এখন যাস নি। আমি আগে উঁকি দিয়ে চারদিক দেখে আসি।

তপু বস্তায় হেলান দিয়ে বসল।

দীপু সাবধানে পা ফেলে দেয়ালের কাছে এল।

মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল।

আশ্চর্য কাণ্ড, সমস্ত জার অদৃশ্য। সাপের চিহ্নমাত্রও নেই।

NOT FOR SALE

তার মানে, দীপু আর তপু যখন সুড়ঙ্গপুরীতে ছিল, তখন নিশ্চয় কেউ এসেছিল এখানে।

দীপু পাশের ঘরে গেল।

আরো তাজ্জব ব্যাপার।

মৃতদেহ নেই। সব পরিষ্কার।

দীপু আবার ফিরে গিয়ে ফাঁকের কাছে দাঁড়াল।

ভিতর দিকে চেয়ে ডাকল।

এই তপু, বাইরে চলে আয়।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তপুর চলার শক্তি ছিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু মুক্তির আনন্দে তপু সব যন্ত্রণা ভুলল।

লাফিয়ে এপারে চলে এল।

চলে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হল?

দীপু জিজ্ঞাসা করল।

আচ্ছা ফাঁকটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? আমরা যখন ভিতরে ঢুকেছিলাম, তখন তো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তপুর এই প্রশ্নের উত্তরে দীপু ভ্রূ কোঁচকাল।

যাকগে, যা ইচ্ছা হোক। চল, আমরা এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা করি।

তপু বলল, এখন নয়। আর একটু অন্ধকার হোক। কিছু বলা যায় না, কেউ হয়তো এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

দীপু আর তপু এদিকের ঘরে এসে দাঁড়াল।

যেখানে মৃতদেহ পড়ে ছিল, সেখানে ঝুঁকে পড়ে দেখল। মেঝেটা যেন চকচক করছে। তেল পড়লে যেমন হয়।

এদিকে একটা ছোট ঘর।

সেখানে ঢুকেই দুজনে লাফিয়ে উঠল।

র‍্যাকের ওপর সারি সারি ডিম। খোঁজ করলে আরো কিছু হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

দেয়াল-আলমারিটা খুলে দুজনে দেখল। কোথাও কিছু নেই।

র‍্যাকে দেশলাই পাওয়া গেল।

এ ঘর থেকে দীপু পুরোনো কাগজ যোগাড় করল। খালি টিন।

এক একজন গোটা চারেক করে ডিমসেদ্ধ খেয়ে একটু ধাতস্থ হল।

NOT FOR SALE

তারপর একেবারে কোণের ঘরে এসে দুজনে বসল।

তবু বলল, একদিন আমরা যে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম, সেইদিনই বোধ হয় কেউ এসে সাপসুদ্ধ জার আর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে।

কারা সরাবে? পুলিসের লোক?

পুলিসের লোক নাও হতে পারে। হয়তো যে লোকটা মারা গেছে, তাদের বিপক্ষ দলের কেউ। যাতে কেউ লাশ পরীক্ষা না করতে পারে, সেইজন্য।

তপু গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে দেখে দীপু জিজ্ঞাসা করল—

কি রে, কি ভাবছিস?

আমি ভাবছি ফাটলটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? কলকব্জা কি গোলমাল হয়ে গেল!

থাক খোলা, আমাদের কি!

উহুঁ, তপু মাথা নাড়ল, পরীক্ষা করে একবার দেখতে হচ্ছে।

সেকি রে, তুই আবার ওর মধ্যে ঢুকবি নাকি?

আবার! মাথা খারাপ।

তপু উঠে এদিক ওদিক ঘুরে একটা মোটা কাঠের টুকরো নিয়ে এল।

সেটা দিয়ে সজোরে সিঁড়ির ধাপের ওপর আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় করে শব্দ। দেয়ালের ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেল।

তপু ঠিক সময়ে সরে এসেছিল।

সে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ঠিক তাই ভেবেছি।

কি ভেবেছিস?

এদিক থেকে ছিটকে যখন আমরা ওদিকে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন সিঁড়ির ওই ধাপের ওপর পড়ার জন্য দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধাপের ওপর ভার পড়লে ফাঁকটা বন্ধ হয়ে যায়, এইরকম কিছু কলকব্জার ব্যাপার আছে।

ইতিমধ্যে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

দীপু বলল, চল, এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি।

তপু উঠে পড়ল।

দাঁড়া, বাকি ডিমক'টা সঙ্গে নিই। কখন কি অবস্থায় থাকি কিছু বলা যায় না। সঙ্গে রসদ থাকা দরকার।

একটা কাগজের মধ্যে ডিমগুলো নিয়ে তপু দীপুর পাশে এসে দাঁড়াল।

কিছু বলা যায় না, আবার নতুন কোন্ বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে দুজনে। এ দেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা বিপদ্ চলেছে। প্রাণে যে বেঁচে আছে, এই যথেষ্ট।

NOT FOR SALE

এগোতে গিয়েই দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দরজা বন্ধ।

মনে পড়ে গেল, এ ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দীপু বলল।

এখন উপায়! কি করে বাইরে যাব!

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তপু বলল।

নিশ্চয় কোথাও কোন কলকব্জা আছে। সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

কি করে করবি?

মনে করে দেখ, প্রথমে এ ঘরে ঢুকে কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

একটু পরেই তপুর নিজেরই মনে পড়ে গেল।

আমি হোঁচট খেয়েছিলাম, টাল সামলাতে দেয়ালের এই মাদুরটা আঁকড়ে ধরি, এই না?

দীপু ঘাড় নাড়ল।

তপু দেয়ালের মাদুরটা সরাল। ছোট একটা হাতল নীচের দিকে নামানো।

সে হাতলটা ওপর দিকে ঠেলে দিতেই কাজ হল।

কাঁপতে কাঁপতে দরজাটা খুলে গেল।

দুজনে আর এক তিল বিলম্ব না করে ছুটে বেরিয়ে এল।

মাঠের মধ্যে এসে এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল।

ধারে কাছে কাউকে দেখা গেল না।

তপু বলল, এরপর কোথায় যাব?

দীপু বলল, আমাদের নদীর ওপারে যেতে হবে। শহরে। তারপর ভাগ্যে যা আছে, হবে।

চল।

মেঠো পথ ধরে দুজনে এগোল।

কয়েক পা গিয়েই তপু দাঁড়াল। দীপুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ওই যে ঝোপ দেখছিস?

দীপু ঘাড় নাড়ল।

সুড়ঙ্গপুরীর বাতাস বেরোবার নলটা ওর মধ্যে আছে, তাই চট্ করে কারো নজরে পড়ে না।

NOT FOR SALE

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল।
নদীর ধারে যখন এসে পৌঁছল, বেশ রাত হয়েছে।
কাছাকাছি একটাও সাম্পান নেই।
ঘাটের ওপর তপু আর দীপু বসল।
চোখ রইল জলের দিকে। যদি কোন সাম্পান চোখে পড়ে, ডাকবে।
আধঘণ্টার ওপর কিছু দেখতে পেল না।
একটা মোটর লঞ্চ তীরবেগে জল কেটে বেরিয়ে গেল।
তারপর ঢেউয়ের দোলার ওপর একটা সাম্পান দেখা গেল।
সাম্পানটা এদিকেই আসছে।
দুজনেই মাথার ওপর হাত তুলে চেঁচাতে লাগল।
মাঝি দেখতে পেয়েছিল। সাম্পানটা ঘাট বরাবর এনে রাখল।
এখানে সব মাঝিই ভারতীয়। চট্টগ্রামের অধিবাসী, কাজেই কথা বলতে কোন অসুবিধা হল না।
মাঝিকে দীপু বলল, আমরা ওপারে যাব।
সঙ্গে বড় কেউ নেই?
তপু ঘাড় নাড়ল, না।
ঠিক আছে, চলে এস।
সাম্পান যখন নদীর মাঝামাঝি, তখন দীপু জিজ্ঞাসা করল।
ওপারের নাম কি?
বৈঠা চালাতে চালাতে মাঝি বলল, ডালা।
তারপরই কি খেয়াল হতে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।
তোমরা এদেশে নতুন বুঝি?
দীপু মাথা দোলাল, অর্থাৎ হাঁ।
মাঝি আবার প্রশ্ন করল।
এখানে থাক কোথায়?
দীপু একটু ঢোক গিলে বলল।
জেটির কাছে এক হোটেলে আছি।
কোন্ জেটি?
দীপু আর তপু উত্তর দেবার আগে মাঝি নিজেই বলল।
ব্রুকিং স্ট্রীট জেটির কাছে তো? বুঝেছি, রয়েল হোটেল।
দীপু আর তপু কথা বাড়াল না। বুঝতে পারল কথা বাড়ালে বিপদে পড়বে।

NOT FOR SALE

সাম্পান এপারে ঘাটে এসে লাগল।

কাদায় একটা বাঁশ পুঁতে সাম্পান বেঁধে মাঝি বলল।

দাও, ভাড়াটা মিটিয়ে দাও। অনেক রাত হয়েছে।

তপু আর দীপু নিজেদের পকেট থেকে পয়সা বের করল। আট আনা আর চার আনা। সবসুদ্ধ বারো আনা। এই পয়সা নিয়েই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

বারো আনা পয়সা মাঝির হাতে দিতেই সে রেগে উঠল।

তার মানে? এত রাতে পার করালাম, তাও দুজনকে। ভাড়া মাত্র বারো আনা!

আমাদের কাছে আর একটি পয়সাও নেই, বিশ্বাস কর।

দরদস্তুর না করে সাম্পানে ওঠ কেন? আমি দু টাকা ভাড়া চাই।

দীপু মাঝির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি বরং আমাদের পকেটে হাত দিয়ে দেখ। যদি কিছু পাও, নিয়ে নিও।

মাঝি দুজনের দিকে ভাল করে দেখল, তারপর বলল।

ওই কাগজের ঠোঙায় কি?

তপু ভয়ে ভয়ে বলল, ডিম।

ক'টা?

গোটা আষ্টেক আছে।

দাও ওগুলো আমাকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি খপ্ করে তপুর হাত থেকে কাগজের ঠোঙাটা কেড়ে নিল।

বাঁশ থেকে দড়ি খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল।

যাও, যাও, নেমে পড়। আমি সাম্পান ছাড়ব।

অগত্যা দুজনে লাফিয়ে কাদার ওপর নেমে পড়ল।

কাদা ভেঙে রাস্তার ওপর এসে উঠল।

রাস্তা ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই।

দীপু রাস্তার একপাশে বসে পড়ে বলল—

এখন উপায়?

উপায় আর কি। শহরের দিকে হাঁটা যাক। কোনরকমে যদি সেই জেটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি, আর দেখি কোন জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে ক্যাপ্টেনের হাতে পায়ে ধরে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করব।

NOT FOR SALE

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

শহর তো অনেকটা পথ।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল।

মাঝে মাঝে দু একটা কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। গোটাকয়েক কুকুর তাদের তেড়েও এল। ঢিল ছুঁড়ে দুজনে তাদের তাড়াল।

পথে বারদুয়েক বিশ্রাম করে নিল।

কিছুক্ষণ পরে দীপুর খেয়াল হল।

দেখ তপু, পিছনে একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

তপু চেয়ে দেখল।

আলোটা স্থির নয়, চলমান।

দুজনে একপাশে সরে এসে দাঁড়াল। যাতে আলোটা এগিয়ে তাদের পাশ কাটাতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, আলোটা এগোল না। সমান দূরত্ব রেখে একভাবে জ্বলতে লাগল।

কেউ আমাদের অনুসরণ করছে না তো?

তার আর আশ্চর্য কি।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুজনে আবার চলতে আরম্ভ করল।

একজায়গায় অনেকগুলো গাছের জটলা। ডাল বেয়ে কিছু লতাগাছ উঠে জায়গাটা ঝুপসি অন্ধকার করে রেখেছে।

কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই দীপু আর তপুর কানে একটা গোঙানির শব্দ এল।

কোথায় যেন কে কাঁদছে?

দীপু বলল। রাত্রে শকুনের বাচ্চা ঠিক ওইরকমভাবে কাঁদে। তাড়াতাড়ি চল।

তাড়াতাড়ি যেতে গিয়েও কিন্তু পারল না।

দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

মানুষের গোঙানির শব্দ। যন্ত্রণায় কে যেন ছটফট করছে। খুব কাছে।

একবার দেখে এলে হয়।

তপু বলল।

আবার কোন বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ব।

দীপু সাবধান করে দিল।

উঁকি দিয়ে দেখি ব্যাপারটা কি।

NOT FOR SALE

একটা কচুঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখেই দুজনে চমকে উঠল।

আকাশে ম্লান জ্যোৎস্না। আবছা সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

একটা লোক ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। তার মাথার কাছে চাপ চাপ রক্ত।

সেও বোধ হয় দীপু আর তপুকে দেখতে পেয়েছিল।

অনেক কষ্টে একটা হাত তুলে দুজনকে ডাকল।

একটু ইতস্ততঃ করে দীপু আর তপু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

মুখের নীচেটা মাফলার দিয়ে ঢাকা। দুটো চোখে যন্ত্রণার ছায়া।

হাত বাড়িয়ে দীপুর একটা হাত ধরল, আর একটা হাত প্রসারিত করে দিল তপুর দিকে।

তপু তার একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

দুজনের সাহায্যে লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটু দূরে দেখিয়ে জড়ানো গলায় কি বলল।

যেদিকে লোকটা আঙুল নির্দেশ করল সেদিকে চোখদুটো কুঁচকে দুজনে দেখল। কতকগুলো গাছের ফাঁকে একটা সাদারঙের বাড়ি।

লোকটা ইঙ্গিত করে যা বলল, তাতে দীপু আর তপু এইটুকু বুঝতে পারল লোকটা ওই বাড়িতে যেতে চায়। আর সেজন্য তার দীপু আর তপুর সাহায্যের প্রয়োজন।

লোকটার যেমন অবস্থা, একলা হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব।

দীপু আর তপু লোকটার হাত নিজেদের কাঁধের ওপর রেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে রাস্তা ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে লাগল। জোরে চললে পাছে লোকটার ঝাঁকুনি লাগে সেজন্য যথাসম্ভব সতর্ক হল।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে তপু একবার পিছন ফিরে দেখল।

ঠিক ঝোপটার পাশে আলোটা স্থির হয়ে রয়েছে।

দীপুকে কথাটা বলতে গিয়েই তপু থেমে গেল।

লোকটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

তপুরই দোষ। সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে দেখতে গিয়ে লোকটার হাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল।

বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু দীপু হাত রাখতেই খুলে গেল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে ভিতরে ঢুকল না।

দরজা সম্বন্ধে দীপু আর তপুর ভয় ছিল।

তাই দুজনে দরজাটা ভালো করে পরীক্ষা করে তবে বাড়ির মধ্যে পা রাখল। হঠাৎ আবার দরজাটা না বন্ধ হয়ে যায়।

NOT FOR SALE

সে রকম কিছু হল না। একটা বড় সোফার ওপর লোকটাকে সাবধানে শুইয়ে দিয়ে দুজনে বেরোতে গিয়েই বাধা পেল।

লোকটা হাততালি দিল।

ওরা ফিরতে হাতের ভঙ্গীতে জল চাইল। জল যে পাশের ঘরে পাওয়া যাবে তাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল।

পাশে ছোট একটা ঘর। গ্লাস, প্লেট সাজানো। মাঝখানে টেবিল, চেয়ার। বোধ হয় খাবার ঘর।

তপু বলল, এ বাড়িটা বোধ হয় লোকটারই হবে, কিন্তু কে ওভাবে মাথায় চোট মারল?

দীপু গ্লাসে জল ভরতে ভরতে বলল, বোধ হয় ডাকাতরা আক্রমণ করে পয়সাকড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। দয়া করে প্রাণে মারে নি।

লোকটাকে জল দিয়ে যদি কিছু খেতে চাই, নিশ্চয় না বলবে না।

দেখা যাক।

দুজনে আবার এদিকের ঘরে এল। দীপুর হাতে জলের গ্লাস। পিছনে তপু।

এ ঘরে ঢুকেই দুজনে ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

দীপুর হাত থেকে ঝনঝন শব্দে গ্লাসটা মেঝের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে কাতরাচ্ছিল, সে যে এভাবে এর মধ্যে রিভলভার হাতে নিয়ে বসবে স্টো দীপু আর তপু ধারণাও করতে পারে নি।

কিন্তু আরো বিস্ময়ের কথা, এ লোকটার চেহারার সঙ্গে নদীর ওপারে প'ড়োবাড়িতে চেয়ারের ওপর মৃত লোকটার চেহারার কোন প্রভেদ নেই।

তাহলে সে লোকটা কি মৃতের ভান করেছিল?

তাই বা কি করে সম্ভব!

গায়ে হাত ঠেকতেই লোকটা যেভাবে মেঝের ওপর ছিটকে পড়েছিল, সেটা জীবিত লোকের পক্ষে কোনরকমেই সম্ভব নয়।

দীপু আর তপু এগোবার চেষ্টা করতে গিয়েই থেমে গেল।

লোকটা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল।

সাবধান, শয়তানের বাচ্চারা, আর এক পা এগোলেই খতম করে দেব। আমার রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো আছে। একটু শব্দ হবে না। শুধু সামান্য একটু ধোঁয়া, ব্যস, কাজ শেষ।

NOT FOR SALE

দুজনে দরজার গোড়ায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে আবার বলতে লাগল।

সত্যি কথা বল, আমার যমজ ভাইকে কে শেষ করেছে?

এবার দীপু আর তপু বুঝতে পারল। তাহলে যে লোকটা মারা গেছে, সে এর যমজ ভাই। তাই চেহারায় এমন মিল।

তপু কাঁপতে কাঁপতে বলল।

কে শেষ করেছে, আমরা কি করে জানব।

সে আর কথা শেষ করতে পারল না।

লোকটা মেঝের ওপর সজোরে বুট ঠুকল।

চোপরাও, মিথ্যাবাদী কেউটের ছানা! তোরা আ লিমের চর সেটা আমার জানতে বাকি নেই। ঠিক কিনা বল?

এবার দীপু মাথা নাড়ল।

না, আমরা কারুর চর নই। আমরা বিদেশে এসে বিপদে পড়েছি।

তাহলে প'ড়োবাড়ির মধ্যে কি করতে ঢুকেছিলি?

আমরা একটা প্যাকেট নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিসের প্যাকেট?

তা জানি না।

কে পাঠিয়েছিল?

দীপু আর তপু চুপ করে রইল।

লোকটা বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ করে থেকে বিশেষ লাভ হবে না। দুটো গুলিতে দুজনের খুলি ফাটিয়ে দেব। উত্তর দে।

তপু বলল।

আ লিম পাঠিয়েছিল।

এবার লোকটা প্রচণ্ডবেগে হেসে উঠল। পৈশাচিক হাসি। সে হাসিতে মনে হল বাড়ির জানলা দরজাগুলোও যেন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

তবু তোরা বলতে চাস, তোরা আ লিমের চর নস। আ লিম কেন প্যাকেট পাঠিয়েছিল জানিস?

একটু থেমে, উত্তরের অপেক্ষা না করে, লোকটাই বলতে আরম্ভ করল।

প্যাকেট পাঠানো একটা ছল। তোদের এই জন্য পাঠিয়েছিল যে তোরা ফিরে এসে বলবি যে লোকটা মরে গেছে, তাই কাউকে প্যাকেটটা দিয়ে

NOT FOR SALE

আসতে পারিস নি। লোকটা সত্যি মরেছে কিনা, সেই খবরটা শুধু আ লিম তোদের মারফত জানতে চেয়েছিল। তার নিজের যাবার সাহস ছিল না, পাছে পুলিসের হাতে পড়ে, কিংবা আমাদের হাতে পড়ে।

লোকটা জামার হাতায় মুখটা মুছে নিয়ে বলল।

ঠিক সময়ে খবর পেলে আ লিমের অবশ্য নিস্তারও ছিল না। আমি যে আবার একটু কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খবর পেলাম, ভাইকে শেষ করে দিয়েছে। এ খবরও পেলাম দুটো পুঁচকে ছোঁড়া ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু বের হতে কেউ দেখে নি। এ কদিন তোরা কোথায় ছিলি?

কোথায় ছিল বলতে গিয়েই দীপু থেমে গেল। তারা যে এদের পালাবার গুপ্ত সুড়ঙ্গ দেখেছে সে কথা জানতে পারলে লোকটা হয়তো আরও খেপে যাবে।

হাতে তো রিভলভার রয়েইছে, আঙুলের একটু কারসাজি, ব্যস, তাদের দুটো দেহ মেঝেয় লুটাবে।

তাই দীপু একটু ভেবে নিয়ে বলল।

কি করব—চারদিকে সাপ। আমরা ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বসে ছিলাম।

সাপ তো কাঁচের জারের মধ্যে।

বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ, তপু বলল, যেভাবে জারের ওপর ছোবল দিচ্ছিল।

হুঁ, লোকটাও যেন কি ভাবল, তারপর বলল।

আমি নদীর ওপারে কদিন পাহারা দিচ্ছি। প্রায় সারা দিন রাত। জানি, একদিন তোদের এপারে আসতেই হবে। আজ তোদের বাগে পেয়েছি।

দীপু বলল, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমাদের কোন দোষ নেই। এসব ব্যাপারের আমরা কিছু জানি না। আমরা জাহাজ থেকে নেমে আ লিমের কবলে পড়েছি।

আবার লোকটা হাসল।

ছাদফাটানো হাসি।

বলল, ওসব মায়াকান্নায় আমি ভুলি না। তোদের নিস্তার নেই। আ লিমের দলের কারো পরিত্রাণ নেই। নে, কে তোদের ইষ্টদেবতা তার নাম কর। দু মিনিট সময় দিচ্ছি।

এবার দীপু আর তপু দুজনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমাদের কথা বিশ্বাস কর। আমরা তোমাকে একটুও মিথ্যা বলি নি।

NOT FOR SALE

চোপ। একটা কথাও নয়।

চমকে উঠে দীপু আর তপু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

ইষ্টদেবতার নাম তপু আর দীপুর জানা নেই।

দীপুর চোখের সামনে তার বাবা আর মার চেহারা ভেসে উঠল। তপুর মনে এল তার অসহায় মায়ের ছবি।

আর জীবনে কোনদিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তারা জানতেও পারবে না, কিভাবে বিদেশে বেঘোরে দুটি কিশোর প্রাণ হারাল।

হয়তো কাজ শেষ করে এই নরাধম দুজনের দেহ মাটিতে পুঁতে ফেলবে, তারপর মাংসের গন্ধে কুকুর শেয়ালের দল সেই দেহ বের করে নিয়ে নিজেদের ভোজে লাগাবে।

হয়েছে! এবার দাঁড়া সোজা হয়ে।

রুক্ষ কঠিন কণ্ঠস্বর।

দুজনে দুজনকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুজনের চোখ জলে ভরতি। সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব অস্পষ্ট।

আর দু এক মিনিটের মধ্যে চোখের সামনে চিরদিনের মতন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে।

দুম্।

আচমকা একটা শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র বাতি নিভে গেল।

ভারি একটা জিনিস পড়ার আওয়াজ।

অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না। মনে হল দুটো লোক যেন ধস্তাধস্তি করছে।

প্রাণপণ বিক্রমে। মরণপণ করে।

অন্ধকারে দীপু হাত বাড়িয়ে তপুর হাতটা আকর্ষণ করল।

পালিয়ে যাবার ইঙ্গিত।

দুজনে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

সন্তর্পণে দরজাটা ঠেলে বাইরে চলে এল।

বাইরে খুব অন্ধকার নয়। তরল জ্যোৎস্নায় সব কিছু প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

দুজনে ছুটতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রাস্তার কাছ বরাবর এসে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তপু বলল।

NOT FOR SALE

না, রাস্তার দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাদের কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। তার চেয়ে আয় আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

একটু ইতস্ততঃ করে দুজনে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বিরাট কতকগুলো গাছ। বোধ হয় বট আর অশ্বথ। বড় বড় ঝুরি নেমেছে ডাল থেকে। তলায় অনেক আগাছা।

যদি সাপখোপের উপদ্রব না থাকে তাহলে লুকোবার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

রাস্তা বেশী দূর নয়।

দুজনে গুঁড়ি দিয়ে একটা ঝোপের পাশে বসল।

দিনের আলো ফুটুক, তারপর রাস্তায় বের হবে।

বোধ হয় এক ঘণ্টারও বেশী।

দুজনে দেখল বাড়ির দিক থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।

ঠিক এইরকম আলো ওদের অনুসরণ করছিল।

দুজনে বুকে হেঁটে হেঁটে রাস্তার ধারের একটা গাছের আড়ালে বসল।

কাছে আসতে বুঝতে পারল একটা সাইকেল।

এতক্ষণ সাইকেলটা খুব জোরে আসছিল, রাস্তার কাছে আসতেই তার গতি কমে গেল।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আরোহী কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখল, তারপর দ্রুতবেগে চলে গেল শহরের দিকে।

সাইকেল পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দীপু বলল।

লোকটাকে দেখেছিস?

তপু ঘাড় নাড়ল।

হুঁ, আ লিম।

তার মানে, এ লোকটাও হয়তো খুন হল।

খুন?

নিশ্চয়, লোকটাকে খুন না করে আ লিম বের হত না।

আ লিম আমাদের নিয়ে গেল না সঙ্গে করে?

এতক্ষণ বোধ হয় বাড়িতে আমাদেরই খোঁজ করছিল। রাস্তায় এসেও এদিক ওদিক দেখছিল আমাদের খোঁজে।

তপু বলল।

আমাদের দেখতে না পেয়েছে ভালই হয়েছে, আ লিমের ফাঁদে আর নিজেদের জড়াতে চাই না।

NOT FOR SALE

দীপু চোখ বন্ধ করে হাই তুলল।

ক্লান্তিতে দুজনের শরীর ভেঙে পড়ছে। চোখ খুলে রাখাই দুষ্কর।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুজনে চোখ বুজল।

ঘুম ভাঙল পাখির কলরবে। ভোর হয়েছে। রাস্তা দিয়ে দু একজন লোক চলছে। সকলেরই মাথায় ঝুড়ি। ঝুড়িভরতি আনাজ তরকারি।

গ্রাম থেকে তরিতরকারি নিয়ে বোধ হয় শহরে যাচ্ছে। বিক্রির জন্য।

দুজনে উঠে রাস্তায় এল।

একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

শহর এখান থেকে কতদূর?

লোকটা বর্মী, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হাত মুখ নেড়ে কি বলতে বলতে চলে গেল।

বোঝা গেল এদের ভাষা লোকটা বুঝতে পারল না।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করল। পেটের মধ্যে আবার মোচড় দিচ্ছে। কিছু একটু খেতে পেলে হত।

ভাগ্য ভাল।

এবার যে লোকটা দুধের বালতি নিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল, তাকে হিন্দুস্থানী বলেই মনে হল।

দীপু জিজ্ঞাসা করল।

এখান থেকে শহর কতদূর?

কোন্ শহর?

তপু বলল, রেঙ্গুন।

নামটা সারেংদের মুখে জাহাজে সে শুনেছিল।

রেঙ্গুন? বিস্ময়ে লোকটা দুটো চোখ কপালে তুলল, তোমরা হেঁটে রেঙ্গুন যাবে নাকি? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এ জায়গার নাম কেমেনডাইন। তার চেয়ে এক কাজ কর, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা রাস্তা পাবে, সেটা ধরে গেলে স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে বরং ট্রেনে চেপে যাও।

লোকটা আর দাঁড়াল না। তীরবেগে ছুটে চলে গেল।

দীপু বলল, ট্রেনে তো চাপব, কিন্তু ভাড়া? শেষকালে হাজতে পুরবে।

তপু কি ভাবল, তারপর বলল, স্টেশনের কাছে হয়তো খাবারের দোকান থাকবে। আমাদের কাছে যা পয়সা আছে তাতে দু একটা পাঁউরুটি নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিছু একটু পেটে না পড়লে চোখে অন্ধকার দেখছি।

NOT FOR SALE

স্টেশন পর্যন্ত আর যেতে হল না। পথেই পাওয়া গেল।

একটা টিনের চালা। গোটা কয়েক বেঞ্চ আর টেবিল পাতা। গোটা কতক লোক মগে করে চা খাচ্ছে। পোশাক দেখে শ্রমিকশ্রেণীর বলেই মনে হল।

কোণের দিকে একটা বেঞ্চে দীপু আর তপু বসে পড়ল। চায়ের অর্ডার দিতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, তাদের কাছে একটি পয়সাও নেই। সব পয়সা সাম্পানের মাঝিকে দিয়েছে।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এ রাস্তা দিয়ে দু একটা লরি গেলে বড় ভাল হয়। থামিয়ে আমরা উঠে পড়ি।

তপু হেসে বলল, খিদিরপুরে যাওয়ার মতন?

দীপু ঘাড় নাড়ল। হুঁ।

কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করেও কোন লরির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। একটা গরুর গাড়ি এল, তরকারিতে ঠাসা বোঝাই। তিল ধারণের স্থান নেই।

সেটাতে ওঠা অসম্ভব।

বাধ্য হয়েই আবার হাঁটতে শুরু করল।

একটু পরেই ট্রেনের শব্দ পাওয়া গেল। মনে হয় এতক্ষণ বোধহয় থেমে ছিল, এইবার ছাড়ছে।

তার মানে, স্টেশন খুব দূরে নয়।

সত্যি তাই।

একটা বাঁক ঘুরতেই স্টেশন দেখা গেল। সামনে অনেকগুলো রিক্‌শা আর মোটরের ভিড়। কিছু লোকও ছোটাছুটি করছে।

দুজনে স্টেশনের এলাকার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা সান্ত্বনা, এখানে অনেক লোকজন রয়েছে, কেউ হঠাৎ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

দীপু আর তপু লোহার বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর চলে এল। অনেকগুলো বেঞ্চ পাতা রয়েছে। তার একটার ওপর গিয়ে বসল।

দীপুই বলল।

এখানে বসে ট্রেনের চলাচল লক্ষ্য করি। যে ট্রেনে দেখব ভিড় বেশী, সেটাতে চড়ে বসব। তাহলে বিনা টিকিটে শহরে গিয়ে পৌঁছাতে পারব।

তপু কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

অনেকগুলো ট্রেন এল, গেল, কিন্তু দুজনে সাহস করে চড়তে পারল না।

NOT FOR SALE

এদিকে বেলা বাড়ছে। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবে প্ল্যাটফর্মে।

কে তোমরা?

গম্ভীর আওয়াজে দুজনেই চমকে মুখ ফেরাল।

রেলের পোশাক পরা একজন টিকিট চেকার এসে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক বাঙালী। পরিষ্কার উচ্চারণ।

দীপু বলল, আমাদের পয়সা নেই, তাই ট্রেনে চড়তে পারছি না।

যাবে কোথায় তোমরা?

শহরে।

তার মানে রেঙ্গুনে! সেখানে কে আছে?

এবার দীপু আর তপু কথা বলতে পারল না। কি বলবে? কে আছে শহরে? কার কাছে তারা যাবে?

কি হল? একেবারে থেমে গেলে যে?

আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, মানে বাংলাদেশ থেকে।

তোমাদের চেহারা দেখে সেই রকমই মালুম হচ্ছে। ওঠ, এস আমার সঙ্গে।

দীপু আর তপু দাঁড়িয়ে উঠল।

তপু বলল, কোথায়?

শ্বশুরবাড়ি নিশ্চয় নয়। গেলেই বুঝতে পারবে।

দুজনকে নিয়ে টিকেট চেকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল।

টিকেটঘরের সামনে প্রহরারত একজন বর্মী পুলিস ছিল, তাকে হাত নেড়ে ডাকল।

পুলিস আসতে তাকে চাপাগলায় ফিসফিস করে কি বলল।

পুলিস মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল।

টিকেট চেকারের কান বাঁচিয়ে দীপু বলল।

এবার উপায়?

তপু মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, ঠিক আছে, পুলিসেই দিক। আর এভাবে ঘুরতে পারছি না। যা বলবার পুলিসের কাছেই বলব।

একটু পরেই পুলিস ফিরে এল। হেঁটে নয়, লাল একটা ভ্যানে চড়ে। ভ্যানের মধ্যে থেকেই দীপু আর তপুকে ইশারায় ডাকল।

দীপু আর তপু একটু ইতস্ততঃ করে ভ্যানে উঠে বসল।

দরজা বন্ধ হতে সব অন্ধকার। বাইরের কিছু বোঝবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, মোটর খুব দ্রুতবেগে বাঁকের পর বাঁক পার হচ্ছে।

NOT FOR SALE

একসময় ভ্যান থামল।

পুলিস নেমে দরজা খুলে দিল।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে কতকগুলো পুলিস ঘুরছে। গোটা কয়েক মোটর সাইকেলও রয়েছে।

নামো। নামো।

পুলিসের হাত নাড়ার ভঙ্গীতে মনে হল নামতে বলছে। দীপু আর তপু নেমে পড়ল।

সামনের ঘরে বিরাটবপু একটি পুলিস অফিসর। তার কানে কানে পুলিস কি বলতেই সে হাত দিয়ে কোণের একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

সেইদিকেই বোধ হয় হাজত। দীপু আর তপুকে হাজতে কাটাতে হবে।

ঠিকই তাই, এবার পুলিস দীপু আর তপুর সার্টের কলার ধরে টেনে নিয়ে চলল।

বাধা দিয়ে লাভ নেই, তাহলে নির্যাতন শুরু হবে।

দীপু আর তপু ভাবল, রাখুক হাজতে, আপত্তি নেই, শুধু যেন খেতে দেয়। না খেতে দিয়ে না মারে।

দরজা খুলে তার মধ্যে দুজনকে ঢুকিয়ে পুলিস সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

হাসির শব্দে দুজনে চমকে মুখ তুলল, তারপর আর অনেকক্ষণ চোখ নামাতে পারল না।

কোণের দিকে একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে আ লিম।

দীপু বলল, সর্বনাশ, তাহলে সবটাই ফাঁকি। টিকেট চেকার, পুলিস সব নকল? আমাদের ধরে আনার ফন্দি!

কোথায় পালিয়েছিলি শয়তানের বাচ্চারা? আ লিম বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

তপু বলল, আপনি যেখানে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, আপনি তো কিছু করলেনও না।

চোপরাও, মিথ্যেবাদী, আ লিম গর্জন করে উঠল, সর্বনাশ করে এসেছিস। যে প্যাকেটটা দিয়েছিলাম, সেটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছিস। সেই প্যাকেট পুলিসের হাতে পড়েছে।

দীপু আর তপু ভাবতে শুরু করল।

চেয়ারে বসা লোকটার কাছে গিয়ে প্যাকেটটা টেবিলের ওপরই তারা রেখে এসেছিল, তারপর লোকটা আচমকা মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ার পর

NOT FOR SALE

থেকে সব কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। প্যাকেটের কথা আর মনেই ছিল না। সেই প্যাকেটটা পড়েছে পুলিসের হাতে?

কি, চুপ করে আছিস যে?

দীপু বলল, লোকটা মারা গেছে দেখে আমরা এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে আর কিছু মনে ছিল না আমাদের।

মনে ছিল না আমাদের! আ লিম ভেংচি কাটল, এতদিন আমার দলে রয়েছিস, কাজ করছিস আমার সঙ্গে, আর খেয়াল নেই যে প্যাকেটের ওপর আমার গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা রয়েছে?

এবার তপু প্রতিবাদ করল।

কতদিন আবার আছি আপনার সঙ্গে? আমরা কি আপনার দলের লোক? আপনি তো ক'দিন হল ভুলিয়ে আমাদের ধরে রেখেছেন।

দীপুও সঙ্গে সঙ্গে বলল।

আমাদের জাহাজে উঠিয়ে দিন, আমরা যে দেশের ছেলে সে দেশে চলে যাই। এসব ঝামেলা আমাদের ভাল লাগছে না।

আ লিম ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলল।

থানার মধ্যে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে খুব মিথ্যা কথা বলছিস। তবে, শুনে রাখ, এটা মোটেই থানা নয়। সব সাজানো ব্যাপার। আমার আর এক কারসাজি। মিথ্যা কথা বললে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বের হতে পারবি না।

দীপু অবাককণ্ঠে বলল, বারে, মিথ্যা বলছি কিনা, আপনি জানেন না? আমরা এ দেশে এসেছি দশ দিনও নয়। এ দেশের ভাষা জানি না, পথঘাট চিনি না। তার ওপর পদে পদে বিপদ্ ঘটছে। আপনি সে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে, সে তো বন্দুকের গুলিতেই খতম করে দিত আমাদের দুজনকে।

কোন্ লোকটা? আ লিম চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসল।

পোড়োবাড়িতে যে লোকটা মারা গিয়েছিল তার যমজ ভাই। সেই তো রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, ভান করে, আমরা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে বিপদে পড়লাম।

আ লিম নির্বাক্। একটি কথাও বলল না।

তপু প্রায় কান্নাজড়ানো গলায় বলল, আপনার দুটি হাত ধরে মিনতি করছি আমাদের কোনরকমে জেটিতে পৌঁছে দিন। আমরা যেমন করে পারি ফেরবার ব্যবস্থা করব।

NOT FOR SALE

তপুর কথা শেষ হতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

আ লিম দাঁড়িয়ে উঠে দু হাতে নিজের মুখটা চাপল, তারপরই পাতলা বরারের মুখোসটা তার পায়ের তলায় খসে পড়ল।

কোথায় আ লিম! এ তো সম্পূর্ণ অন্য একটা লোক।

টকটকে গৌরবর্ণ, কোঁকড়ানো পিঙ্গল চুলের রাশ, তীক্ষ্ণ দু চোখের দৃষ্টি।

দীপু আর তপু আর্তনাদ করে পিছনে সরে গেল।

শোন, ভয় পেও না, জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, আমি আ লিম সেজে তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছে, তোমরা আ লিমের দলের নও। ভয় দেখিয়ে আ লিম তোমাদের দিয়ে তার কাজ হাসিল করত। একটা বড় সুবিধা, তোমরা পথঘাট চেন না, এ দেশের ভাষাও জান না, কাজেই তোমরা প্রায় অন্ধ আর বোবা লোকের সামিল।

অনেক কষ্টে সাহসে ভর করে দীপু প্রশ্ন করল।

আপনি কে?

আমি গোয়েন্দা ম্যালকম। অনেকদিন থেকেই আমি আ লিমের দলের সন্ধানে রয়েছি। তোমাদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

বলুন।

পোড়োবাড়িতে যে একটা খুন হবে, আমি জানতাম, কিন্তু আমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তো তোমাদের দেখতে পেলাম না। অথচ তোমরা বলছ, মৃত লোকটা চেয়ারের ওপর বসে ছিল, তোমাদের ধাক্কায় মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে।

তপু বলল, আমরা গুপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিলাম।

গুপ্ত সুড়ঙ্গ? ওখানে গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে? গুপ্ত সুড়ঙ্গ যে আছে, তাই বা তোমরা জানলে কি করে? গোয়েন্দা ম্যালকমের চোখে যেন সন্দেহের ছায়া নামল।

দীপু বলল, আমাদের একবার নিয়ে চলুন সেখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

ম্যালকম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, চল তাহলে।

তপু আর পারল না! বলেই ফেলল।

তার আগে কিছু আমাদের খেতে দিন। অনেকক্ষণ কিছু খাই নি!

ও, আমি ভারি দুঃখিত। এ কথাটা আমার মনেই ছিল না।

থানার একটা ঘরেই খাবার ব্যবস্থা হল। বেশ ভাল ব্যবস্থা।

আহার শেষ হতে তিনজনে থানার সামনে দাঁড়ানো মোটরে গিয়ে উঠল।

NOT FOR SALE

ম্যালকমই চালাল। পিছনের সীটে দীপু আর তপু।

সেই নদীর ধার! তিনজনে আবার সাম্পানে উঠল।

হাঁটাপথ ধরে গিয়ে পোড়োবাড়িতে উপস্থিত হল।

ম্যালকম হাতলের কারসাজি দেখল। তারপর তিনজনে সুড়ঙ্গপথে নেমে গেল। ম্যালকমের হাতে জোরালো টর্চ।

দীপু বলল, এই দেখুন এই বস্তার বালিশে আমরা শুয়েছি।

ম্যালকম হাঁটু মুড়ে বসে কোমর থেকে ছোরা বের করে বস্তার গায়ে বসিয়ে দিল। ফুটো দিয়ে ঝুরঝুর করে কিসের গুঁড়ো ঝরে পড়ল।

ম্যালকম সেই গুঁড়ো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখে বলল, এসব হচ্ছে কোকেন। নেশার জিনিস। এইগুলোর জন্যই এদের মধ্যে শত্রুতা।

কিসের শত্রুতা?

সব জানতে পারবে। এখানে আর কি দেখবার আছে বল?

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখানো হল, তারপর তিনজনে উঠে এল!

বাইরে বের হবার সময় ম্যালকম পকেট থেকে একটা বড় তালা বের করে দরজায় আটকে দিল।

তপু সব লক্ষ্য করে বলল, এর আগে দরজায় তালা দেন নি কেন?

দিই নি তার কারণ, আমি জানতাম, যে প্যাকেটটা ফেলে গেছে, সে প্যাকেট নিতে আসবে। আমি আ লিমের দলের কারুর অপেক্ষায় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। বাড়ির মধ্যে থেকে ক'দিন পরে তোমাদের বের হতে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ আমি তখন গুপ্ত সুড়ঙ্গপুরীর রহস্যের কথা জানতাম না। ভেবেই পাই নি কোথা থেকে তোমরা এলে। তাই তোমাদের পিছু নিলাম।

পিছু নিলেন?

হ্যাঁ, তোমরা পার হবার আগে অন্য ঘাট থেকে মোটর বোটে পার হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা আলো আমাদের পিছনে আসছিল।

হ্যাঁ, সেটা আমারই সাইকেলের আলো। তারপর লোকটা আহত সেজে তোমাদের যখন বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, তখনও আমি দূর থেকে তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিই তোমাদের বাঁচাই। লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে এসেছিলাম, তারপর গ্রেপ্তার করে হাজতে রেখে দিয়েছি।

NOT FOR SALE

তপু জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু লোকটা আমাদের গুলি করতে চেয়েছিল কেন? আমরা তো তার কোন ক্ষতি করি নি।

ম্যালকম হাসল, সে মস্ত বড় কাহিনী। চল থানায় ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে তোমাদের সব বলব।

বিকালের দিকে থানার পাশে কোয়ার্টারের বারান্দায় তিনজন বসল। পাশাপাশি।

একটা ইজিচেয়ারে ম্যালকম। দুটো চেয়ারে দীপু আর তপু।

একটা চুরুট ধরিয়ে ম্যালকম বলতে আরম্ভ করল।

রেঙ্গুন শহরে দুটো দল আছে। একটা আ লিমের দল, আর একটা সোলেমানের দল। দুটো দলই আবগারী জিনিস পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে এদিক ওদিক চালান দেয়। এ সব নিষিদ্ধ জিনিসের চালানের ব্যাপারে রেষারেষি থাকেই। সেই রেষারেষি থেকে খুন ও জখম হয়। কতকগুলো লোক আছে, তাদের আফিং, কোকেনেও ভাল নেশা হয় না, তারা সাপের বিষ পর্যন্ত হজম করে।

সোলেমান সাপের বিষ দিয়ে বড়ি তৈরি করত, বিশেষ মহলে সেই বড়ির দারুণ চল ছিল। সোলেমানের যে যমজ ভাই ছিল সেটা আমরা জানতাম না, জানতে পারলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত।

কেন? তপু জিজ্ঞাসা করল।

কারণ যতবারই এই সাপের বিষে কারো মৃত্যু হয়েছে আমাদের সন্দেহ থাকলেও সোলেমানকে ধরতে পারি নি, কারণ সাক্ষীরা চেহারার যে বিবরণ দিয়েছে তাতে বেশ বোঝা গেছে যে সোলেমানই বড়ির প্যাকেট সে বাড়ির মালিককে দিয়েছে। সোলেমানকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে সেই সময় সে ঘটনাস্থল থেকে তিনশো কি দুশো মাইল দূরে ছিল।

কি করে? দীপু অবাক্ হল।

যখন এক জায়গায় সোলেমান বড়ির প্যাকেট দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে তার যমজ ভাই দুশো মাইল দূরের কোন শহরে জজ ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল সার্জনদের একটা বিরাট পার্টি দিয়েছে। তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে সোলেমান সেই সময়ে তাঁদের মধ্যে ছিল। দুজনেই এক নাম ব্যবহার করত, এবং চেহারার এত মিল, যা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ যে, একজনকে আর একজন ভাবা খুবই স্বাভাবিক।

সোলেমানকে খুন করেছিল তারই এক সহকারী।

NOT FOR SALE

সহকারী? তপু জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। আ লিম তাকে টাকা দিয়ে নিজের দলে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু কি করে মারল? তার দেহে তো কোন আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না।

তোমরা আর কি করে দেখবে! আমাদেরই অনেক খোঁজ করে আঘাতের চিহ্ন বের করতে হয়েছিল। ডাক্তার মৃত্যুর কারণ বলেছিল বিষপ্রয়োগ। এমন তীব্র বিষ যে মুখে দিলে মুখ পুড়ে যাবার কথা। তারপর অনেক চেষ্টার পর ঘাড়ে একটা ছোট দাগ দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম ঘাড়ের পেশীর ওপর কেউ ইনজেকশন দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু।

ম্যালকম একটু দম নিল, তারপর বলল।

সোলেমানকে যে আ লিমের লোক মেরেছে সেটা তার ভাই সন্দেহ করেছিল। তোমরা আ লিমের দলের লোক সেটাই তার বিশ্বাস, অবশ্য আমার নিজেরও তাই ধারণা ছিল। সেইজন্যই সোলেমানের ভাই তোমাদের খতম করে দিতে চেয়েছিল!

তাকে আপনি কি মেরে ফেলেছেন?

দীপু ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

না, না, ম্যালকম হাসল, আমরা পুলিস, আমরা মানুষ মারি না। বললাম যে তাকে হাজতে রেখেছি। অনেক কিছু কথা ইতিমধ্যে সে বলেও ফেলেছে।

কিন্তু আপনি আ লিমের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন কেন?

তপুর এই প্রশ্নের উত্তরে ম্যালকম আবার মুচকি হাসল, তারপর বলতে লাগল।

যদি সত্যি তোমরা আ লিমের দলের হতে তাহলে আ লিমের কাছে সব কিছুই বলতে। এভাবে বার বার তার দলের লোক নও বলে আপত্তি করতে না। তোমাদের মুখের চেহারা, কথাবার্তার ধরন দেখেই বুঝতে পারলাম, তোমাদের আ লিম ধরে এনেছে। তার দলে অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে তা জানতাম, আর এও জানতাম যে এইসব ছেলেদের বেশীদিন দলে রাখে না। কিছু কাজ করে নিয়ে শেষ করে দেয়। তোমাদেরও তাই দিত।

আমাদেরও দিত?

হ্যাঁ দিত, কারণ সব গুপ্ত আস্তানার সন্ধান জানে এমন ছেলে বেঁচে থাক এটা সে চায় না। কোথায় কোথায় সে নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেয়, এ সব জানে এমন লোক থাকুক, এটাও তার অভিপ্রায় নয়!

আ লিমকে ধরেছেন আপনারা?

NOT FOR SALE

না, ম্যালকম আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, এখনও তাকে ধরা সম্ভব হয় নি। তার জুয়ার আড্ডায় একবার আমরা হানা দিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকে ধরতে পারি নি। সকলে পলকের মধ্যে যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে সেখানেও বোধ হয় কোন হাতলের কারসাজি ছিল।

দীপু আর তপু একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

হ্যাঁ, আপনাদের হামলার সময় আমরাও সেখানে ছিলাম। সেখানেও এক সুড়ঙ্গপথ আছে নদী পর্যন্ত।

ম্যালকম এবারে খুব মৃদু কণ্ঠে বলল।

সেই গুপ্ত আস্তানার সন্ধান সেবারেও একটি ছেলে দিয়েছিল। আ লিমের দলের ছেলে। জাতে বর্মী। বেচারী!

কেন, বেচারী কেন?

তপু প্রশ্ন করল।

তাকে আমি তোমাদের মতনই নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলাম। বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, যেন বাড়ির বাইরে না যায়। কিছুদিন ছেলেটি আমার কথা শুনেছিল। বাড়ির মধ্যেই ছিল! কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার সাহস বাড়ল। প্রথমে বাগানে ঘুরে বেড়াত, একদিন বাড়ির বাইরে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি!

ফিরে আসে নি?

না, জীবন্ত আর ফিরে আসে নি। দিন তিনেক পরে আমার নামে একটা পার্সেল এসেছিল। আমার এক বোন থাকে ইয়েমেদিনে, তার কাছ থেকে। খুলেই চমকে উঠেছিলাম।

কি ছিল তাতে? দীপু জিজ্ঞাসা করল।

সেই ছেলেটির মাথা।

দীপু আর তপুর কণ্ঠ থেকে ভয়ার্ত স্বর বের হল।

সঙ্গে একটা চিঠিও ছিল। তাতে লেখা, আ লিম বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না।

চেয়ার ছেড়ে দীপু আর তপু ম্যালকমের দু পাশে এসে দাঁড়াল।

তপু বলল, তাহলে কি হবে? আমরা কি করে বাঁচব?

ম্যালকম দুটো হাত প্রসারিত করে দুজনের পিঠে রাখল। বলল।

ভয় নেই, তোমরা যদি এ বাড়ির বাইরে না যাও তাহলে কোন ক্ষতি কেউ তোমাদের করতে পারবে না। আমি বাড়ির চারপাশে সাদা পোশাকে পাহারাও রেখেছি, তারা তোমাদের ওপর দৃষ্টি রাখবে।

NOT FOR SALE

আমরা আমাদের ঘর থেকেই বের হব না।

দীপু কাঁপাগলায় বলল।

ম্যালকম বলল, উপস্থিত কালই তো আমাদের সঙ্গে বের হতে হবে। সেই গুপ্ত আস্তানা আমরা চিনি, কিন্তু সুড়ঙ্গপথটা আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে।

দীপু আর তপুর বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ম্যালকম আবার বলল।

কোন ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে বন্দুক পিস্তল নিয়ে কিছু পুলিস থাকে।

একটা কালো মোটর। ভিতরে ম্যালকম, দীপু আর তপু। সঙ্গে গোটা ছয়েক পুলিস। বন্দুক আর পিস্তল উঁচিয়ে।

খুব সাবধানে চারদিকে দৃষ্টি রেখে মোটর এগিয়ে চলল।

পথে কোন লোক কৌতূহলবশতঃ দাঁড়ালেই পুলিস চীৎকার করে তাদের হটিয়ে দিল।

অনেকটা যাবার পর ম্যালকম ড্রাইভারকে কি বলল।

পাশে নদী! এদিকে ঝাঁকড়া গাছের সার।

ম্যালকম বলল, ঠিক আছে, এটাই সেই আস্তানা, যেখানে একবার আমরা এসেছিলাম। এই তো আগাছার ঝোপ আর ইঁটের পাঁজা।

দীপু আর তপুর দিকে ফিরে ম্যালকম বলল, এবার আস্তে আস্তে নেমে এস তোমরা।

দীপু আর তপু নামতে যাবার মুখেই বিপর্যয়।

দারুণ একটা শব্দে আশেপাশের মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। ধূলার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ম্যালকম আচমকা দীপু আর তপুর হাত ধরে শুইয়ে না দিলে মারাত্মক কাণ্ড হত। মোটরের জানলার কাঁচগুলো ভেঙে চারদিকে ছিটকে পড়ল। সেই কাঁচের একটা খণ্ড শরীরে লাগলে খুবই বিপদ্ হত।

ম্যালকম নিজেও সটান শুয়ে পড়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে ম্যালকম উঠে বসল। এদিক ওদিক দেখে সবাইকে বলল, উঠে পড়।

পুলিসরাও এদিক ওদিক টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এবার তারাও উঠে দাঁড়াল।

বেশ একটু দূরে কিছু লোকের জটলা। আওয়াজ শুনে এসে জড় হয়েছে, কিন্তু সাহস করে সামনে আসতে পারছে না।

দীপু বলল, কিসের শব্দ বলুন তো?

NOT FOR SALE

ম্যালকম লাফিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বলল।

বোমার। কেউ আমাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল। ক্ষতি করতে পারে নি, কারণ বোমাটা আগেই ফেটে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইঁটের পাঁজার ফাঁক থেকে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া কমে যেতে ম্যালকম পুলিসদের দিকে ফিরে হুকুম দিল, এগিয়ে চল, কিন্তু খুব সাবধানে।

প্রথমে পুলিসের দল, তারপর ম্যালকম, সব শেষে দীপু আর তপু পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

ইঁটের পাঁজার পাশ দিয়ে একটু নেমেই থেমে পড়ল।

অল্প অল্প ধোঁয়া তখনও বের হচ্ছে। মেঝের অনেকটা জুড়ে কালো দাগ। নীচে দিয়ে নদীর ধারে যাবার গুপ্ত পথ খোলা রয়েছে।

ঠিক কালো দাগের পাশে বীভৎস একটা মূর্তি। মুখের কিছু অংশ উড়ে গেছে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে স্থানে স্থানে।

তবু চেনা গেল। আ লিম।

ম্যালকম কিছুক্ষণ নীচু হয়ে মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করল তারপর বলল।

আ লিম বোমাটা ছুঁড়তে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অবশ্য আমাদের সৌভাগ্যবশত, বোমাটা ইঁটে ধাক্কা লেগে আবার ফিরে এসে তার গায়ের ওপরই পড়েছে। বোমাটা কি ভয়ংকর বুঝতেই পারছ। যার শব্দতরঙ্গে মোটরের কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, সে বোমাটা সরাসরি পড়লে আমাদের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

ম্যালকম কথা শেষ করে পুলিসদের দিকে চোখ ফেরাল। বলল।

অপরাধের ফল মৃত্যু। এতদিন ধরে এ লাইনে কাজ করে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

সকলে আস্তে আস্তে নেমে মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

এইখানে জুয়ার আসর বসত। পুলিস সেবার হামলা দেবার পর থেকে বোধ হয় আসর আর বসে নি।

দীপু বলল, গুপ্ত সড়ক তো দেখতেই পাচ্ছেন?

ম্যালকম ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আ লিম রাস্তা পরিষ্কার করেই রেখেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের খতম করে নদীপথে সে সরে পড়বে। নদীর ধারে নিশ্চয় যাবার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছিল। চল, নামি।

NOT FOR SALE

সকলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

নদীর বুকে গোটা তিনেক জাহাজ। একেবারে মাঝখানে। অনেকগুলো সাম্পান এখানে ওখানে ভাসছে।

অনেক দূরে ছোট একটা কালো বিন্দু।

ম্যালকম পকেট থেকে দূরবীন বের করে চোখে লাগিয়ে দেখল, তারপর বলল, ঐ একটা মোটর-লঞ্চ ছুটে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। বোধ হয় এই মোটর লঞ্চটাই এখানে অপেক্ষা করছিল। গোলমাল দেখে সরে পড়েছে।

সবাই ওপরে উঠে এল।

ম্যালকম একজন পুলিসকে ডেকে বলল।

তুমি হেড-কোয়ার্টারে চলে যাও। একটা ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে আলিমের ফটো তোলার ব্যবস্থা কর। আর একজন বারুদ বিশারদকেও নিয়ে আসবে। বোমার টুকরোগুলো তুলে নিয়ে রিপোর্ট দেবে।

হঠাৎ তপুর মনে পড়ে গেল।

একবার ওপরে চলুন, এর পাশেই আমাদের আটকে রেখেছিল।

দীপু বলল, একটা চিতাবাঘও আছে ওখানে। ওদের কথা না শুনলে বলেছিল, আমাদের চিতাবাঘের মুখে ফেলে দেবে।

তাই নাকি? ম্যালকম বলল, চল তো দেখে আসি।

পুলিসরা রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে ঢুকল ম্যালকম, দীপু আর তপু।

ম্যালকম হাতের পিস্তলটা উঁচু করে ধরে রইল।

দরজায় বিরাট একটা তালা।

একবার টেনে দেখে ম্যালকম বেরিয়ে এসে একটা পুলিসকে ডাকল।

পুলিস কাছে আসতে তাকে নীচু গলায় কি বলতেই সে ছুটে মোটরের ভিতর থেকে চাবির গোছা নিয়ে এল।

ম্যালকম একটা দুটো করে কয়েকটা চাবি তালার মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে শব্দ করে তালাটা খুলে গেল।

আনন্দে দীপু চীৎকার করে উঠল।

খুলেছে, খুলেছে।

দরজাটা ঠেলে দীপু ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্জন। দীপুর মনে হল পীত রংয়ের একটা বিদ্যুৎ এক কোণ থেকে ছুটে এল।

NOT FOR SALE

সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় দীপু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গুরম্।

ম্যালকমের পিস্তল অগ্নিবর্ষণ করল।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

দীপু যখন চোখ মেলল, দেখল মাথার কাছে ম্যালকম আর তপু বসে।

ম্যালকম জিজ্ঞাসা করল।

কি, শরীর ঠিক হয়েছে?

ঘাড় নেড়ে দীপু উঠে বসতেই তার চোখে পড়ে গেল।

কোণের দিকে চারটে পা প্রসারিত করে চিতাবাঘটা পড়ে রয়েছে। মৃত।

ম্যালকম বলল।

তোমাদের বন্ধু আ লিম চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। বোমা হাতে জুয়ার আড্ডার মুখে নিজে অপেক্ষা করছিল। যদি আমরা প্রথমে এদিকে আসি, সেজন্য চিতাবাঘটাকেও খুলে রেখেছিল। আমি অবশ্য এ ধরনের কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম, সেইজন্যই পিস্তল নিয়ে তৈরী ছিলাম। দেখলে তো তোমরা ভাল করে, পাপ কখনও জয়ী হতে পারে না। পাপের পতন অনিবার্য।

ম্যালকম তন্নতন্ন করে এদিক ওদিক সব খুঁজল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

বোঝা গেল, এটা শুধু আ লিমের বন্দীশালা। নতুন নতুন যাদের ধরে আনত, তাদের এই ঘরে আটকে রাখত। চিতাবাঘের ভয় দেখাত। চল, এবার বাইরে যাই।

তিনজনে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ম্যালকমের ইঙ্গিতে দুজন পুলিস বাঁশে বেঁধে চিতাবাঘের দেহটাও তুলে নিল।

ফেরবার সময় পুলিসের কালো মোটর নয়, ছোট একটা সবুজ মোটরে তিনজন ফিরল।

গাড়িতে উঠে ম্যালকম বলল।

মোটর বদলালাম। কারণ আমার মনে হচ্ছে আ লিমের অনুচরেরা সহজে ছাড়বে না। কালো মোটরের ওপর নজর রাখবে।

কেন, নজর রাখবে কেন?

তপু প্রশ্ন করল।

রাখবে, তার প্রথম কারণ, প্রতিশোধস্পৃহা। আমাকে খতম করার চেষ্টা করবেই। দ্বিতীয় কারণ, আ লিমের মৃতদেহ।

NOT FOR SALE

আ লিমের মৃতদেহ? কেন?

দীপু আশ্চর্য হল।

আমার মনে হচ্ছে, কিছু কাগজপত্র বা অন্য কিছু তার কাছে আছে, সে তো দলপতি।

তপু জিজ্ঞাসা করল।

কিন্তু আপনি তো আ লিমের দেহ সার্চ করেছেন?

ম্যালকম গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তা করেছি। কিন্তু কিছুই পাই নি।

তবে?

তপুর এ প্রশ্নের ম্যালকম কোন উত্তর দিল না। বাইরের দিকে চোখ মেলে চুপ করে বসে রইল।

যথাসময়ে মোটর থানার সামনে এসে দাঁড়াল।

দীপু আর তপু ম্যালকমের বাড়ির মধ্যে চলে গেল। ম্যালকম থানায় ঢুকল।

ম্যালকম যখন ফিরল, তখন বেশ রাত।

দীপু আর তপু খাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে ছিল, ম্যালকম ওপরে এল।

কি, তোমরা এখনও শুয়ে পড় নি?

আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

হুঁ।

গম্ভীর মুখে ম্যালকম একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ম্যালকম বলল।

আমি যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে।

দীপু আর তপু একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল।

কি, কি হয়েছে?

কালো ভ্যানের ওপর আবার আক্রমণ হয়েছে।

আক্রমণ?

হ্যাঁ, ভিড়ের মধ্যে থেকে কে আবার ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল, কিন্তু এমন একটা ব্যাপার হতে পারে এ বিষয়ে আমি আগেই সজাগ করে দিয়েছিলাম, তাই বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। আ লিমের মৃতদেহ নিয়ে মোটর ঠিকই হাসপাতালে পৌঁছাতে পেরেছিল। তাছাড়া, আমার কাজও হয়েছে।

NOT FOR SALE

কি কাজ?

আ লিমের দেহ থেকে দরকারী কাগজ উদ্ধার করতে পেরেছি। হাঁটুর মাংস চিরে পকেটের মতন তৈরি করে একটা কাগজ লুকানো ছিল। ডাক্তারের সহায়তায় মাংস কেটে সে কাগজ সংগ্রহ করেছি।

নিজের শরীরের মধ্যে পকেট তৈরি করে?

হ্যাঁ, ম্যালকম হাসল, এটা অপরাধীদের একটা সাধারণ পন্থা। কয়েদীরা জেল থেকে এইভাবে পয়সাকড়ি বের করে নিয়ে আসে, যারা নিষিদ্ধ জিনিস চালান দেয়, তারা পুলিসের চোখ এড়াবার জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে এইভাবে লুকানোর জায়গা তৈরি করে নেয়।

দীপু আর তপু সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একটু পরে দীপু জিজ্ঞাসা করল।

যে কাগজটা পেয়েছেন, সেটা নিশ্চয় খুব দরকারী।

ম্যালকম হাসল।

হ্যাঁ, দরকারী বৈকি। খুব ছোট একটা ফিল্ম। খালি চোখে পড়াই যায় না। জোরালো লেন্সের সাহায্যে প্রজেক্টরের ওপর চড়িয়ে সামনের এক সাদা পর্দায় প্রতিফলিত করালাম। ঠিক যে ভাবে সিনেমার ছবি দেখায়। লেখাগুলো বহুগুণ বর্ধিত হল। সব ঠিকানা। সারা ব্রহ্মদেশে যেখানে যেখানে আ লিমদের আস্তানা আছে, তার ঠিকানা। বুঝতেই পারছ এটা আমাদের পক্ষে কত দরকারী। ইতিমধ্যে গোপন টেলিগ্রাম চলে গেছে থানায়, থানায়। আজ গভীর রাত্রে হানা দিয়ে ধরপাকড় শুরু হবে।

ম্যালকম উঠে দাঁড়াল।

ব্যস, আর নয়। এবার উঠে পড়। রাত অনেক হয়েছে।

দিন তিনেক পর থানায় ডাক পড়ল। দীপু আর তপুর।

ম্যালকম বসে ছিল। তার পাশে এক পুলিস অফিসর।

অফিসরটি ওদের নাম, ধাম, অভিভাবকের নাম সব লিখে নিল।

সব হয়ে যেতে ম্যালকম বলল।

তোমাদের সাহায্যের জন্যই আমাদের অভিযান অনেকাংশে সফল হয়েছে। আ লিমকে জীবন্ত ধরতে পারি নি বটে, কিন্তু তার অনেক শাগরেদ ধরা পড়েছে। অনেক নিষিদ্ধ জিনিস আমাদের হাতে এসে গেছে।

সরকার পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের দুজনকে কিছু টাকা দেবেন। তাছাড়া তোমাদের দেশে ফিরে যাবার সব খরচও সরকার বহন করবেন।

NOT FOR SALE

দেশে ফিরে যেতে পারব!

দীপু আর তপু দুজনের চোখে জল এসে গেল। মাথা নীচু করে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

টাকাটা পরের দিনই হাতে এল।

কম নয়। এক একজনের ভাগে দুশ। এত টাকা একসঙ্গে দীপু আর তপু কোনদিন দেখে নি।

ম্যালকম কাছে এসে দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

শোন, তোমাদের কয়েকটা কথা বলি। এভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে তোমরা কতখানি অন্যায় করেছ, আশা করি এখন বুঝতে পারছ। ভাগ্য ভাল যে বেশী বিপদের মধ্যে পড় নি। মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারত। লেখাপড়া শিখে, বড় হয়ে দেশভ্রমণে বের হওয়া উচিত। এভাবে চুপিচুপি বাড়ি থেকে পালিয়ে, জাহাজ কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে, বিদেশে এলে কি হয়, তার স্বাদ তোমরা ভালভাবেই পেলে। এবার বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, পাপের পথ সর্বদা পরিহার করবে, কারণ পাপের ফল কি সেটা নিজেদের চোখেই দেখে গেলে।

কাল সকালেই তোমাদের জাহাজ ছাড়বে। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, কোন অসুবিধা হবে না। আমি থাকতে পারব না। আজ রাতেই একটা কাজে আমাকে শহরের বাইরে যেতে হবে। গুড-বাই!

দীপু আর তপু ম্যালকমের প্রসারিত হাতটা একে একে আঁকড়ে ধরল।

তপু বলল, বিদেশের বন্ধু, বিদায়!

সত্যি কোন অসুবিধা হল না।

একজন পুলিস অফিসার সঙ্গে করে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। বোধ হয় দীপু আর তপুর সম্বন্ধে।

এ জাহাজের নাম, এস. এস. অ্যাঙ্গোরা।

আবার তিন দিন নীল সমুদ্রের ওপর ভেসে যাওয়া জীবন।

দুজনে ডেক থেকে ডেকে ঘুরে বেড়াল। ক্যাপ্টেন এসে তাদের পিঠ চাপড়াল।

বলল, তোমরা বীর বালক। বিরাট একটা বদমাইশের দলকে ধরতে সরকারকে সাহায্য করেছ।

সারেংরা বিস্মিতদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

NOT FOR SALE

তিন দিন পর স্থলের রেখা দেখা গেল। বোঝা গেল মাটি মায়ের কি দুর্বার আকর্ষণ। সবাই সার দিয়ে দাঁড়াল রেলিং ধরে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল গাছপালা, বাড়িঘর, কলকারখানা।

জল আর নীল নয়, ঘোলাটে। আশেপাশে অনেক স্টীমার, জেলে ডিঙ্গি দেখা গেল।

নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি।

রেলিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে দীপু আর তপু প্রণাম করল।

মাথা তুলেই দুজনে অবাক্।

জেটি দেখা যাচ্ছে। জেটির বারান্দাভর্তি লোক।

তার মধ্যে দীপুর বাবাকে দেখা গেল। তিনি আকুলদৃষ্টিতে জাহাজের দিকে দেখছেন।

দীপু আর তপু রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্ফুটকণ্ঠে দীপু বলল, বাবা! তপু বলল, জেঠু! তারপর চোখের জলে সামনের পৃথিবী অস্পষ্ট হয়ে গেল।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী

১

পরীক্ষা শেষ। এতদিনের দুশ্চিন্তার অবসান।

পরীক্ষার হল থেকে কুমুদ বাড়ি ফিরল যেন হাওয়ায় ভেসে। কাল থেকে আর রাত থাকতে উঠে বইখাতার ওপর ঝুঁকে পড়তে হবে না। তারপর কোন রকমে স্নান খাওয়া সেরে আবার পড়তে বসা। বিকালে ঘন্টা খানেকের ছুটি। ওই সময়টা কুমুদ পার্কে একটু বেড়িয়ে আসে। সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে নিয়ে আবার গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যয়ন।

বিছানায় শুলেই কি নিস্তার ছিল? চোখের পাতা বন্ধ করলেই প্রশ্নপত্রগুলো ভয়াবহ মূর্তিতে সঙীন খাড়া করে এসে দাঁড়াল। ইংরাজী, ইতিহাস আর জ্যামিতি এই তিনটেতেই কুমুদের একটু ভয় ছিল।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কেমন একটা ভীতি কুমুদকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কাপড়ে ফুটে থাকা চোরকাঁটার মতন।

এইসব দুশ্চিন্তা থেকে এবার মুক্তি।

পরীক্ষার ফল বের হতে অনেক দেরি। কবে যে ঠিক বের হবে, একথা কেউ বলতে পারে না। এমন কি যাঁরা পরীক্ষা পরিচালনা করছেন, তাঁরাও নয়।

বাড়ি ফিরে কুমুদকে দরজা ঠেলতে হল না। দরজা খোলাই ছিল। কুমুদের ফেরার সময়টা তার মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। বিশেষ করে পরীক্ষার ক'দিন। গলির মোড়ে কুমুদকে দেখে নীচে নেমে দরজা খুলে দেন।

আজও কুমুদ ঘরের মধ্যে ঢুকতে মা জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, কেমন হল?

ভালই।

অন্যদিন কুমুদ এত হাসে না। পরের দিনের পরীক্ষার কথা চিন্তা করে। মা সেটা লক্ষ্য করেই বললেন।

NOT FOR SALE

আজ এত হাসি যে?

বাঃ, হাসব না? আজ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কাল থেকে কি করি বল তো মা?

মাও হাসলেন, কি আর করবি। এত দিন এত খাটলি, এবার ক'দিন চেপে ঘুমবি।

উহুঁ, তুমি বলতে পারলে না।

কুমুদ মাথা নাড়ল।

তবে কি করবি?

ছাদ থেকে নীচে লাফাব। বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োব, হাওড়া ময়দানে যাব সার্কাস দেখতে।

বেশ, তোর যা ইচ্ছে করিস। এখন মুখহাত ধুয়ে খাবি আয়। তোর জন্য লুচি আর পায়েস করে রেখেছি।

আর বেশী বলতে হল না। এ দুটি কুমুদের প্রিয় খাদ্য।

কুমুদ লাফাতে লাফাতে নিজের ঘরে ঢুকল।

কুমুদ মা বাপের একটি ছেলে। তার এক দিদি আছে কুমুদের চেয়েও বয়সে বছর কুড়ি বড়। কুমুদ জন্মাবার কিছুদিন পরেই তার দিদির বিয়ে হয়ে যায়।

দিদির ছেলে তুলসীই প্রায় কুমুদের বয়সী।

দিদির বিয়ে হয়েছে রতনগড়ে। পুরানো প্রতিপত্তিশালী জমিদারের বাড়ি। এখন জমিদারদের আর বিশেষ কিছুই নেই। জমিজমা সবই গেছে।

আসল কথা, টাকার ঝঙ্কার আর নেই, তবে হুঙ্কার আছে।

নিরক্ষর প্রজারা এখনও হাতজোড় করে দাঁড়ায়। কোন কিছু বললে তখনই হুকুম তামিল করে।

কুমুদ যখন পরীক্ষার এক সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন রতনগড় থেকে চিঠি এল।

দিদি লিখেছে, কুমুদের তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখানে তুলসীরও স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। কুমুদ তো অনায়াসেই দিদির কাছে চলে আসতে পারে।

এই সাতটা দিন কুমুদ ছাদ থেকেও লাফায় নি, বাসের সঙ্গেও দৌড়োয় নি। আর শীতকাল ছাড়া তো হাওড়া ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পড়েই না।

কুমুদ শুধু ঘুমিয়ে আর গল্পের বই পড়ে কাটাল।

কিন্তু সময় যেন আর কাটতেই চায় না।

NOT FOR SALE

কুমুদের বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা খুব কম। ছেলেবেলা থেকে তার ব্যায়ামের দিকে ঝোঁক। স্কুলে বক্সিং আর জুজুৎসুতে খুব নাম ছিল।

কিন্তু তার বেশীরভাগ সহপাঠীরই এসব ব্যাপারে কোন আকর্ষণ নেই।

মায়ের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে কুমুদ পড়ে ফেলল।

তারপর বলল, ঠিক আছে। রতনগড়ে চলে যাই। সময়টা ভালই কাটবে।

তা তো কাটবে, কিন্তু তোমায় যেতে দিতে আমার সাহস হচ্ছে না।

মায়ের মুখের দিকে দেখে কুমুদ প্রশ্ন করল, সাহস হচ্ছে না? কেন মা?

আর কেন? বিনুর বাড়ির দুপাশে দুটো দীঘি। তুমি তো সেই দীঘি তোলপাড় করবে। জলে আমার ভয়।

জলে আমার কিন্তু কোন ভয় নেই মা। পৃথিবীর তিন ভাগ যখন জল, তখন জলে মিছামিছি ভয় পেয়ে লাভ কি বল? তাছাড়া আমি তো ভাল সাঁতার জানি। রতনগড়ে শিখেছি।

শুধু কি জলের ভয়? দুটো দীঘিতে ঘন পদ্মবন। আর পদ্মবনে যত বিষাক্ত সাপের বাসা।

কুমুদ হেসে উঠল।

কি ব্যাপার বল তো মা? আমাকে রতনগড়ে না যেতে দেবার মতলব বুঝি? আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আমি খুব সাবধানে থাকব।

রতনগড়ের দীঘির জলের চেয়েও কুমুদের অন্য আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী।

যখন রতনগড়ের জমিদারদের প্রবল প্রতাপ ছিল, তখন একপাল লাঠিয়াল তাঁরা পুষেছিলেন।

তারা হুকুম পেলেই প্রজাদের ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ফসল কেটে আনত, দুর্বিনীত প্রজাদের ঘরে আগুন দিত, আবার নদীর বুকে কোথাও চর জাগলে, লাঠি ঘুরিয়ে সেই চর দখল করত।

এখন এদের এসব কাজ করতে হয় না। এরা নিজেদের মধ্যে লাঠি খেলে বোধহয় অভ্যাস বজায় রাখবার জন্য।

অন্যবার রতনগড়ে গিয়ে অনেক খোসামোদ করে কুমুদ কয়েকটা প্যাঁচ শিখেছে। সর্দার লাঠিয়াল বলেছে, খোকাবাবু, এখন নয়, আরো বড় হও তখন সব প্যাঁচ শিখিয়ে দেব।

এখন তো কুমুদ যথেষ্ট বড় হয়েছে। পরীক্ষার ফল বের হলেই কলেজে পড়বে। কাজেই প্যাঁচ শেখবার পক্ষে এখন কোন অসুবিধে হবার কথা নয়

NOT FOR SALE

চিঠিটা কুমুদের হাত থেকে নিয়ে মা বললেন—

তোমার বাবাকে কথাটা বলে দেখি।

কুমুদ খুশী হল। আর ভয় নেই। বাবা ভাল করে কথাটা শোনবার আগেই মত দিয়ে দেবেন। বাবা সর্বদাই অন্যমনস্ক। ব্যস্ত ডাক্তার। কেবল রোগীদের চিন্তা।

কুমুদের মনে আছে, মা একবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কি মুশকিল দেখ, শোবার ঘরের জানলাটা কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। বর্ষায় বোধহয় কাঠ ফুলে উঠেছে।

বাবা বসে বসে মেডিকেল জার্নাল পড়ছিলেন। মুখ না তুলেই বলেছিলেন।

অপারেশন করতে হবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

মা খুব জোরে হেসে উঠতে বাবার খেয়াল হয়েছিল।

কুমুদ ঠিকই অনুমান করেছিল।

মা বাবার কাছে কথাটা পাড়তেই বাবা রাজী হয়ে গেলেন।

বেশ তো, যাক না। বিনুর ওখান থেকে ক'দিন ঘুরে আসুক। আজকাল তো আর পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া নেই। তাছাড়া এখন গরমও কমে এসেছে। অন্ততঃ টাটকা ভিটামিন খেয়ে বাঁচবে। শহরে তো পয়সা দিলেও ভাল জিনিস পাবার উপায় নেই।

বাবা সচরাচর এত কথা বলেন না। সেদিন এত কথা বলতে মা বুঝতে পারলেন, বাবার হাতের রোগীদের অবস্থা ভাল। এ যাত্রা বোধহয় কুমুদ বেঁচে গেল।

কুমুদের রতনগড় যাওয়াই ঠিক হল।

মা বিনিকে যাবার তারিখ জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে এও জানালেন, কুমুদকে যেন চোখে চোখে রাখা হয়। দীঘির জলে বেশীক্ষণ পড়ে না থাকে, বনে জঙ্গলে না ঘোরে, কোন রকম অনিয়ম না করে।

মায়ের গোছানো সুটকেস নিয়ে কুমুদ একদিন মোটরে উঠে বসল। এর আগেও কুমুদ বারকয়েক একলাই গিয়েছে।

রতনগড়ের পথ তার খুব চেনা।

মোটর চড়ে হাওড়া। সেখান থেকে ট্রেনে শক্তিগড়। শক্তিগড় থেকে বাস। প্রায় আড়াই ঘন্টা বাসে যাবার পর মদনমোহনতলা। সেখানে দিদির পাঠানো গরুর গাড়ি মজুত থাকে। দুটো গরুর শিংয়ে লাল রং করা, খড় বিছানো বসবার জায়গা।

NOT FOR SALE

টানা এক ঘন্টা। তারপরই রতনগড়।

রাস্তার পাশেই বিরাট দীঘি। কাকচক্ষু জল। ওপারে পদ্মবন। লাল লাল ফুল ফুটে থাকে। দীঘির পাড়েই জমিদারবাড়ি।

আর একটা দীঘি খিড়কীর দিকে। রাস্তা থেকে দেখা যায় না।

কুমুদ যখন মদনমোহনতলায় নামল, তখন সূর্যের তেজ কমে এসেছে। গাছের ছায়া বেশ দীর্ঘ।

বাস থেকে নামতেই চিৎকার কানে এল—

কুমুমামা, এই যে, এদিকে।

কুমুদ চোখ ফিরিয়ে দেখল, একটা দেবদারু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তুলসী চেঁচাচ্ছে।

দিদি অনেকবার বলে দিয়েছে, মামা যখন একটাই, তখন নাম ধরে মামা ডাকবার কোন দরকার নেই। শুধু মামা বলাই ভাল।

কিন্তু তুলসী কথাটা কানে তোলে নি।

তুলসীর চেহারা অনেক বদলে গেছে।

শার্টের তলায় তার পেশীপুষ্ট শরীরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাথায় যেন একটু লম্বাও হয়েছে।

কুমুদ কাছে যেতেই তুলসী নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করল।

কুমুদ বাধা দিয়ে বলল, আরে, থাক থাক! গাড়ি কোথায়?

তুলসী হাত দিয়ে দেখাল।

একটু দূরে ঢালু জমিতে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়োয়ান বোধহয় গরু দুটোকে খুলে দিয়েছিল। বাস আসতেই সে দুটোকে বাঁধবার চেষ্টা করছে।

কুমুদ খুব পরিশ্রান্ত। সকালে রওনা হয়েছে। এখনও যাত্রার শেষ হয়নি। তুলসী তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়েছে।

ক্লান্ত পায়ে কুমুদ গরুর গাড়ির দিকে এগোল।

গাড়োয়ান তিলকরাম কুমুদের চেনা। প্রত্যেকবার তিলকরামই গাড়ি নিয়ে আসে। বয়স ষাটের কোঠায়। এখনও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা।

কুমুদ কাছে আসতেই তিলকরাম তার সামনে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

ভাল আছেন খোকাবাবু? বাড়ির খবর সব ভাল?

এখানে এই এক মুশকিল। সবাই খোকাবাবু বলে ডাকে।

NOT FOR SALE

কেবল দিদি আর জামাইবাবু ডাকে—কুমুদ।

গরুর গাড়ি চলতে শুরু করল।

তুলসী দু একটা কথা বলেছিল, কিন্তু কুমুদের দিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে থেমে গেল।

মাঝে মাঝে শুধু তিলকরামের আওয়াজ শোনা গেল। গরু দুটোকে ধমকাচ্ছে।

এক সময় গরুর গাড়ি রতনগড়ে পৌঁছাল।

দূর থেকেই দেখা গেল দীঘির পাড়ে বিনতা আর তার স্বামী, মানে কুমুদের দিদি আর জামাইবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

কুমুদ নেমে তাঁদের প্রণাম করল।

সেদিন আর বেশী কথা হল না।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে কুমুদ শুতে গেল।

দোতলার এই কোণের ঘরেই বরাবর তার শোবার ব্যবস্থা হয়।

বেশ বড় ঘর, উঁচু খাট। বিরাট আকারের কারুকার্য করা একটা আলমারি।

কুমুদ শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝ রাতে তক্ষকের আওয়াজে একবার শুধু তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কুমুদ জানে বাইরের বটগাছের তলায় এক জোড়া তক্ষক থাকে।

প্রতিবারই সে এদের ডাক শোনে।

যখন কুমুদের ঘুম ভাঙল, তখন বেলা হয়েছে।

জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে।

বাইরে পাখির ডাক। গরুর হাম্বারবও শোনা যাচ্ছে।

কুমুদ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

দরজার গোড়ায় দিদি দাঁড়িয়ে।

কুমুদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসল।

কি, বাবুর ঘুম ভাঙল? তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নাও। বেলা হয়েছে।

কুমুদের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, নেমে দীঘির জলে মুখ হাত ধোবে, কিন্তু বাইরে বেরিয়েই দেখল, বারান্দার এক কোণে বালতিতে জল। তার পাশে সাবান আর তোয়ালে।

মুখ হাত ধুয়ে কুমুদ নীচে নেমে এল।

NOT FOR SALE

মাঝখানে উঠান। উঠান পার হয়ে রান্নাঘর। তার পাশেই খাবার ঘর। দুটোই সাইজে বিরাট।

কুমুদ দিদির কাছেই শুনেছে, আগে যখন জমিদারি ছিল, তখন খুব ঘটা করে অন্নপূর্ণা পূজা হত। গাঁয়ের লোক ঝেঁটিয়ে আসত নিমন্ত্রণ খেতে।

ওই রান্নাঘরে রান্না হত, আর উঠানে সবাই খেতে বসত। কেবল যাঁরা একটু কেষ্ট বিষ্টু, গাঁয়ের মোড়ল, থানার দারোগা, ডাক্তার তাঁরা বসতেন খাবার ঘরে।

শহরে কুমুদ সকালে এক কাপ চা খেত। এখানে চায়ের বদলে এল গরম দুধ। তার সঙ্গে বাড়ির তৈরি সন্দেশ, নারকেলের নাৰ আর গজা।

কুমুদ আর তুলসী পাশাপাশি খেতে বসেছিল।

কুমুদ তার দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, স্নান করব কিন্তু পদ্মবিলে। অনেকদিন জলে নামতে পারি নি।

তুলসী হাসল। ঠিক আছে, তার আগে চল গ্রামটা একবার ঘুরে আসি।

দুজনে বের হল।

যাবার সময় দিদি বলল, তাড়াতাড়ি ফিরবে। কুমুদের ঠিক সময়ে স্নান খাওয়া করতে হবে। মা চিঠিতে লিখে দিয়েছে।

দুজনের কারও সে কথা কানে গেল বলে মনে হল না।

একেবারে গেটের কাছে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা।

জামাইবাবু বেড়িয়ে ফিরছে। হাতে মোটা লাঠি।

কুমুদ জানে এটা তার বহুদিনের অভ্যাস।

খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ে। মাইল তিন চার ঘুরে বাড়ি ফেরে।

এখন আর জমিদারি নেই, কিন্তু যেটুকু জমি পেয়েছে, তাও নিতান্ত কম নয়। সে জমিতে চাষবাস হয়। জামাইবাবু নিজে দেখাশোনা করে।

বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ দিয়ে দুজনে এগোল।

নিবিড় বাঁশবন। দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

ঝিঁঝি ডাকছে। দু একটা অচেনা পাখির কিচির-মিচির।

বাঁশবন পার হয়ে কুমোরপাড়া। সার সার কুঁড়ে। মাটির দেয়াল। খড়ের চাল।

পূজার সময় এরা প্রতিমা তৈরি করে। হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ। গ্রামে বোধহয় আরও বেশী। বড় বড় পূজা ছাড়াও মনসা, ওলাইচণ্ডী নানারকমের পূজা হয়।

NOT FOR SALE

অন্য সময়ে এই কুমোররা হাঁড়ি, কলসি, কুঁজো, সরা এইসব গড়ে।

কুমুদের খুব আশ্চর্য লাগল।

শহর রোজ বদলায়। নতুন বাড়ি, নতুন রাস্তা—এ ধরনের পরিবর্তন শহরে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার দেখা যায়।

গ্রাম কিন্তু বিশেষ বদলায় না। এর আগের বার এসে কুমুদ যেমন দেখেছে, ঠিক তেমনই আছে। এমনকি, কুঁড়ে ঘরগুলোর যেখানে যেখানে মাটি ধসে গেছে, যে জায়গায় খড় সরে গেছে, ঠিক একরকম রয়েছে। কোন পরিবর্তন হয়নি।

কুমোরপাড়া ছাড়িয়ে আর কিছুদূর গিয়েই কুমুদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনেকটা জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ধারে ধারে রাংচিতার গাছ।

মাঝখানে সাদা রঙের একটা মন্দির।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করল—

হ্যাঁরে তুলসী, এ মন্দির তো আগে দেখি নি। নতুন হয়েছে বুঝি?

তুলসী মাথা নাড়ল।

না, না। নতুন হবে কেন? কত বছরের পুরোনো মন্দির তার ঠিক আছে? আগে জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, বিরাট একটা পাকুড় গাছের আড়ালে। চারদিকে ঘন জঙ্গল। লোকে ভয়ে কেউ এদিকে আসত না।

জামাইবাবু বুঝি এর সংস্কার করেছেন?

না, বাবা লেখালেখি করেছে। দেশের যত পুরোনো মন্দির, মসজিদ, স্মৃতিস্তম্ভ মানে সবরকম পুরাকীর্তির দেখাশোনা সরকার করে। সে রকম একটা আইনও আছে। খবর পেয়ে দু তিনজন পণ্ডিত লোক এসে মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখলেন। মূর্তি দুটোর ফটো তুললেন, তারপর লোকজন এসে চারদিক পরিষ্কার করল। মন্দিরের সংস্কার করল।

দুটো মূর্তি আছে মন্দিরে? কিসের মূর্তি?

সেটা কেউ বলতে পারল না। পণ্ডিতেরা আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা বললেন, ঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাঁরা দুটো মূর্তিরই ফটো তুলে নিয়েছেন। এ বিষয়ে গবেষণা করে জানাবেন। মুশকিল হয়েছে, দুটো মূর্তিরই মাথা নেই।

মাথা নেই?

NOT FOR SALE

না। দুটো মূর্তিই গলা থেকে শুরু হয়েছে। তবে দেখে মনে হয় কেউ ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে মুণ্ড দুটো কেটে নিয়ে গেছে।

কুমুদ আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। বলল, চল, একবার মন্দিরের ভিতরে যাই। অসুবিধা নেই তো?

না, না। অসুবিধা কিসের? চল।

দুজনে বাঁশের ফটক খুলে ভিতরে ঢুকল।

মন্দিরের গায়ে একটা পাথরের ফলক।

সরকার থেকে লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে একটা নম্বর লেখা। তলায় মন্দিরের বয়স প্রায় এক হাজার বছর বলে অনুমান করা হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে দুজনে ওপরে উঠল।

মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল।

তুলসী হাত দিয়ে ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

উঁকি দিয়ে দেখেই কুমুদ অবাক হয়ে গেল।

মন্দিরগর্ভ অন্ধকার।

কিন্তু মুণ্ডহীন মূর্তি দুটো থেকে সোনালী আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাতেই সবকিছু অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

একটা মূর্তি পদ্মের ওপর আসীন। অন্যটা অদ্ভুত এক জানোয়ারের ওপর বসে আছে। কুমুদ প্রথমে ভেবেছিল, বাহন পেঁচা, কিন্তু ভাল করে দেখে বুঝতে পারল, না পেঁচা নয়, চারটে পা রয়েছে। আবার ল্যাজের মতন কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

আবার বেড়ালও নয়। কারণ দুপাশে ডানার অস্পষ্ট আভাস।

তুলসী বলল, দেখছ কুমুমামা, মূর্তি দুটো থেকে কিরকম জেল্লা বের হচ্ছে? পণ্ডিতরা বললেন, যেমন অষ্টধাতুর মূর্তি হয়, এ মূর্তি তেমনই দ্বাদশ ধাতু দিয়ে তৈরি। বাকী চারটে ধাতু যে কি, কেউ বলতে পারলেন না। সেই চারটে ধাতুর জন্যই এই রকম জ্যোতি বের হয়।

কুমুদ মন্দির থেকে নেমে এল।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তুলসী পাশে এসে দাঁড়াল।

কুমুদ প্রশ্ন করল, এ মন্দিরে পূজা হয় না?

না। মুণ্ডহীন বিগ্রহের পূজা হবে কি করে? তবে দূর দূর গাঁ থেকে লোকেরা দেখতে আসে।

দুজনে বাঁশের ফটক পার হয়ে এপারে এল।

NOT FOR SALE

বিরাট দীঘিটা মন্দিরের পাশেই। পদ্মদীঘি। প্রায় নদীর মতন।

হঠাৎ তুলসী চিৎকার করে উঠল।

কুমুমামা, সাবধান!

কুমুদ একটু অন্যমনস্ক ছিল। তুলসীর চিৎকার শুনে লাফিয়ে উঠল।

তার গোড়ায়, একেবারে কুমুদের পা ঘেঁষে একটা কুচকুচে কালো সাপ। ল্যাজে ভর দিয়ে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। প্রসারিত ফণার ওপর যেন পদ্মের ছাপ।

তুলসী কুমুদকে ঠেলে একপাশে নিয়ে এল।

সাপটা মাটিতে বার দুয়েক ছোবল মেরে সরসর করে কেয়াঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

সাপটা চলে যেতে তুলসী বলল।

তোমার খুব ফাঁড়া গেল কুমুমামা। পদ্মগোখরো সাপ। এক ছোবলেই সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

কুমুদেরও বুকের ভিতর টিপ টিপ করছিল। ঘামের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল কপালে।

একটু শান্ত হতে বলল, এসব বিষাক্ত সাপ গাঁয়ের লোকে মেরে ফেলে না কেন?

তুলসী জিভ কামড়ে বলল, এসব বাস্তু সাপ। আগে এই পদ্মগোখরো আর তার জোড়া মন্দিরের মধ্যে ছিল। মন্দির পরিষ্কার হয়ে যেতে এই কেয়াঝোপে বাসা বেঁধেছে। গাঁয়ের লোকেরা কেউটে, শঙ্খচূড়, লাউডগা এসব সাপ মারে, কিন্তু গোখরো নয়। চল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

দুজনে ফেরার পথ ধরল।

পথে কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হল। তারা হাটে চলেছে।

তুলসীকে দেখে হাতজোড় করে বলল।

নমস্কার দাদাবাবু? বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?

কুমুদ বুঝতে পারল, জমিদারি গেছে বটে, কিন্তু সম্ভ্রমটুকু এখনও আছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে তুলসী বলল।

কুমুমামা, একটা কথা।

কি রে?

পদ্মগোখরোর কথা যেন মাকে ব'ল না।

বলব না?

NOT FOR SALE

উহুঁ, তাহলে বাইরে বেরোনো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তোমারও, আমারও।

তুলসীর বলার ভঙ্গী দেখে কুমুদ হেসে ফেলল।

ঠিক আছে, বলব না।

দুপুরবেলা সবাই একসঙ্গে খেতে বসল।

জামাইবাবু, কুমুদ আর তুলসী। পাশাপাশি।

কেবল দিদি বাদ।

দিদি পরিবেশন করল।

জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করল।

আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলে কুমুদ?

কুমুদ মন্দিরের কথা বলল।

জামাইবাবু ধীর গলায় বললেন, আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ওটা ধর্মরাজের মন্দির। এত সাপের উপদ্রব, আর চারপাশে গভীর জঙ্গল ছিল যে আমরা মন্দিরের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারতাম না।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, ধর্মরাজের মন্দির? কিন্তু একজোড়া বিগ্রহ রয়েছে যে?

জোড়া বিগ্রহের খবর তখন আমরা জানতাম না। ধর্মরাজ মানে যমরাজাও হয়, আবার যুধিষ্ঠিরও হতে পারে। পাণ্ডবদের মূর্তি কোথাও পূজা হয় বলে শুনি নি, তবে যমরাজের মন্দির বর্ধমানে অনেক জায়গায় আছে।

যাঁরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন, তাঁরা কি বলেন?

তাঁরাও তো ঠিকমত কিছু বলতে পারছেন না। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালিখি হয়েছে। তাঁদের ধারণা মন্দিরটি হাজার বছরের পুরানো, কিন্তু আমার মনে হয় এর বয়স আরও বেশী। তাঁরা স্বীকার করেছেন, মূর্তি দুটির মধ্যে বৌদ্ধযুগের ছাপ আছে।'

এবার তুলসী প্রশ্ন করল।

ওই যে মূর্তিগুলোর জেল্লা?

জামাইবাবু বলল, ও জেল্লার কারণ কেউ বার করতে পারে নি। মনে হয় মূর্তি দুটো কোন রকম লুমিনাস মেটাল দিয়ে তৈরি।

কি দিয়ে তৈরি?

বুঝতে না পেরে তুলসী জিজ্ঞাসা করল।

মানে এমন ধাতু যা থেকে জেল্লা বের হয়, অবশ্য এ বিষয়ে ঠিক কিছুই বলা যায় না। গত বছর আমেরিকা থেকে কয়েকজন ট্যুরিস্ট এসেছিলেন,

NOT FOR SALE

তাঁরা অনেক ফটো নিয়ে গেছেন। ইচ্ছা ছিল, মূর্তির গা থেকে কিছুটা চেঁছে নিয়ে যাবেন, কি ধাতু গবেষণার জন্য, কিন্তু সেটা করতে আমি দিই নি।

এবার কুমুদ জিজ্ঞাসা করল।

দুটো মূর্তিরই মাথা নেই কেন?

জামাইবাবু কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল।

ওটা অবশ্য বোঝা দায়। আমাদের দেশে মুসলমান আর বর্গীরা অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। মন্দির ভেঙে দিয়েছে, বিগ্রহ চূর্ণ করেছে মোগল আর পাঠান। আর দামী বিগ্রহ বর্গীরা আহরণ করে নিয়ে গেছে। সেই সময় হয়তো বিগ্রহের মুণ্ডুদুটো গেছে।

এতক্ষণ দিদি বসে বসে শুনছিল। জামাইবাবু থামতেই বলল, তোমাদের মন্দির নিয়ে গবেষণাটা খাওয়ার পর করলে হয় না। সব যে পাতে পড়ে রয়েছে।

আলোচনা থামিয়ে সবাই আহারে মন দিল।

খাওয়াদাওয়ার পর কুমুদ আর তুলসী বাইরে ঝাঁকড়া বটগাছ তলায় গিয়ে বসল। রোদ আছে, কিন্তু তেজ কম। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

কুমুদ বলল, তুলসী, জামাইবাবুর একটা লাইব্রেরী ছিল না?

ছিল বলছ কেন, এখনও তো আছে। নীচের কোণের ঘরটা বইয়ে ঠাস বোঝাই। বাবা ইদানীং আবার চাষবাসের সব বই কিনেছে।

কুমুদ উঠে দাঁড়াল।

জামাইবাবু একটু পরেই সাইকেলে বেরিয়ে যাবে, তাই না?

হ্যাঁ, মাঠে না গেলে চাষীরা বড্ড ফাঁকি দেয়।

জামাইবাবু বেরিয়ে গেলে একবার লাইব্রেরিতে ঢুকব।

কেন, সেখানে কি?

দিদির কাছে শুনলাম, রতনগড় গ্রামের ওপর একটা বই আছে। বইটা হাতড়ে দেখব যদি মন্দিরের রহস্য সম্বন্ধে কিছু থাকে।

তুলসী হাসল, নিশ্চয় কিছু নেই।

কেন?

থাকলে বাবা পড়ে ফেলত। বাবার কাছ থেকেই তুমি জানতে পারতে।

কুমুদ স্বীকার করল।

তা অবশ্য সত্যি কথা। যাহোক, নিজে একবার পড়ে না হয় দেখি।

তুলসী বলল, কুমুমামা, মনে হচ্ছে স্কন্ধকাটা মূর্তি দুটোর ভূত তোমার ঘাড়ে ভীষণভাবে চেপেছে। তুমি কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছ না।

NOT FOR SALE

একেবারে কোণের ঘরে লাইব্রেরী। নীচের তলায়।

খুব যে সাজানো গোছানো তা নয়। অনেক বই মেঝের ওপর স্তূপীকৃত।

সাদা রংয়ের ছোট একটা কাঠের মই। ওপর থেকে বই পাড়বার সুবিধার জন্য। তুলসী আঙুল দিয়ে দেখাল।

ওই যে বাঁদিকে লাল রঙের বই। ওটা পাড়।

কুমুদ বইটা পাড়ল।

নতুন করে মলাট দেওয়া হয়েছে। ভিতরের পাতা কিন্তু জরাজীর্ণ।

খুব সন্তর্পণে কুমুদ পাতা ওল্টাতে লাগল।

বইটার নাম, রত্নগড়ের ইতিহাস। রত্নগড় লোকের মুখে মুখে রতনগড় হয়েছে। রতনগড়ের পশ্চিমদিকে মাটি আর পাথরের তৈরী একটা গড় ছিল। সে গড় আজ নিশ্চিহ্ন।

বইতে লেখা, একসময়ে পদ্মবিলের সঙ্গে বিদ্যাপতি নদীর যোগাযোগ ছিল। পালতোলা নৌকা চলাচল করত। এখান থেকে নৌকা যেত তাম্রলিপ্ত বন্দরে।

সেই সময় এক শ্রেষ্ঠী একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

নিবিষ্টচিত্তে পড়তে পড়তে কুমুদ চেঁচিয়ে উঠল, সর্বনাশ।

কি হল?

এর পরে আর কোন পাতা নেই।

তুলসী হাসতে হাসতে বলল, তা তো জানি। পাতা থাকলে ওই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেত। বাবা বইটা ওই অবস্থায় পেয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে।

তা হলে কি হবে?

কি আর হবে। পুরোনো এক মন্দির সম্বন্ধে জেনেই বা কি হবে। সরকার থেকে তো গবেষণা করছে। ঠিক সময়ে তাদের গবেষণার ফল জানতেই পারব।

কুমুদ চুপ করে রইল। কিছু বলল না।

তুলসী বলল, কুমুমামা, মন্দিরের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও, আর একটা জবর খবর তোমায় দেব।

কি?

দেখ, মাকে আবার কিছু বলো না।

বলব না, তুই বল।

NOT FOR SALE

চল আমাদের ঘরে যাই। লাইব্রেরীর ভ্যাপসা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দুজনে শোবার ঘরে চলে এল।

কি বলবি, বল এইবার।

কুমুদ বিছানায় শুয়ে পড়ল। তুলসী তার পাশে বসল।

শোন, ভোর সাড়ে তিনটে চারটের সময় উঠতে পারবে?

কেন, অত ভোরে উঠে কি হবে?

পারবে কি না বল না?

না পারবার কি আছে। পরীক্ষার আগে আমি তো রাত দুটোর সময় উঠে পড়তাম।

ঠিক আছে। কাল ভোরে উঠে দুজনে বেরিয়ে পড়ব।

পদ্মবিলের পশ্চিম পাড়ে চলে যাব। আমার কাছে ছোট জাল আছে। কি বিরাট সব মাছ আছে তোমাকে কি বলব কুমুমামা। রুই, কাতলা, কালবোশ।

কিন্তু বাড়িতে যে ভাববে?

আরে, বেলা সাতটার আগে বাড়ি ফিরে আসব। ভাগ্য যদি ভাল হয়, সঙ্গে মাছ আনতে পারি তাহলে কিছুই বলবে না।

ঠিক আছে। আমি রাজী।

দুজনে একঘরে শোয়, কাজেই কোন অসুবিধা হল না।

পরের দিন অন্ধকার থাকতে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

কুমুদের পরনে হাফ শার্ট আর প্যাণ্ট। তুলসীরও হাফ শার্ট কিন্তু ধুতি মালকোচা দেওয়া। রাস্তা ছেড়ে দুজনে জঙ্গলের পথ ধরল।

তখনও ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। গাছের তলা দিয়ে দুজনে যাবার সময় পাখিরা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উড়তে লাগল।

একটু দূরে দূরে বেশ কয়েক জোড়া জ্বলন্ত চোখ কুমুদ আর তুলসীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, ওগুলো কি?

তুলসী বলল, শেয়াল আর কি। প্রহরে প্রহরে চেঁচায়। আমাদের দেখে বোধহয় আজ চেঁচাতে ভুলে গেছে।

রাংচিতা আর ভেরেণ্ডা ঝোপের মাঝখান দিয়ে দুজনে পদ্মবিলের ধারে এসে দাঁড়াল।

পদ্মবিল যেন বিরাট নদীর মতন। কালো কুচকুচে জল। ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে। মাঝে মাঝে শরগাছের আগা উঁচু হয়ে রয়েছে।

NOT FOR SALE

এতক্ষণ পরে কুমুদের খেয়াল হল।

তুলসী, আমরা বিলের পশ্চিম পাড়ে যাব কি করে?

তুলসী এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীচু হয়ে পাশের বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল, তারপর টানতে টানতে একটা তালগাছের ডোঙা বের করে নিয়ে এল।

কি কুমুমামা, চড়তে পারবে? দেখ, ভয় করবে না তো?

অবশ্য তালগাছের ডোঙা খুব নিরাপদ বাহন এমন মনে হল না, বিশেষ কর এই বিশাল জলরাশির পক্ষে।

তবু কুমুদ ভয় পাবার ছেলে নয়। সে যথেষ্ট ডানপিটে। গায়ে শক্তিও আছে।

হেসে বলল, নাও আর দেরি নয়। ডোঙা জলে ভাসাও।

ডোঙা নামিয়ে কুমুদ আগে উঠল, তারপর তুলসী।

ডোঙার খোলের মধ্যে গোটানো ছোট একটা জাল। সেটা তুলে তুলসী কুমুদের হাতে দিয়ে বলল, এখন এটা ধরে থাক কুমুমামা, আমি ঠিক সময়ে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেব।

একটা বাঁশের টুকরো দিয়ে জল কেটে কেটে তুলসী ডোঙা এগিয়ে নিয়ে চলল। কুমুদ শক্ত হাতে ডোঙার দুটো ধার আঁকড়ে রইল।

আকাশে মেঘ করেছে। অসময়ের কালো মেঘ। সেই কালো মেঘের ছায়া পদ্মবিলের ওপর। চারপাশের ঘন গাছপালার জন্য সব যেন ঝুপসী অন্ধকার।

তুলসী ডোঙাটা ধারে নিয়ে আসছে।

এখানে জলের মধ্যে প্রচুর পানা আর ঝাঁঝি। সবুজ হয়ে আছে জল।

জালটা কুমুদের হাত থেকে নিয়ে তুলসী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কুমুদের দিকে ফিরে বলল, সাবধান কুমুমামা, ডোঙাটা এবার খুব দুলবে। তুমি শক্ত হয়ে বসে থাক।

জালটা ছোড়ার মুখেই বাধা।

ঝোপের ফাঁক দিয়ে তীব্র আলো জলের ওপর এসে পড়ল। সেই সঙ্গে শোনা গেল ধক ধক শব্দ।

কুমুদ ভ্রু কোঁচকাল।

কিসের আলো?

তুলসী কোন উত্তর না দিয়ে জালটা গুটিয়ে ডোঙার খোলের মধ্যে আবার রেখে দিল।

NOT FOR SALE

কালো আকাশের গায়ে মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

মনে হ'ল তার নীচে থেকেই যেন আলোটা আসছে।

কি ব্যাপার কুমুমামা, দেখতে হচ্ছে।

তুলসী ডোঙাটা আস্তে আস্তে ডাঙ্গার কাছ বরাবর নিয়ে এল।

পাড়ে কচু বন। বুনো সব লতা কচু ঝোপের ওপর বিছানো রয়েছে।

তুলসী পাশ দিয়ে ডোঙা একেবারে ধারে এনে বলল, কুমুমামা লাফিয়ে নেমে পড়।

কুমুদ লাফাল।

তারপর তুলসী নেমে ডোঙাটা বাঁশবনের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সাবধানে নামল।

একটু এগোতেই আলোটা নিভে গেল, কিন্তু ধকধক শব্দ বেশ শোনা গেল।

দুজনে গাছের ফাঁক দিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল।

একেবারে কাছাকাছি গিয়ে কুমুদ বসে পড়ল।

তার দেখাদেখি তুলসীও বসল।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার একটু তরল হয়ে আসছে।

একটা লরি দাঁড়িয়ে। একেবারে মন্দিরের গা ঘেঁষে।

সেই লরির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লরির হেডলাইট দুটো আগে জ্বলছিল, এখন নিভিয়ে দিয়েছে।

তুলসী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল।

কি ব্যাপার?

কুমুদ এক হাত দিয়ে তুলসীর মুখ টিপে ধরল।

অর্থাৎ, এখন একদম কথা ব'ল না।

হঠাৎ দেখা গেল মন্দিরের ভিতর থেকে দুটো লোক কি একটা বয়ে নিয়ে আসছে।

একটু আগে কুমুদের সাবধান বাণী ভুলে গিয়ে তুলসী চেঁচিয়ে উঠল।

ওরা মূর্তি নিয়ে পালাচ্ছে।

ভাগ্য ভাল তুলসীর। ঠিক সেই সময় একটা হুতোম প্যাঁচা গাছের ওর থেকে গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, হুম্, হুম্, হুম্।

তুলসীর গলার স্বর সেই আওয়াজে চাপা পড়ে গেল।

লোক দুটো বয়ে আনা মূর্তিটা লরির ওপর চাপিয়ে দিল।

NOT FOR SALE

তারপর দুজনে লরিতে উঠল।

একজন চালকের আসনে। আর একজন তার পাশে।

কুমুদ বুঝতে পারল এবার লরি ছাড়বে।

সে তুলসীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলল।

ওরা পালাচ্ছে। চল, আমরা লরিতে উঠে পড়ি।

প্রথমে কুমুদ, তারপর তুলসী লরির পিছন দিয়ে ওপরে উঠে পড়ল।

ততক্ষণে লরি চলতে শুরু করেছে।

রাস্তা নেই, কেবল ছোট ছোট ঝোপ, তাই লরিটা একটু আস্তে আস্তে চলছে।

কুমুদ আর তুলসী লরির ওপর উঠে দেখল, লরিভর্তি ডাব, তরিতরকারি আর দালদার টিন।

বুঝতে পারল, মূর্তিদুটো এই সব জিনিসের তলায় কোথাও রাখা আছে।

একটা মূর্তি চুরি করতে তো কুমুদ আর তুলসী দেখেইছে। আর একটা মূর্তিও নিশ্চয় আগে সরিয়েছে।

চুরি করতে যখন এসেছে তখন কি আর একটা মূর্তি ফেলে যাবে।

জঙ্গল ছেড়ে রাস্তার ওপর আসতেই লরির গতি বাড়ল।

একটু একটু করে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটছে।

রাস্তায় শাকসবজি মাথায় দু-একজন চাষীকে হাটের দিকে যেতে দেখা গেল। লরির চালক পিছন দিকে দেখলেই এদের দেখতে পাবে।

কুমুদ তুলসীকে ইশারা করল।

লরির ওপর একটা ত্রিপল ঢাকা দেওয়া ছিল।

কুমুদ ত্রিপলের এক কোণ তুলে তার তলায় চলে গেল।

তুলসীও তাই করল।

এবার লরি তীরবেগে ছুটছে।

কুমুদ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল।

খবরের কাগজে সে অনেক পড়েছে। আজকাল মূর্তি চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। অনেকেই মূর্তি চুরি করে বিদেশে চালান দিচ্ছে।

বিরাট আন্তর্জাতিক দলও রয়েছে।

ভগবান জানেন, এরাও সে রকম কোন দলের লোক কিনা।

খুব সম্ভব এরা মূর্তিগুলো কোনোখানে রাখবে। তারপর অন্য কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

NOT FOR SALE

সেই জায়গাটা দেখে রাখতে পারলেই কাজ হবে।

কাছাকাছি থানায় গিয়ে খবর দিয়ে দেবে।

একটু পরেই লরি থামল।

দু পাশে খেত। বসতির কোন লক্ষণ নেই। এখানে যে লরি থামল!

খুব বাজখাঁই একটা গলার স্বর শোনা গেল।

ভজু, নাম, কিছু খেয়ে নিই। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।

আর একজন কোন কথা বলল না। তবে বোঝা গেল, সে লাফিয়ে লরি থেকে নামল।

সম্ভবতঃ রাস্তার এদিকে চায়ের দোকান কিংবা সরাইখানা আছে। ওদিকে সরে গিয়ে দেখতে কুমুদের সাহস হল না।

প্রায় আধ ঘন্টা লরি দাঁড়িয়ে রইল।

বেলা বাড়ছে। অন্ধকার থাকতে কুমুদ আর তুলসী বেরিয়েছে। এত বেলা হল এখনও পেটে কিছু পড়ল না। কখন এ যাত্রার শেষ হবে কে জানে!

আবার চলা শুরু।

কুমুদ দেখল, অনেক দূরে দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি লরি বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে যাচ্ছে।

বিকালের দিকে লরি থামল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বিরাট একটা গুদাম। ইঁটের দেয়াল। টিনের ছাদ।

সামনের দিক থেকে লোকেরা নামল।

আওয়াজে বোঝা গেল, ওরা গুদামের তালা খুলছে।

এই সুযোগ। কুমুদ আর তুলসী নিঃশব্দে নেমে দাঁড়াল।

ভাল করে জায়গাটা চিনে নিয়ে পুলিসকে খবর দিতে হবে।

ওঃ!

দুজনেই ভীষণ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। দুজনেই জ্ঞান হারাল।

কুমুদের জ্ঞান হতে দেখল, অন্ধকার একটা ঘরে খাটিয়ার ওপর সে শুয়ে আছে।

আশা করেছিল, ধারে কাছে তুলসীকে দেখতে পাবে, কিন্তু এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে তুলসীকে কোথাও দেখতে পেল না।

মাথা ঘোরাতে গিয়েই বুঝতে পারল মাথায় অসহ্য ব্যথা। মনে পড়ে গেল, কেউ ভারী কিছু দিয়ে তার মাথার পিছনে আঘাত করেছিল।

NOT FOR SALE

তুলসী পাশেই ছিল। তাকেও নিশ্চয় একইভাবে ঘায়েল করা হয়েছিল। কিন্তু তুলসী কোথায় গেল।

ভাল করে কুমুদ ঘরটা লক্ষ্য করল।

আগাগোড়া পাকা গাঁথুনি। দেয়াল ছাদ দুই-ই ইঁটের। একটা মাত্র দরজা। খুব মজবুত কাঠের ভারী পাল্লা।

একটাও জানলা নেই। তাতেই মনে হ'ল, এটা গুদাম ঘর।

কিন্তু, এখন একেবারে খালি।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হতেই কুমুদ চমকে উঠল।

দীর্ঘ, সবল চেহারার একটা লোক ঢুকল। এক হাতে একটা রেকাবি, অন্য হাতে চাবুক।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের কিছুটা দেখা গেল।

প্রচণ্ড রোদে সব কিছু ঝলমল করছে।

সামনে একটা কাঁঠাল গাছ। তার গুঁড়িতে একটা ছাগল বাঁধা।

ঘন জঙ্গল। জঙ্গল ভেদ করে পিছনের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

খাটিয়ার তলা থেকে টুল বের করে লোকটা বসল।

কাছে আসতে লোকটার বীভৎস চেহারা আরও পরিষ্কার দেখা গেল।

গালে কাস্তের মতন বাঁকা একটা কাটা দাগ। গালপাট্টা গালের অর্ধেকটা নেমেছে।

কি রে, নাম কি তোর?

কুমুদের মনে হ'ল ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়ল।

কি, কথা কানে যাচ্ছে না? না, চাবুক পিঠে না পড়লে মুখ খুলবে না?

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বাতাসে চাবুকটা আছড়াল।

সাপের মতন চাবুকটা হিস হিস শব্দ করে উঠল।

ক্ষীণ কণ্ঠে কুমুদ বলল, কুমুদ লাহিড়ী।

হুঁ, লরির পিছনে উঠেছিলি কোন্ মতলবে?

কোন মতলব নয়। দেখলাম তরকারি বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দু'জনে উঠে পড়লাম।

উঠে একেবারে এতটা পথে চলে এলি?

লরি না থামলে নামব কি করে? তাছাড়া অন্য কারণও ছিল।

কি কারণ?

আমরা আর বাড়িতে ফিরতে চাই নি।

NOT FOR SALE

হঠাৎ বৈরাগ্য। কি ব্যাপার?

আমরা দু'জনেই পরীক্ষায় ফেল করেছি, তাই বাড়িতে আমাদের খুব হেনস্তা চলেছে।

ও ছোকরা তোর কে হয়?

আমরা মামা ভাগ্নে। আমি মামা।

বা, বা, মামা ভাগ্নে, একেবারে মানিকজোড়।

লোকটা কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে কুমুদকে দেখল, তারপর রেকাবিটা খাটিয়ার ওপর রেখে দিয়ে বলল, নে, খেয়ে নে।

কুমুদ আড়চোখে চেয়ে দেখল।

খানচারেক রুটি আর একটু ডাল।

সকাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। এই-ই অমৃত।

কিন্তু তার আগে একটু জল দরকার।

লোকটা দরজার কাছে গিয়ে চেঁচাল।

লছমি, এ লছমি, এক লোটা জল নিয়ে আয়।

একটু পরে বছর দশেকের একটি মেয়ে এক ঘটি জল এনে মেঝের ওপর রাখল।

ঠিক আছে, যা।

লোকটা জলের ঘটিটা কুমুদের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলল।

নে, খেয়ে নে। পরে আবার আসব।

লোকটা যখন দরজার কাছে গেছে, তখন কুমুদ বলল, শুনুন।

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

আমার ভাগ্নে তুলসী কোথায়?

খতম হয়ে গেছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ করার আওয়াজও কুমুদের কানে গেল।

রুটি ছিঁড়ে কুমুদ ডালে মাখিয়ে সবে মুখে দিতে যাচ্ছিল, লোকটার কথা কানে যেতেই হাত থেকে রুটির টুকরো মাটিতে পড়ে গেল।

তুলসী খতম!

যখন কুমুদকে আঘাত করে তখন নিশ্চয় তুলসীকেও আঘাত করেছিল।

হয়তো তুলসীর আঘাতটা একটু জোরেই হয়েছিল।

NOT FOR SALE

কিংবা এও হতে পারে, পরে তুলসীর কাছ থেকে কথা বের করার জন্য এরা সম্ভবত মারধোর করেছে।

নির্যাতনের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়ে গিয়ে থাকবে।

তুলসীর যদি কিছু হয়ে থাকে, তার জন্য কুমুদ সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

মূর্তিচোরদের পিছনে যাবার জন্য কুমুদই তাকে উৎসাহিত করেছিল।

বসে বসে কুমুদ চিন্তা করতে লাগল।

এমনও হতে পারে লোকটা মিথ্যা কথা বলে গেল। তুলসীর কিছুই হয়নি। তুলসী হয়তো আর একটা ঘরে কুমুদের মতনই বন্দী।

কুমুদ লোকটাকে যে কথাগুলো বলেছে, সেগুলো সে তুলসীর কাছ থেকেও যাচাই করে নেবে।

যদি দু'জনে দু'রকম কথা বলে, তাহলেই সর্বনাশ।

দু'জনের ওপর অত্যাচার শুরু হবে।

আবার খুট করে দরজার শব্দ।

এবার দরজা খুলে যেতে লছমি ঘরে ঢুকল।

খাটিয়ার কাছে এসে বিরক্তকণ্ঠে বলল, একি, এখনও নাস্তা হয় নি। তাড়াতাড়ি নাও, আমি লোটা আর থালা নিয়ে যাব।

রুক্ষ, কর্কশ কণ্ঠস্বর। লছমি হিন্দুস্থানী হলেও বাংলাভাষা মন্দ বলে না।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা লছমি, অন্য ঘরে যে ছেলেটাকে আটকে রাখা হয়েছে, তার দেখাশোনা কি তুমিই করছ?

না, চাচাজী তাকে দেখছে। বড় বদমাইশ লেড়কা। চাবুক না খেলে মুখ খোলে না।

কুমুদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, তাহলে তুলসী বেঁচে আছে।

হয়তো নির্যাতিত হচ্ছে, কিন্তু প্রাণে মরে নি।

কুমুদ রুটি ডাল শেষ করল। নিঃশেষ করল জলের লোটা।

লছমিকে বলল, আমাকে আর এক ঘটি জল দিতে পার?

লছমি খিঁচিয়ে উঠল।

ও, নবাবপুত্তুর হুকুম করছে। আমি ওর কেনা বাঁদী, দশ লোটা জল এনে দেব।

কথা শেষ করেই লছমি ছোঁ মেরে থালা আর লোটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় তালা পড়ল।

NOT FOR SALE

কুমুদ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

ঘরের চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কোথাও একটু ফাঁক নেই। দরজায় কান পাতল।

মনে হ'ল কে যেন কাঠ কাটছে। কোন মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া গেল না। ছাগল ডাকছে। কাকের শব্দ।

কুমুদ আবার খাটিয়ায় ফিরে এল।

খড়ের বালিশ। তার ওপর মাথা রেখেই শুয়ে পড়ল।

একটু বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ বাইরে অনেকগুলো লোকের সম্মিলিত চিৎকারে চমকে উঠে বসল।

বাইরে ভীষণ হৈ-চৈ। অনেকগুলো লোক একসঙ্গে কথা বলছে বলে কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দরজায় কান পেতে কুমুদ শোনবার চেষ্টা করল।

কতকগুলো লোক ছুটোছুটি করছে। কাকে যেন গালাগালও দিচ্ছে।

দু'জন লোক ঠিক দরজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাদের কথা কুমুদ স্পষ্ট শুনতে পেল।

শয়তান গিরিধারীকে ঘায়েল করে পালিয়েছে।

সে কি? কি করে?

গিরিধারী জল দিতে এসেছিল। তার হাতে ছিল লোহা বাঁধানো লাঠি। শয়তানটা করেছে কি, আচমকা গিরিধারীর মুখের ওপর জল ছুঁড়ে দিয়ে, তার লাঠি দিয়েই তার মাথায় সজোরে মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়েছে।

আর কেউ পাহারায় ছিল না?

আর কে থাকবে। দরজা বন্ধ ছিল। শয়তানটা জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিতে গিরিধারী দরজা খুলে দেয়। তখন বলে খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। জল আনতে এই বিপত্তি।

কিন্তু পালাবে কোথায়? চারপাশে তো ঘন জঙ্গল। আমাদের তিন জন লোক খুঁজতে বেরিয়েছে।

কুমুদ বুঝতে পারল তুলসী পালিয়েছে। তুলসী যদি কোন রকমে পুলিসে খবর দিতে পারে, তাহলে পুরো দলটাই ধরা পড়ে যাবে।

কুমুদের নিশ্চিত ধারণা, ধারে কাছে অন্য গুদামে আরো অনেক চুরি করা মূর্তি আছে।

NOT FOR SALE

এ বিচ্ছুটা ঠিক আছে তো। তালাটা খোল। একবার দেখি।

কুমুদ বুঝতে পারল এখনই ওরা ঘরে ঢুকবে।

সে তাড়াতাড়ি খাটিয়ায় উঠে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল ঘুমের ভান করে।

দরজা খোলার শব্দ হ'ল। কুমুদ বুঝতে পারল লোকদুটো খাটিয়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

না, এটা ঘুমচ্ছে।

সাবধানের মার নেই। আর লছমিকে জল নিয়ে পাঠাব না।

রাতে এ বেটার খাওয়া বন্ধ। পেটে কিছু না পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।

লোকদুটো বেরিয়ে যেতে কুমুদ আবার উঠে পড়ল।

দু'দিকের দেয়ালের খুব ওপরে ছোট দুটো ফুটো। বোধহয় হাওয়া চলাচলের জন্য।

সে ফুটো দিয়ে পালানো তো দূরের কথা, কুমুদের একটা পা-ও গলবে না। পালাবার আশা দুরাশা।

কুমুদের ভয় হ'ল, এরা যদি তুলসীকে ধরতে পারে, তাহলে তাকে খতম করে দেবে। অচেনা জায়গা, তার ওপর চারদিকে জঙ্গল। তুলসীর পক্ষে এদের হাত থেকে বাঁচা প্রায় অসম্ভব।

খিদেয় কুমুদের পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সেই কতক্ষণ আগে ক'খানা রুটি আর ডাল খেয়েছিল। তারপর থেকে পেটে কিছু পড়েনি। এদের কথাবার্তায় যা মনে হ'ল, আর কিছু খেতেও দেবে না।

এতক্ষণ পরে কুমুদ আপসোস করতে আরম্ভ করল।

পরীক্ষার পর দিদির বাড়ি কাটাতে এসেছিল। দিব্যি ভাল খেয়েদেয়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে আনন্দে সময় কাটিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ঘাড়ে যে কি ভূত চাপল।

মূর্তিচোরের লরিতে উঠে বসার দুর্মতি কেন যে হ'ল।

এখন প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

তুলসী আবার নতুন বিপদ ডেকে আনল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে কুমুদ চুপচাপ বসে রইল।

বাইরে গোলমাল থেমে গেছে। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

শেয়ালের ডাক শুনে বোঝা গেল বাইরে অন্ধকার নেমেছে।

টর্চের আলো খাটিয়ার ওপর ফেলেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

NOT FOR SALE

আরে, এটা আবার গেল কোথায়?

কুমুদ বসে বসেই উত্তর দিল।

এই যে আমি এখানে।

উঠে দাঁড়া।

বড্ড খিদে পেয়েছে। দাঁড়াবার শক্তি নেই।

একটা লোক এগিয়ে এসে কুমুদের চুল ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল।

একেবারে জন্মের শোধ খাওয়াব তোকে।

আর একজন লোক দড়ি দিয়ে কুমুদকে পিছমোড়া করে বাঁধল, তারপর একটা রুমাল জোর করে তার মুখে গুঁজে দিল।

কুমুদের মনে হ'ল তার মুখ বুঝি ফেটে যাবে। অসহ্য যন্ত্রণায় দুটো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

একটা লোক তাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল।

উঠানের ওপর একটা লরি। কুমুদকে তার ওপর তুলে দিল।

এবারও লরি শাকসবজি বোঝাই। তলায় কি আছে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই। একটা বড় ত্রিপল দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে দিল।

কুমুদকে ঢাকা দেবার আগেই সে দেখতে পেয়েছিল, সামনে আর একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে।

গর্জন করে লরি দুটো ছাড়ল।

লরির ঝাঁকানিতে মনে হ'ল খুব উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে চলছে। মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাইও রয়েছে।

লরির শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথার টুকরোও কুমুদের কানে এল।

শয়তানটা যেন পাখি হয়ে উড়ে পালাল। চারপাশের জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কোথাও পাওয়া গেল না।

যদি সোজা কোন রকম ভগবতীপুর থানায় গিয়ে হাজির হতে পারে, তাহলেই সর্বনাশ। আমাদের আস্তানা দেখে গিয়েছে। দারোগাকে সঙ্গে করে এলেই একেবারে সব কটা বমালসুদ্ধ গ্রেপ্তার।

আরে সেই ভয় করেই তো সর্দার এখান থেকে সরে যাবার হুকুম দিয়েছে। পুলিস এলেও বোকা বনবে। উল্টে ছোকরাটাকেই ধমক লাগাবে।

ত্রিপল ফাঁক করে কুমুদ দেখল।

NOT FOR SALE

কালো আকাশ। 'দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। মনে হ'ল, একেবারে পাহাড়ের গা বেয়ে লরি চলছে।

একপাশে গাছপালা খুব উঁচুতে। কালো কালো পাথরের চাঙড়ও দেখা যাচ্ছে।

আবার কথাবার্তার আওয়াজ কানে এল।

এটাকে আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি কেন?

এটাকে রেখে গেলে এ তো পুলিসের কাছে সব বলে দেবে। দু'জনের কথা মিলে গেলে পুলিসের মনে সন্দেহ হবে। বুঝতে পারবে আমরা অন্য কোথাও সরে গেছি। চারদিক তোলপাড় করে খুঁজতে আরম্ভ করবে।

কিন্তু একে আমাদের নতুন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কি!

আরে দূর! সর্দার কি আর এত কাঁচা কাজ করবে। ছেলেটার হাত পা বাঁধা, মুখও বন্ধ করা হয়েছে। এখন পথে কোন নদীতে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। ব্যস ঝামেলা শেষ।

কথাগুলো কানে যেতেই কুমুদ শিউরে উঠল।

তাহলে এই ওদের মতলব।

মাঝপথে কোন নদীতে তাকে বিসর্জন দেবে।

বাঁচবার কি কোন উপায় নেই।

হাত পা বাঁধা। কুমুদ অতি কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে লরির একপাশে চলে এল। লরির পাল্লা দুটো লোহা দিয়ে আটকানো।

কুমুদ হাতের বাঁধন তার ওপর রেখে ঘষতে লাগল। যদি দড়ি কেটে যায়।

কিন্তু কিছুই হল না। দড়ি যথেষ্ট মজবুত।

নিরুপায় হয়ে কুমুদ গড়িয়ে গড়িয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল।

ঝাঁকানি দিয়ে লরিটা থামতেই কুমুদের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল।

বোধহয় কাছেই নদী। এবার তার ব্যবস্থা হবে।

এই প্রথম কুমুদের দু' চোখ জলে ভরে এল।

জীবনে খুব ইচ্ছা ছিল, হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে রসায়নে অনার্স নিয়ে কলেজে পড়বে। গতানুগতিক চাকরি করবে না। নাম করা কেমিস্ট হবে। মৃত্যুঞ্জয়ী ওষুধ আবিষ্কার করবে। সব বাসনার অবসান।

হাত পা বাঁধা না থাকলে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করত। এভাবে সাঁতার দেওয়া অসম্ভব। তার ওপর নিশ্চিন্ত হবার জন্য এরা হয়তো গলায় পাথর বেঁধে দেবে। জলে পড়া মাত্র টুপ করে ডুবে যাবে।

NOT FOR SALE

চোখ বুজে কুমুদ মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। মা আর বাবার মুখ বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ কুমুদ অপেক্ষা করল।

সে ভেবেছিল দুটো লোক লরিতে উঠে তার অসহায় দেহটা তুলে ছুঁড়ে কোন নদীতে ফেলে দেবে।

কিন্তু না, কেউ এল না।

একটু পরেই কুমুদের কানে হাসির শব্দ এল। মনে হ'ল লোকগুলো কিছু চিবুতে চিবুতে হাসছে।

আন্দাজ করল বোধহয় লোকগুলো খাবার জন্য নেমেছে। সম্ভবতঃ কোন দোকানে বসে খাচ্ছে, কিংবা হয়তো সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছিল।

কে একজন চেঁচাল, এই রাজু বোতলে করে ওই নদী থেকে জল নিয়ে আয়, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দে বোতল দে। এক বোতলে হবে না, দুটো বোতল দরকার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটানা ঝিঁঝির শব্দ। দূরে বন্য জন্তুর গর্জনও শোনা যাচ্ছে। কি জন্তু কুমুদ বুঝতে পারল না।

খাওয়ার কথা কানে যেতেই কুমুদের পেটের মধ্যে আবার মোচড় দিয়ে উঠল। মুখে কাপড় গোঁজা না থাকলে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠত।

একটু পরে লোকগুলো লরিতে এসে উঠল।

প্রথমে আগের লরিটা গর্জন করে ছাড়ল। তারপর পিছনেরটা।

কুমুদ যে লরিতে ছিল তার চালক আর সহকারী উচ্চকণ্ঠে গান শুরু করল। হিন্দুস্থানী গান। গানের একটা কথাও কুমুদ বুঝতে পারল না।

হঠাৎ গানের আওয়াজ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ শোনা গেল।

কুমুদ দু'বছর আগে মা বাবার সঙ্গে রাঁচী গিয়েছিল। সেখানে হুড্রু জলপ্রপাত দেখেছিল। অনেক ওপর থেকে পাথরের ধাপ বেয়ে বেয়ে জলের স্রোত নামছে। কি ভীষণ তার গর্জন।

এ শব্দও ঠিক সেইরকম। মনে হ'ল প্রবল বেগে জলের ধারা নামছে।

সহকারীর চিৎকার কানে এল।

এই, সামলে সামলে। কি করছিস?

প্রচণ্ড একটা আওয়াজ। লরিটা ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল। তারপরই হেলে পড়ল একদিকে।

মুহূর্তে জলের স্রোত লরির মধ্যে ঢুকল। কি প্রবল শক্তি জলের। খড়ের কুটোর মতন লরিটাকে টেনে নিয়ে গেল।

NOT FOR SALE

কুমুদ বুঝতে পারল লরি নদীগর্ভে ঢুকছে।

আবার কানফাটানো শব্দ। লোহার রেলিংয়ের সঙ্গে লরিটার ধাক্কা লাগল। লরির পিছনের অংশ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল।

২

গিরিধারীকে তারই লাঠিতে ঘায়েল করেই তুলসী ছুটে দরজার দিকে গেল।

দরজা খোলাই ছিল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একবার চারদিক দেখে নিল। না, ধারে কাছে কেউ নেই।

তুলসী তীরবেগে পুকুরের পাড় দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

কতবার কাঁটাগাছে দুটো পা ক্ষতবিক্ষত হ'ল। শক্ত বুনো লতায় পা আটকে মাটির ওপর ছিটকে পড়ল।

ধুলো ঝেড়ে উঠে আবার ছুটতে লাগল।

তুলসীর একমাত্র চিন্তা যেমন করে হোক এই সব দুশমনদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে। একবার যদি ধরা পড়ে তাহলে তুলসীর কি অবস্থা হবে, তা ভাবতেই শিউরে উঠল।

অনেকটা চলার পর তুলসী পাকা রাস্তার ওপর এসে পড়ল।

বুঝতে পারল রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ানো নিরাপদ হবে না। ওরা হয়তো লরিতে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

তুলসী রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল।

বিরাট গাছের সার। তলায় ছোট ছোট ঝোপ। নানা রঙের বুনো ফুল ফুটে রয়েছে।

কিছুটা এগিয়ে তুলসী দেখল জঙ্গল প্রায় দুর্ভেদ্য। সাপখোপ কিংবা কোন রকম জন্তুজানোয়ার থাকাও বিচিত্র নয়।

তুলসী ভাবল তার চেয়ে রাস্তায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

একটু এগিয়ে তুলসী থেমে গেল।

পিছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। কারা যেন কথা বলতে বলতে দৌড়ে আসছে।

একটুও বিলম্ব না করে তুলসী কাছের গাছটায় চড়ে বসল।

উঁচু গাছ। হাতের কাছে কোন ডালপালাও নেই।

NOT FOR SALE

কিন্তু পাড়াগাঁর ছেলে তুলসীর তাল নারকেল গাছে চড়া খুব অভ্যাস আছে। অবলীলাক্রমে তুলসী প্রায় গাছের আগায় গিয়ে উঠল। বড় বড় পাতার আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে রইল।

সেখানে বসে বসেই দেখল চারজন লোক, কারো হাতে বর্শা, কারো বল্লম, কারো লাঠি,-দৌড়ে চলে গেল।

তুলসী বুঝতে পারল এরা তারই খোঁজে বেরিয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে না ঢুকে পড়ে যদি সে রাস্তা ধরে ছুটত, তাহলে এতক্ষণ তার কি হাল হত বেশ বুঝতে পারল।

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামল। পাখিরা বাসায় ফিরতে আরম্ভ করল। এদিক ওদিক জোনাকির আলো।

ডাল আঁকড়ে চুপচাপ বসে থেকে তুলসী দেখল লোকগুলো ফিরল না। হতে পারে ফেরবার অন্য রাস্তা আছে। কিংবা লোকগুলো অনেকটা পথ চলে গিয়েছে। রাতটা কোথাও কাটিয়ে কাল ভোরে ফিরবে।

তুলসী ঠিক করল গাছ থেকে নামাটা সমীচীন হবে না।

নিজের ধুতির কিছুটা খুলে সে গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। যাতে ঘুমিয়ে পড়লে নীচে না পড়ে যায়।

একটু রাত হতেই জঙ্গল কাঁপিয়ে হা হা হাসির শব্দ উঠল।

তুলসী জেগেই ছিল। সেই বিকট শব্দে তার বুকের রক্ত শুকিয়ে জল হয়ে গেল।

সে প্রথমে মনে করল বুঝি লোকগুলো জঙ্গলে ঢুকে গাছের ওপর তাকে দেখতে পেয়েছে। তাই তাদের এই আনন্দের হাসি।

একটু পরেই তার ভুল ভাঙ্গল।

এ হাসি কোন মানুষের নয়, বন্যজন্তুর।

ঠিক গাছের নীচে দিয়েই জন্তুটা ছুটে গেল। উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তুলসীর মনে পড়ল। বইতে পড়েছে হায়নার হাসি। কলকাতায় মামার বাড়ি গিয়ে বার কয়েক চিড়িয়াখানায় জন্তুটা দেখেছে। খাঁচার কাছে যাবার উপায় নেই, এমন বিশ্রী গন্ধ।

কয়েকটা শেয়াল চেঁচামেচি ছাড়া রাত্রে আর কোন উপদ্রব হ'ল না।

একটু একটু করে অন্ধকার কেটে গেল। ঘন গাছপালার জন্য জঙ্গলের ভিতর রোদ আসা দুষ্কর।

পাখিদের কিচিরমিচির আরম্ভ হল।

NOT FOR SALE

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তুলসী গাছ থেকে নেমে পড়ল।

প্রায় সারা রাত লরি চলেছে রাস্তা দিয়ে। লরির হেড্-লাইটের উজ্জ্বল আলো অনেকবার তুলসীর মুখে এসে পড়েছে।

তুলসী প্রথমে ভেবেছিল লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে থানায় চলে যাবে। সেখান থেকে পুলিস সঙ্গে করে কুমুমামাকে বাঁচাবে আর চোরাই মূর্তিগুলোও উদ্ধার করবে। তারপর ভাবল বিদেশে পুলিসের খোঁজ করতে যাওয়ার বিপদ অনেক। যাকে জিজ্ঞাসা করবে সে এই দুশমনদের লোক কিনা কে জানে। আবার হয়তো তুলসীকে ফাঁদে ফেলবে।

তার চেয়ে একটা লরি দাঁড় করিয়ে বাংলার দিকে চলে যাবে। লরি যদি কলকাতায় যায় তাহলে দিদিমা আর দাদুকে সব ব্যাপারটা জানাবে।

আর যদি লরি কলকাতা পর্যন্ত না যায়, তাহলে শক্তিগড়ে তুলসী নেমে পড়ে রতনগড়ে ফিরে যাব। বাবাকে সব কথা খুলে বলবে। পুলিস-মহলে বাবারও যথেষ্ট জানাশোনা। কিছু একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।

গাছের ছোট একটা ডাল ভেঙে নিয়ে তুলসী রাস্তার ধারে দাঁড়াল।

দু'একটা কাঠুরে হাতে কুরুল নিয়ে চলেছে। দু'একজন মাথায় ঝুড়ি, বোধহয় হাটে যাচ্ছে।

দূরে একটা লরির শব্দ হতেই তুলসী এগিয়ে গেল।

বাঁকের মুখে লরিটা দেখা যেতেই তুলসী গাছের ডাল নাড়তে লাগল।

নক্ষত্রবেগে লরিটা পার হয়ে গেল। থামল না।

একটা লোক কাঁধে বোঝা নিয়ে ছুটছিল, তাকে তুলসী জিজ্ঞাসা করল, এ জায়গার নাম কি?

লোকটা বোধহয় বাংলা বুঝতে পারল না। একবার ঘাড় ফিরিয়ে তুলসীর দিকে দেখেই আবার সোজা চলতে আরম্ভ করল।

তুলসী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার লরির আওয়াজ শোনা গেল।

এবার তুলসী মরীয়া হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাছের ডালটা নাড়তে লাগল।

লরিটা একটানা হর্ন দিতে দিতে এসে তুলসীর খুব কাছে ঘচাং করে থামল।

ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে তুলসীকে গালাগাল দিল।

তুলসী ভ্রুক্ষেপ না করে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

NOT FOR SALE

কোথায় যাবে লরি?

ড্রাইভার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, বর্ধমান।

তুলসী করুণ কণ্ঠে বলল, আমাকে বর্ধমান নিয়ে যাবে?

তোমাকে? কে তুমি? এখানে এলে কি করে?

এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে তুলসী মুশকিলে পড়ে গেল।

সে শুধু বলল, আমাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে এসেছিল। আমি বহু কষ্টে তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি।

এবার ড্রাইভার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

তুমি অতদূর বর্ধমান যাবে কেন? সামনেই থানা আছে, সেখানে নেমে নালিশ কর না। পুলিসের তাহলে গুণ্ডাদের ধরবার সুবিধা হবে।

তুলসী বলল, আমার বাড়ি শক্তিগড়ের কাছে। বাড়ির লোক আমার জন্য খুব চিন্তিত রয়েছে। আগে একবার বাড়ি যাব, তারপর সেখান থেকে পুলিসে খবর দেব।

উঠে এস।

তুলসী উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল।

লরি ছুটল।

সারা রাত তুলসী একটু ঘুমায় নি। শরীর ভীষণ ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।

তাছাড়া প্রচণ্ড খিদেয় পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে।

একবার ভাবল, ড্রাইভারকে খিদের কথা বলবে, কিন্তু লজ্জায় পারল না।

হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

তুলসী ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনিতে চমকে উঠে বসল।

লরি থেমেছে। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান।

সামনে আরও তিন চারটে লরি দাঁড়িয়ে আছে।

চায়ের দোকানের সামনে অনেকগুলো খাটিয়া পাতা।

সেই খাটিয়াগুলোর ওপর কিছু লোক বসে আছে। হাতে মগ। তাতে চা।

ড্রাইভার তুলসীকে ডাকল, নেমে এস খোকা।

তুলসী নেমে ড্রাইভারের পাশে একটা খাটিয়ায় বসল।

এক মগ চা আর একটা বড় সাইজের পাঁউরুটির টুকরো।

তুলসী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চা পাঁউরুটি শেষ করল।

ড্রাইভার তুলসীর দ্রুত খাওয়া লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল।

আর চা পাঁউরুটী খাবে?

NOT FOR SALE

তুলসী ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, খাবে।

আর এক মগ চা আর পাঁউরুটির টুকরো তুলসীকে দেওয়া হ'ল।

ড্রাইভার প্রশ্ন করল, গুণ্ডারা তোমাকে কিছু খেতে দেয় নি, না?

তুলসী উত্তর দিল, না।

তোমাকে কেন ধরেছিল?

কি করে জানব?

আমি জানি। তোমাকে আটকে রেখে তোমার গার্জেনকে চিঠি লিখতে বলত। পাঁচ দশ হাজার টাকা না দিলে তোমাকে খতম করে ফেলত। তুমি খুব বাহাদুর ছেলে, তাই তাদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছ।

তুলসী কোন উত্তর দিল না।

একসময়ে দু'জনে লরিতে গিয়ে উঠল।

এবার আর লরি বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে পারল না। সকাল হয়েছে। পথে ঘাটে লোক চলাচল বাড়ছে।

প্রাইভেট মোটর, গরুর গাড়ির ভিড়ও মন্দ নয়।

শক্তিগড় যখন পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

বেলা দুটোর সময়ে দু'জন ভাত তরকারি খেয়ে নিয়েছিল।

ড্রাইভার বলল, তুমি আর মিছামিছি কেন বর্ধমান যাবে। শক্তিগড়ের কাছে যখন তোমার বাড়ি, তখন এখানেই নেমে যাও। আমার কথা মনে থাকবে তো?

নিশ্চয় থাকবে। তোমার কথা কোনদিন ভুলব না। তোমার নামকি ভাই?

লরি চালু করে ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলল।

প্রীতম সিং। চলি ভাই।

প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে লরি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

তুলসী বাড়ি ঢুকতে বাড়িতে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল।

তারা মা প্রায় অনাহারে ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল কান্না।

বাপ ইতিমধ্যেই থানায় খবর দিয়েছিল। পুলিস নানা জায়গা খুঁজে হয়রান।

তাদের ধারণা মামা-ভাগ্নে কোথাও পালিয়েছে। কেউ তাদের ধরে নিয়ে যায় নি।

তুলসীকে দেখেই তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

কোথায় গিয়েছিলি তোরা? কুমুদ কই!

NOT FOR SALE

তুলসী ধীরে ধীরে সব কাহিনী বলল।

কুমুদের খবর জানে না শুনে তার মা বুক চাপড়াতে লাগল।

কি সর্বনাশের কথা! আমি মা বাপের কাছে কি করে মুখ দেখাব!

তুলসীর বাবা থানায় গিয়েছিল। পুলিস কোন খবর পেয়েছে কিনা জানতে।

ফিরে তুলসীকে দেখতে পেয়ে যেমন খুশী হ'ল, আবার কুমুদের কোন খোঁজ নেই জেনে তেমনই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

এ পর্যন্ত কুমুদের মা বাবাকে কোন খবর দেওয়া হয় নি।

মূর্তি চুরির ব্যাপারটা তুলসীর বাবা খুব মন দিয়ে শুনল।

এর মধ্যে মন্দিরের দিকে তুলসীর বাবা যায় নি। যাওয়া প্রয়োজন মনে করে নি কাজেই জোড়া বিগ্রহ যে মন্দিরের মধ্যে নেই, তা জানতেই পারে নি।

তুলসীকে নিয়ে তার বাবা আবার থানায় গেল।

দারোগা মনোযোগ দিয়ে সব শুনল, মন্দিরে এসে সব দেখল, তারপর তুলসীর বাবাকে বলল, আপনি এক কাজ করুন। লালবাজারে গিয়ে সব কিছু জানান। আমাদের দেশে মূর্তি চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। চোরাই মূর্তি বিদেশে চালান যাচ্ছে। এসব কেসের জন্য আলাদা একটা বিভাগ হয়েছে।

তুলসীকে নিয়ে তার বাবা বিকালের ট্রেনে রওনা হয়ে গেল।

প্রথমে কুমুদের বাড়ি গেল।

তখনও কুমুদের বাবা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন নি। মা ছিলেন।

তুলসীর কাছে সব শুনে কুমুদের মা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

অনেক বুঝিয়েও তাঁকে শান্ত করা গেল না।

কুমুদের বাবা বাড়ি ফিরে জামাইয়ের কাছে সব শুনে বিচলিত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না।

শুধু বললেন, কুমুদ আর তুলসীর ওভাবে লরিতে উঠে বসাটা ঠিক হয় নি।

মূর্তিচোরদের ধারণা হতে পারে ছেলে দুটো পুলিসের চর। ধরবার জন্য ওদের পিছু নিয়েছে। যাই হোক, চল লালবাজারে সব কিছু জানিয়ে আসি। বাড়িতে বসে কপাল চাপড়ালে কোন সুরাহা হবে না।

সহকারী কমিশনার অতুল বসুর সঙ্গে আগে থেকেই কুমুদের বাবার পরিচয় ছিল। তিনি মন দিয়ে শুনলেন, তারপর আলমারি খুলে একটা অ্যালবাম বের করে তুলসীর সামনে রেখে বললেন, দেখ তো, এই

NOT FOR SALE

ফটোগুলোর মধ্যে কাউকে চিনতে পার কিনা। এসব হচ্ছে নামকরা মূর্তিচোরদের ফটো।

তুলসী নিবিষ্ট মনে একটার পর একটা ফটো দেখে গেল। নানা জাতের লোক রয়েছে। শুধু পুরুষ নয়, কিছু মেয়েও।

কিন্তু যাদের দেখেছে তাদের কারও ফটো আছে বলে মনে হ'ল না।

সেই কথাই সে সহকারী কমিশনারকে বলল।

তিনি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, মূর্তি চুরির ব্যাপারে ছোটখাট অনেক দল আছে। সকলের খোঁজ পাওয়া পুলিসের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠিক আছে, আপনার নাতিকে নিয়ে আমরা একবার ওই আস্তানাটা দেখে আসব। এ বিষয়ে বিহারের পুলিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করব। তবে সে আস্তানায় কাউকে পাব বলে মনে হয় না। আর আপনার ছেলের গোটা কয়েক ফটো আমাদের দিয়ে যাবেন। দেখি কতদূর কি করতে পারি।

দিন দু'য়েক পরেই পুলিশ রওনা হল। সঙ্গে তুলসী আর তার বাবা।

সহকারী কমিশনার ঠিকই অনুমান করেছিলেন। গুদামঘর খালি। একটি লোকও নেই।

বিহারের পুলিশও সঙ্গে ছিল।

তারা বলল, চিড়িয়া পালিয়েছে।

ধারে কাছে কোন বসতি নেই যে পুলিশ কিছু জিজ্ঞাসা করবে। চারপাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দিনের বেলাতেই অন্ধকার।

উঠানের ওপর লরির চাকার দাগ।

বিহারের পুলিশ বলল, আমরা জীপ নিয়ে একটু দেখি চাকার দাগ কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে।

তুলসী, তার বাবা আর কলকাতার দুজন পুলিশ বসে রইল।

তুলসী তার বাবাকে দেখাল, যে ঘরটায় তাকে আটকে রাখা হয়েছিল।

তুলসীর বাবা বলল, তা হ'লে পাশের গুদামঘরে হয়তো কুমুদকে বন্দী করে রেখেছিল। তাকে কি দুর্বৃত্তরা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, না মেরেই ফেলল।

মেরে ফেললে, তার দেহ তো এখানে পাওয়া যেত।

কিংবা এমন হতে পারে সঙ্গে নিয়ে গেছে, পথে মেরে ফেলে দেবে।

সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে তুলসীর বাবা শিউরে উঠল।

পুলিশ দুজন ঘুরে ঘুরে হাতের কিংবা পায়ের ছাপের সন্ধান করতে লাগল।

NOT FOR SALE

উঠানে অনেকগুলো পায়ের ছাপ। একটার সঙ্গে আর একটা মিশে গিয়েছে।

দরজায়-হাতের ছাপ কয়েকটা পাওয়া গেল।

তুলসীর মনে হল, কুমুমামার কিছু হয়নি। নিশ্চয় সে পালিয়ে ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

একটা গুদামঘরে প্রচুর-খড় আর কাঠের ছোট বড় বাক্স পাওয়া গেল। বোঝা গেল মূর্তিগুলো এর ভিতর প্যাক করে বাইরে পাঠানো হ'ত।

পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর তুলসীর বাবাকে জিজ্ঞাসা করল। শুনলাম, মূর্তি নিয়ে আপনি কিছু পড়াশোনা করেছেন, এ মূর্তি দুটো সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

তুলসীর বাবা বলল, এই মন্দিরকে সবাই ধর্মরাজের মন্দির বলত। কেন বলত জানি না। দুটো মূর্তিই কবন্ধ। মাথা নেই। সম্ভবতঃ কোন অত্যাচারী শাসকদের রাজত্বকালে মূর্তি দুটো এভাবে নষ্ট করা হয়েছিল।

আচ্ছা, মূর্তি দুটো থেকে নাকি জ্যোতি বের হ'ত?

জ্যোতি ঠিক নয়। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করত, যেমন জোনাকীর শরীর থেকে আলো বের হয়।

হঠাৎ তুলসীর বাবা থেমে গেল।

পুলিশ দুজনও চমকে মুখ ফেরাল।

জঙ্গলের মধ্যে ঝপাঝপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কাঠুরেরা কাঠ কাটছে।

ইন্সপেক্টর আর পুলিশ ছুটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল।

কাঠুরেরা রোজ যদি এখানে কাঠ কাটতে আসে, তাহলে এখানকার বাসিন্দাদের বিষয়ে কিছু জানতেও পারে।

দুজন কাঠুরে। দুজনের হাতে দুটো কুড়ল।

তারা পুলিশ দেখেই হাতজোড় করল।

দোহাই হুজুর, এবারকার মতন আমাদের মাপ করুন। আমরা আর কোনদিন এ জঙ্গলে আসব না।

এটা সংরক্ষিত বন নয়। এখানে গাছ কাটা অপরাধ নয়।

সেকথা ইন্সপেক্টর এদের কিছু বলল না।

গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক আছে, যদি একটা খবর দিতে পার তাহলে তোমাদের পাকড়াও করব না।

বলুন হুজুর।

NOT FOR SALE

এ জঙ্গলে তোমরা আগে এসেছ?

মাঝে মাঝে এসেছি হুজুর।

তাহলে ওই গুদামঘরের ওখানে কারা থাকত, জান?

না, হুজুর, তবে অনেক লোককে লরি করে যাওয়া আসা করতে দেখেছি।

তাদের সঙ্গে তোমাদের কথাবার্তা কখনও হয়েছিল?

না, আমরা কাঠ কেটে সন্ধ্যা হবার আগে এখান থেকে সরে পড়ি।

এদিকে তুলসী আর তার বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পুলিশরা না ফিরে আসাতে তুলসীর বাবা তুলসীকে বলল, তোর যাবার দরকার নেই, তুই এখানে দাঁড়া। আমি একবার জঙ্গলে ঢুকে দেখি পুলিশদের এত দেরি হচ্ছে কেন।

তুলসীর বাবা জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

জঙ্গলে ঢোকবার তুলসীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। বাবার ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে যাওয়াটাও তার মোটেই ভাল লাগল না।

সে চুপচাপ হিজল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

কুমুমামার জন্য তার মন খুব খারাপ হয়েছে। সব ব্যাপারটার জন্য তার নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে। এভাবে পদ্মদীঘিতে যাবার ব্যবস্থা না করলে এ দুর্ঘটনা হ'তই না।

হঠাৎ দুটো সবল বাহু পিছন থেকে তুলসীর মুখ চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা রুমাল তার নাকের ওপর দিয়ে দিল।

কি রকম একটা গন্ধ। ধীরে ধীরে তুলসীর সারা দেহ অবশ হয়ে গেল। এইটুকু সে বুঝতে পারল অসীম বলশালী একটা লোক তাকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

একটু পরে পুলিশরা ফিরে এল। তুলসীর বাবাও।

ইন্সপেক্টর বলল, চলুন, এখানে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। আমার মনে হয় বদমাইশগুলো মালপত্র নিয়ে পালিয়েছে।

তুলসীর বাবা চেঁচিয়ে তুলসীকে ডাকল, তুলসী, তুলসী।

কোন সাড়া নেই।

তুলসীর বাবা ভাবল, সম্ভবতঃ তুলসী ধারে কাছে কোথাও গেছে।

এদিক ওদিক খুঁজেও তুলসীকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল, তাই তো, ছেলেটা গেল কোথায়। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবার কথা।

NOT FOR SALE

ইন্সপেক্টর বলল, যাবে আর কোথায়। এদিক ওদিক গেছে নিশ্চয়। দাঁড়ান, আমি একজন পুলিশকে খুঁজতে পাঠাচ্ছি।

আধ ঘন্টা ধরে আশেপাশের জঙ্গল খুঁজেও তুলসীর সন্ধান মিলল না।

ইন্সপেক্টর অবাক!

তাই তো, ছেলেটা চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মতন উড়ে গেল নাকি। আপনি ছেলেকে একলা ছেড়েই বা আমাদের কাছে জঙ্গলে ঢুকতে গেলেন কেন?

তুলসীর বাবা এ কথার কোন উত্তর দিল না।

তার মনের অবস্থা বর্ণনা করার মতন নয়। এত কষ্টে ছেলেকে ফিরে পেল, আবার সেই ছেলে হারিয়ে গেল এমনভাবে!

ইন্সপেক্টর বলল, আমরা ওদিকের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওদিক দিয়ে কেউ গেলে ঠিক চোখে পড়ত। ওদিক দিয়ে কেউ যায় নি। যদি কেউ আপনার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয় এদিক দিয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর, তুলসীর বাবা আর পুলিশ এদিকে জঙ্গলে ঢুকল।

এপাশে শরবন। মানুষ সমান উঁচু। মোটা মোটা বিরাট আকারের গাছ। দিনের বেলাতেই ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

বেশ কিছুটা ভিতরে গিয়ে ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে পড়ল।

তুলসীর বাবার দিকে ফিরে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, এই দেখুন।

তুলসীর বাবা দেখল।

এখান থেকে শরগাছগুলো মাটির ওপর শুয়ে পড়েছে।

বুঝলেন কিছু?

তুলসীর বাবা বললেন, এখান দিয়ে একটা গাড়ি গেছে।

ঠিক। মনে হয় কোন রকমে আপনার ছেলেকে ধরে নিয়ে কেউ গাড়ি করে এখান দিয়ে গিয়েছে।

তুলসীর বাবা অবাক!

কিন্তু তুলসীকে এভাবে নিয়ে গেল, সে একটু চেঁচামেচিও করল না?

ইন্সপেক্টর বলল, হয়তো চেঁচাবার সুযোগ সে পায় নি। তার মুখ চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেছে।

এখন উপায়?

ইন্সপেক্টর তুলসীর বাবার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশকে নির্দেশ দিল, যাও আমাদের জীপটা নিয়ে এস।

NOT FOR SALE

জীপ আসতে সবাই উঠে বসল।

খুব দ্রুত চলা সম্ভব নয়। উঁচু নীচু জমি। জীপ আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।

অনেকটা যাবার পর জঙ্গল শেষ হল। পায়ে চলা আঁকাবাঁকা পথ। তার ওপর স্পষ্ট টায়ারের দাগ দেখা গেল।

এবার জীপ একটু দ্রুতগতিতে ছুটল।

দূরে নীলচে পাহাড়। আশেপাশে বসতির চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ, কালো কালো পাথরের স্তূপ।

জীপের মধ্যে কেউ কোন কথা বলছে না।

তুলসীর বাবার কথা বলবার শক্তি নেই। তার মনের মধ্যে ঝড় বয়ে চলেছে। বাড়িতে গিয়ে কি বলবে। কুমুদের সন্ধানে এসে এত কষ্টে ফিরে পাওয়া ছেলেকে আবার হারাতে হল!

একটু পরেই ইন্সপেক্টর আস্তে বলল, এই, জীপ থামাও।

দারুণ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জীপ থেমে গেল।

তুলসীর বাবা প্রশ্ন করল, কি হল?

ইন্সপেক্টর হাত তুলে শুধু সামনের দিকে দেখাল।

বেশ কয়েক গজ আগে একটা বিরাট কালো পাথরের আড়ালে একটা মোটরের পিছন দিকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

হালকা নীল রঙের মোটর। দেখে মনে হচ্ছে, পিছনে কে একজন বসে রয়েছে। হলদে রঙের শার্ট পরনে।

তুলসীর বাবা সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, ইন্সপেক্টর, ওই তো আমার তুলসী রয়েছে গাড়িতে। যেমন করে পারুন, ওকে উদ্ধার করুন।

ইন্সপেক্টর ভুরু কুঁচকে বলল, আঃ, চেঁচাবেন না। মোটরটা ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন বুঝতে পারছি না।

কথা শেষ করেই কোমর থেকে ইন্সপেক্টর রিভলভার বের করে জীপ থেকে নেমে পড়ল, তারপর দু' এক পা এগিয়ে সামনের মোটর লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল।

গুৰুম করে শব্দ।

গাছের ডালে বসা কয়েকটা পাখি চিৎকার করে আকাশে উড়ে গেল।

গুলি সামনের মোটরের পিছনের একটা টায়ারে গিয়ে লাগল।

আবার একটা শব্দ। টায়ার ফেটে হাওয়া বের হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

মোটর কেঁপে উঠে একদিকে সামান্য কাত হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর পুলিশের দিকে ফিরে বলল, আমার পিছন পিছন এস।

তারা বন্দুক তুলে ধরে ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করল।

তুলসীর বাবা চুপচাপ জীপে বসে রইল।

তার ধারণা হল পুলিশরা মোটরের কাছাকাছি গেলেই মোটর থেকে গুলিবৃষ্টি শুরু হবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হল না।

ইন্সপেক্টর মোটরের পাশে গিয়ে উঁকি দিয়ে কি দেখল তারপর হাত নেড়ে তুলসীর বাবাকে ডাকল।

তুলসীর বাবা জীপ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মোটরের দিকে গেল।

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে নিয়ে বলল।

শয়তানরা আমাদের আচ্ছা ঠকিয়েছে মশাই, এই দেখুন।

তুলসীর বাবা মোটরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দেখল তুলসীর শার্টটা একটা কঞ্চির মধ্যে ঢুকিয়ে পিছনের সীটে বসিয়ে রাখা হয়েছে। একটু দূর থেকে মনে হয়, তুলসীই বসে আছে।

স্টিয়ারিং-এর হাতলে একটা কাগজ আটকানো। তাতে হিন্দীতে এক লাইন লেখা।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধু পুলিশ।

রাগে ইন্সপেক্টরের মুখটা থমথম করতে লাগল।

দাঁত দাঁত চেপে বলল, শয়তানদের একবার ধরতে পারলে উচিত শিক্ষা দেব।

মোটরের সীট তুলে পিছনের ডালা খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

দুজন পুলিশ ঠেলে মোটরটা রাস্তার ওপর দাঁড় করাল।

ইন্সপেক্টর চালকের আসনে বসে চালাবার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হল না।

ইন্সপেক্টরের সন্দেহ হতে মোটর থেকে নেমে বনেট খুলেই মাথায় হাত দিয়ে বসল।

ইঞ্জিনটা ঘা মেরে অকেজো করে রেখে গেছে।

তাহলে এখান থেকে শয়তানগুলো গেল কোথায়!

চারপাশে একটু মাটি নেই, কেবল কালো কালো পাথরের স্তূপ। পাথরের ওপর পায়ের ছাপ পড়া সম্ভব নয়।

NOT FOR SALE

ইন্সপেক্টর পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। পিছনে আর সবাই।

তুলসীর বাবাও চলতে শুরু করল বটে, কিন্তু সে ভীষণ অন্যমনস্ক।

তার একমাত্র চিন্তা বাড়ি ফিরে সবাইকে কি বলবে।

তুলসীকে পেয়েও হারালো, এর জন্য তার নির্বুদ্ধিকেই সবাই দায়ী করবে।

সে যদি তুলসীকে ছেড়ে না যেত, তাহলে এমন সর্বনাশ হত না।

এক সময়ে পথ শেষ হল। পথ ঠিক নয়, পর পর কালো পাথরের স্তূপ।

তারপরই বিরাট এক নদী।

ওপার দেখা যায় না। গেরুয়া রংয়ের জল। দু একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর তুলসীর বাবার দিকে ফিরে বলল।

এখান দিয়ে আপনার ছেলেকে পাচার করেছে। বোধ হয় ঘাটে ওদের নৌকা বাঁধা ছিল।

তুলসীর বাবা কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্সপেক্টর বলল, চলুন ফিরে যাই। ওই মোটরটা নিয়ে থানায় গেলেই কার মোটর সে সম্বন্ধে পাত্তা পাওয়া যাবে।

সবাই ফিরে এল।

জীপের মধ্যে দড়ি ছিল, তাই দিয়ে জীপের সঙ্গে মোটরটা বাঁধা হল। একজন পুলিশ মোটরের স্টিয়ারিং ধরে বসল।

থানায় পৌঁছতে আড়াই ঘন্টা লেগে গেল।

ও অঞ্চলের বেশ বড় থানা।

বড় দারোগা মন দিয়ে সব শুনল, তারপর বলল, এদিকে মূর্তিচোরের কথা তো বিশেষ শুনিনি। এমনই চোর ডাকাত আছে। মাঝে মাঝে ডাকাতির সঙ্গে মানুষ খুনের খবরও আসে।

ইন্সপেক্টর বলল, এ মোটরটা কার নামে আছে, তার নাম ঠিকানার খোঁজ করে দেখুন তো। আমরা তার আস্তানায় হানা দিই।

বড় দারোগা একটা কাগজে নম্বরটা লিখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি ফোন করে দেখছি।

ইন্সপেক্টর, পুলিশ আর তুলসীর বাবাকে নিয়ে এক হোটেলে গেল। সকাল থেকে খাওয়া নেই। শরীর খুব দুর্বল লাগছে।

তুলসীর বাবা খাবারের থালার সামনে নামমাত্র বসল। বিশেষ কিছুই মুখে তুলতে পারল না।

NOT FOR SALE

তুলসীর কথা মনে পড়তে লাগল। ছেলেটা যখন আবার শয়তানদের পাল্লায় পড়েছে, তখন তাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

কে জানে হয়তো মেরেই ফেলবে, কারণ আগেরবার পালাবার সময় তুলসী একজনকে ঘায়েল করেছিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই আবার থানায় ফিরে এল।

বড় দারোগা নেই। খেতে গেছে।

একটু পরেই এসে হাজির হল।

কি, মোটরের মালিকের নাম ঠিকানা পেলেন?

বড় দারোগা গম্ভীর মুখে বলল।

লোকগুলো অত্যন্ত পাজী।

ইন্সপেক্টর বলল, নামটা বলুন লিখে নিই।

নামটা নিয়ে কি করবেন? মোটরে ঝুটা নম্বর লাগিয়েছে।

ঝুটা নম্বর?

হ্যাঁ, ও নম্বর এস ডি ও সায়েবের মোটরের।

সবাই চুপ।

তুলসীর বাবা বুঝতে পারল, বেশ বুদ্ধিমান দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। এরা সাধারণ দল নয়।

আর কিছু করার নেই। সবাই ফিরে যাওয়াই ঠিক করল।

সারাটা পথ কেউ কোন কথা বলল না।

তুলসীর বাবা বাড়ি ফিরে দেখল, কুমুদের বাপ অপেক্ষা করছেন।

তুলসীর বাবাকে একলা আসতে দেখে কুমুদের বাবা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

তুলসী কই?

তুলসীর বাবা মাথা নীচু করে বলল, ভিতরে চলুন, সব বলছি।

সব শুনে কুমুদের বাপ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

একটু পরে বললেন, আমি তো ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না। কুমুদ আর তুলসীকে জীবন্ত ফিরে পাব, এমন ভরসা খুবই কম।

খবর শুনে তুলসীর মা কাঁদতে শুরু করেছিল। কুমুদের বাবা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদে আর কি হবে। যাহোক একটা ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

তারপর জামাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

NOT FOR SALE

ট্রেনেই তিনি কথাটা বললেন।

তুমি পারিজাত বক্সির নাম শুনেছ?

বিখ্যাত গোয়েন্দা?

হ্যাঁ, আমি ভাবছি, তাঁর কাছে একবার যাব। পুলিশ যেমন তল্লাসী চালাচ্ছে, চালাক। পারিজাত বক্সী যদি কেসটা হাতে নেন, বেঁচে যাই।

কিন্তু উনি তো শুনেছি খুব ব্যস্ত লোক।

ব্যস্ত তো বটেই, তবে ওঁর স্ত্রীর আমি একবার চিকিৎসা করেছিলাম। খুব সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। সেই সময় পারিজাতবাবু বলেছিলেন, যদি কখনও আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন হয় জানাবেন।

বেশ তো তাই করুন। যা করবেন, একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল। দেরি হলে কি সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমি ভাবতেই পারছি না।

কুমুদের বাবা বললেন, বাড়ি পৌঁছেই পারিজাতবাবুকে ফোন করব। যদি তাঁর অসুবিধা না থাকে, তাহলে আজ বিকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমিও এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত, দেরি করলে ক্ষতিই হবে।

সন্ধ্যা সাতটায় পারিজাত বক্সির সঙ্গে দেখা করার কথা। কুমুদের বাবা জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ছটার মধ্যেই তাঁর বাড়ি হাজির।

চাকর তাদের বাইরের ঘরে বসিয়ে বলল, একটু অপেক্ষা করুন, বাবু ঠিক সময়ে আসবেন।

ছোট সাজানো বসবার ঘর। দেয়ালে অনেকগুলো ছবি। সবই প্রাকৃতিক দৃশ্যের। একটি ফটো পারিজাত বক্সির। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তীক্ষ্ণ দুটি চোখ।

তুল্সীর বাবা টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিল। কুমুদের বাবা চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন।

দুজনেরই মনের অবস্থা দারুণ খারাপ। এক এক মুহূর্তের দাম অনেক বেশী।

ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ঠেলে একটা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল।

পরনে দামী সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে কাজ করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি, গলায় রঙীন রুমাল বাঁধা। অল্প দাড়ি রামছাগলের মতন। পানের রসে ঠোঁট রাঙা।

লোকটা ঢুকেই কুমুদের বাবার দিকে ফিরে বলল, সেলাম আলেকম ডাক্তার সায়েব। আপনি সময়ের একটু আগেই এসে গেছেন।

কুমুদের বাবা তো অবাক।

NOT FOR SALE

কে এই লোকটা। তাঁর এখানে আসবার কথা জানলই বা কি করে?

একটু বসুন, আমি আসছি।

লোকটা ভিতরের দিকে চলে গেল।

তুলসীর বাবা প্রশ্ন করল, কে লোকটা?

কুমুদের বাবাও সেই কথাই চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর কি মনে হতে তিনি বললেন, ইনি পারিজাত বক্সি নন তো? শুনেছি পারিজাতবাবু অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনই তাঁকে চিনতে পারে না।

ঠিক সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পারিজাত বক্সি ঘরে ঢুকলেন। পরনে পাঞ্জাবী পাজামা।

একটা কৌচে বসে বললেন, কি হয়েছে বলুন ডাক্তার সায়েব।

কুমুদের বাবা পারিজাতবাবুর সঙ্গে নিজের জামাইয়ের পরিচয় করে দিয়ে বললেন, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

সব খুলে বলুন। দেখি কি করতে পারি।

কুমুদের বাবা সবিস্তারে সব বললেন।

পারিজাতবাবুর দুগালে দুটো হাত রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, যে মূর্তিদুটো চুরি গেছে তার বিশেষত্ব কি?

এবার তুলসীর বাবা বলল, দুটো মূর্তিই মুণ্ডহীন। সেটা সম্ভবতঃ কোন কালাপাহাড়ের কীর্তি, আর দুটো মূর্তিই কি ধাতুতে তৈরি জানি না, মনে হয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

পারিজাতবাবু কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, যে মন্দিরে মূর্তিদুটো ছিল, সেটা কি কোন নদীর ধারে?

তুলসীর বাবা মাথা নাড়ল, না নদী নয়। মন্দিরটা পদ্মদীঘির ধারে। বিরাট দীঘি অবশ্য।

পারিজাতবাবু উঠে সামনের আলমারি খুলে কিছুক্ষণ খুঁজলেন, তারপর মোটা একটা বই বের করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থেমে গেলেন। নিবিষ্টচিত্তে কিছু সময় পড়ে নিয়ে বললেন, এখন যেটা পদ্মদীঘি সেটার সঙ্গে এক সময়ে সাগরের যোগাযোগ ছিল। পদ্মদীঘি ছিল বিদ্যাপতি নদী। বণিকরা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে ওই পথে যাওয়া আসা করত। কাজেই মূর্তিদুটো তাদের খুব কাজে লাগত।

পারিজাতবাবুর কথাবার্তা কুমুদের বাবা আর তুলসীর বাবা কারুরই মোটে ভাল লাগল না।

NOT FOR SALE

কোথায় হারানো দুটো ছেলের অনুসন্ধান করার পথ বাতলাবে, তা নয়, দেশের ভৌগলিক তথ্য নিয়ে ভদ্রলোক মাথা ঘামাচ্ছেন। মূর্তিদুটোর বিশেষত্ব শুনেই বা লাভ কি?

পকেট থেকে মূর্তিদুটোর ফটো বের করে তুলসীর বাবা পারিজাতবাবুর হাতে দিয়ে বলল, এই দেখুন, মূর্তিদুটোর ফটো।

সাগ্রহে পারিজাতবাবু হাত বাড়িয়ে ফটোটা নিয়ে বললেন, ফটো এনেছেন, অনেক ধন্যবাদ।

তুলসীর বাবা আর থাকতে পারলেন না। বলে ফেলল, ছেলেদুটির ফটোও এনেছি। দেখবেন না?

পারিজাতবাবু মুখ না তুলেই বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখব। এখন আপনার কাছে রাখুন।

ফটোটা মন দিয়ে দেখে পারিজাতবাবু বললেন, আমার মনে হয় মূর্তিদুটো গ্যালেনা পাথর দিয়ে তৈরি। এ পাথর সিংভূমের জঙ্গলে প্রচুর পাওয়া যায়। অনেকে একে সোনা বলে ভুল করে।

কুমুদের বাবা প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি লোকগুলো সোনার-মূর্তি ভেবে ও দুটো চুরি করে নিয়ে গেল?

পারিজাতবাবু হেসে মাথা নাড়লেন, না। এই সব মূর্তিচোরদের জ্ঞান আপনার আমার চেয়ে অনেক বেশী, অন্ততঃ এসব বিষয়ে। তারা মূর্তির জন্যই মূর্তি চুরি করে। এসব মূর্তি বেশির ভাগই আমেরিকা চালান যায়। সেখানকার কোটিপতিরা প্রচুর মূল্য দেয় এসবের জন্য।

তুলসীর বাবা আবার বলে ফেলল, তা তারা যা ইচ্ছা করুক, কিন্তু আমাদের ছেলেদুটোকে এভাবে ধরে নিয়ে গেল কেন?

পারিজাতবাবু ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবলেন তারপর বললেন, সম্ভবতঃ তাদের ধারণা হয়েছে ছেলেদুটি পুলিশের চর। সেইজন্য তারা দুজনে লরিতে উঠেছিল। যাক মূর্তি সম্বন্ধে যা বলছিলাম শুনুন। এসব মূর্তি নদীতে আলোকসংকেতের কাজ করে। জাহাজকে সাবধান করে দেয়। এর জ্যোতি দেখে নাবিকরা বুঝতে পারে তীরভূমি কাছেই। সেখানে অল্প জল, মাঝদরিয়া দিয়ে যাওয়াই মঙ্গল। এ রকম মূর্তির খোঁজ বিদেশেও দু-এক জায়গায় পাওয়া গেছে। সেগুলোও গ্যালেনা পাথরের তৈরি।

একটু থেমে পারিজাতবাবু হাত বাড়ালেন, দিন ছেলেদের ফটোটা দেখি।

তুলসীর বাবা ফটোটা তাঁর হাতে তুলে দিল।

NOT FOR SALE

একই ফটোতে পাশাপাশি দুজন দাঁড়িয়ে। কুমুদ আর তুলসী।

একবার চোখ বুলিয়েই পারিজাতবাবু বললেন, এরা তো খুব ছেলেমানুষ দেখছি। আপনারা একটা কাজ করুন।

কি বলুন?

এদের ফটো দিয়ে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিন এরা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে পরীক্ষায় ফেল করার জন্য। যে এদের খোঁজ দিতে পারবে তাকে দুশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

কুমুদের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে লাভ কি হবে?

লাভ এই হবে যে, মূর্তিচোরেরা অন্ততঃ এটা বুঝতে পারবে যে এরা পুলিশের চর নয়, নেহাত কৌতূহলবশতঃ লরির ওপর চড়েছিল।

এবার তুলসীর বাবা অশ্রুজড়ানো গলায় বলল, কিন্তু ছেলেদুটো কি বেঁচে আছে?

উত্তর দেবার আগেই পাশের ঘর থেকে ফোনের ঝংকার শোনা গেল। পারিজাতবাবু উঠে গেলেন।

মিনিট তিন চার পরে যখন ফিরে লেন, তখন মুখটা থমথম করছে।

বসতে বসতে বললেন, এইমাত্র মূর্তিচোরের দল একজন ফোনে আমাকে শাসাল। আমি যদি এ কেসে হাত দিই, তাহলে সাত দিনের মধ্যে আমাকে খতম করে দেবে।

৩

কুমুদ চোখ খুলে দেখল বিরাট আকারের কালো পাথরের মাঝখানে তার দেহ আটকে রয়েছে।

চারদিকে প্রবল জলস্রোত। তীব্র বেগে জল এসে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। আওয়াজে কান পাতা দায়।

কোনরকমে পাথর আঁকরে ধরে কুমুদ তার ওপর উঠে বসল। এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল।

কাঠের পুলটা ভেঙে জলের মধ্যে পড়েছে। লরির চিহ্ন কোথাও নেই।

আর একটা ব্যাপার কুমুদ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল। লরিটা ভেঙে পড়ার সময়ে ধাক্কায় তার হাত পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে।

খুব সাবধানে কুমুদ পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল।

NOT FOR SALE

কোন দিকে লোকালয়ের কোন চিহ্ন নেই। কেবল মাঠ আর মাঠ। অনেক দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী।

পাথরের ওপর পা দিয়ে দিয়ে ডাঙায় পৌঁছানো সম্ভব, কিন্তু পাথরের গায়ে যেমন শ্যাওলা পড়েছে, তাতে পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

কিন্তু এভাবে পাথরের ওপর তো বসে থাকা যায় না।

কুমুদ পা টিপে টিপে ডাঙার দিকে যেতে শুরু করল।

দু-একবার জলের মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। তার ওঠার ক্ষমতা নেই।

একসময়ে উঠল। একবার ভাবল নদীর তীর ধরে চলতে শুরু করবে, তারপরই মনে হল যদি দলের লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

লরি স্রোতের সঙ্গে যদি ভেসে গিয়ে থাকে তাহলে লরি আঁকড়ে লোকগুলোও হয়তো ভাসবে।

রাস্তা ধরে চলাও নিরাপদ নয়। আগের লরি ওই পথেই যাবে। পিছনে লরিটাকে অনুসরণ না করতে দেখলে তারা হয়তো সন্দেহবশে খোঁজ করতে পিছিয়ে আসবে।

তার চেয়ে কোনাকুনি মাঠ ধরে চলাই ভাল।

একটানা চলতে কুমুদের খুব কষ্ট হতে লাগল। খিদের জ্বালায় চোখে অন্ধকার দেখছে। তেষ্টায় তালু শুকিয়ে কাঠ।

রোদ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পথ চলাই দুষ্কর।

বেশ কিছুটা চলার পর একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখল এক বৃদ্ধ দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছে।

কুমুদকে দেখেই হুঁকো একপাশে সরিয়ে রেখে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল।

কে তুমি? এখানে কি চাই?

কুমুদ কোন উত্তর দিতে পারল না। উঠানের ওপর বসে পড়ে ইঙ্গিতে জলের কথা জানাল।

বৃদ্ধ চিৎকার করল, এ পার্বতীয়া, এক লোটা জল নিয়ে আয়।

এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে কুমুদকে দেখে আবার ভিতরে চলে গেল।

একটু পরেই বেরিয়ে এল শালপাতার ওপর দুখানা রুটি আর গুড়, আর একহাতে একলোটা জল নিয়ে।

কুমুদ রুটি দুটো বৃদ্ধার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে এক নিমেষে শেষ করে ফেলল, তারপর ঢক ঢক করে সব জল খেয়ে যেন একটু ধাতস্থ হল।

NOT FOR SALE

এবার বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? এখানে এলে কি করে?

বৃদ্ধের দেহাতী হিন্দী বুঝতে কুমুদের খুব অসুবিধা হল না, কারণ তাদের বাড়ির চাকরবাকর প্রথম প্রথম এ ধরণের হিন্দীই বলত।

কুমুদ উত্তর দিল, আমি কলকাতায় যাব। এখানে বদমায়েশ লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম।

বদমায়েশ লোক? মানে ডাকু?

হ্যাঁ, সেইরকমই।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, এ এলাকাটা বড় খারাপ বাবু। ওদিকের জঙ্গল হচ্ছে ডাকুর আস্তানা। তা তোমার টাকা পয়সা সব কেড়ে নিয়েছে?

হ্যাঁ, সব।

কি করে কলকাতায় যাবে বাবু? সে শহর তো এখান থেকে অনেক দূর।

এ জায়গার নাম কি?

এর নাম চৌতারিয়া। স্টেশন এখান থেকে চব্বিশ মাইল। ছোট স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন বদলে পাটনা যেতে হবে। পাটনা থেকে কলকাতা। আমার ছেলেরা সব কলকাতায় দারোয়ানী করে। তাদের মুখে শুনেছি ভারি শহর কলকাতা। সেখানে কল টিপলে আলো, মেসিন ঘোরলেই জল। তাই না বাবু?

এসব কথার উত্তর দিতে কুমুদের ভাল লাগছিল না।

তবু সে ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক কথা।

এসব তো হ'ল। কিন্তু যাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে? চব্বিশ মাইল রাস্তা কুমুদের পক্ষে পায়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। তার ওপর পকেটে একটি ফুটো পয়সাও নেই। রেলভাড়া দেবে কি করে?

কুমুদের অসুবিধার কথা বোধহয় বৃদ্ধ বুঝতে পারল।

একটা কাজ কর। আজকের দিনটা কোনরকমে এখানে কাটাও। কাল সকালে কাঠবোঝাই লরি যাবে শহরের দিকে। ড্রাইভার আমার জানা। সে তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। তারপর কি করে তুমি কলকাতা যাবে বাপু তা তো জানি না।

কুমুদ বলল, অনেক ধন্যবাদ, তুমি আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দাও, তারপর আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব।

কুমুদ মনে মনে ঠিক করল, একবার স্টেশনে পৌঁছাতে পারলে স্টেশন মাস্টারের হাতে-পায়ে ধরে রেলে যাবার ব্যবস্থা করবে। নিতান্ত যদি তা না

NOT FOR SALE

সম্ভব হয় তাহলে স্টেশন থেকে বাবাকে টেলিগ্রাম করে দেবে, তাহলেই একটি উপায় হয়ে যাবে।

পরের দিন খুব ভোরে বৃদ্ধ কুমুদকে জাগিয়ে দিল।

কুমুদ চোখ খুলে দেখল, হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি বৃদ্ধ তৈরী।

দুজনে হেঁটে হেঁটে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ইঁট বোঝাই গোটা দুয়েক লরি গেল, বৃদ্ধ তাদের থামাল না।

তারপরই কাঠ বোঝাই একটা লরি আসতে বৃদ্ধ পাগড়ী খুলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়াল। পাগড়ীটা বাতাসে নাড়তে লাগল।

সশব্দে ব্রেক কষে লরি থামল।

ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, রাম রাম ভাইয়া। কেয়া খবর।

বৃদ্ধ কুমুদকে দেখিয়ে কি বলতেই ড্রাইভার দরজা খুলে বলল, আইয়ে।

কুমুদ উঠতে গিয়েই বাধা পেল। বৃদ্ধ পিছন থেকে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে।

বাবু, আমি গরীব আদমি। আমার কিছু নেই। আপনি এটা রেখে দিন।

কুমুদ কিছু বলবার আগেই বৃদ্ধ তার হাতে একটি পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে হন হন করে মাঠ ধরে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কুমুদের চোখে জল এসে গেল।

বৃদ্ধ লোকটি হয়তো তার অনেকদিনের কষ্টে সঞ্চিত টাকাটা তার হাতে তুলে দিল।

ড্রাইভার হিন্দীতে কুমুদকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি যাবেন কোথায়?

কোন একটা রেলস্টেশনে আমাকে নামিয়ে দাও।

ড্রাইভার আর কিছু বলল না। তীর বেগে লরি ছোটাল।

ঘণ্টাচারেক বাদে লরি থামল।

ইতিমধ্যে এক জায়গায় লরি থামিয়ে ড্রাইভার চা আর রুটি খেয়ে নিয়েছে।

কুমুদও বৃদ্ধের দেওয়া পাঁচ টাকা ভাঙিয়ে খেয়েছিল!

লরি থামতে ড্রাইভার বলল, এই রাস্তা ধরে চলে যান বাবু। মাইল দুয়েক গেলেই স্টেশন পেয়ে যাবেন।

কুমুদ চলতে আরম্ভ করল। দু-পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে। শুয়োর আর মুরগীর পাল ঘুরছে। পিছনে গমের খেত।

অনেকটা যাবার পর রেলের লাইন দেখা গেল। তারপর স্টেশন।

NOT FOR SALE

খুব ছোট। বোধহয় এখান থেকে বেশী লোক ওঠানামা করে না, প্ল্যাটফর্ম জনশূন্য।

টিকিট ঘরের সামনে গিয়ে দেখল দরজায় তালাবন্ধ।

এধারে নীল শার্ট গায়ে একটা লোক বসেছিল। হাতে গোটানো লাল-নীল নিশান।

কুমুদ বুঝতে পারল লোকটা পোর্টার।

তার সামনে গিয়ে কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, ভাই ট্রেন কখন আসবে?

কোথায় যাবেন?

পাটনা।

আজ আর ট্রেন নেই। শেষ ট্রেন বেলা বারোটা পঞ্চাশে ছেড়ে গেছে।

কোন ট্রেন নেই?

মালগাড়ি আছে। এখান থেকে কাঠবোঝাই হয়ে ছাড়বে।

স্টেশনমাস্টার আসবে না?

না। সেই রাত্রে একবার আসবে। মালগাড়ি ছাড়বার সময়।

কুমুদ মহা সমস্যায় পড়ল।

স্টেশনের গায়ে ছোট একটা চায়ের দোকান। অগত্যা এক পেয়ালা চায়ের আশায় সেখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

বাচ্চা একটা ছোকরা বেঞ্চের ওপর অকাতরে ঘুমাচ্ছে। ঠেলে ঠেলে কুমুদ তাকে উঠিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা বেঞ্চে বসল।

আপনাকে বাঙালী বলে মনে হচ্ছে।

এই বিদেশে বাংলা কথা শুনে কুমুদ চমকে মুখ ফেরাল।

পরনে খাকি শার্ট আর হাফ প্যাণ্ট। মাথায় শোলার টুপি। গায়ের রং কয়লার মতন। জবাফুলের রং দুটি চোখের।

কুমুদ ফিরতেই লোকটা দুটো হাত বুকের কাছে জড় করে বলল, নমস্কার।

কুমুদ প্রতি নমস্কার করে বলল, হ্যাঁ, আমি বাঙালী।

নাম?

কুমুদ নাম বলল।

নিবাস?

নিবাসও কুমুদ বলল।

এখানে আগমনের হেতু?

লোকটার প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই।

NOT FOR SALE

কুমুদ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছে দেখে লোকটাই বলল।

বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে লুকাতে পারবেন না। তা মনের মতন কিছু পেলেন?

কুমুদ বিপদে পড়ল। কি বুঝেছে লোকটা কুমুদ একেবারেই বুঝতে পারল না।

জঙ্গল দেখতে এসেছিলেন তো? কাঠের ব্যবসা? শুনুন মশাই, আমি বিশ বছর এ লাইনে আছি। এদিককার সব জঙ্গল আমার নখদর্পণে। আমি এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

কুমুদ ঠিক করে ফেলল এ ধরনের কথাবার্তা বেশীদূর এগোবার আগে আসল কথাটা বলে ফেলাই ভাল।

ইতিমধ্যে কুমুদের চা এসে গেছে। সঙ্গে বিস্কুট।

ভদ্রতার খাতিরে কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, আপনার?

ব্যস্ত হবেন না। আমাকে ওরা খুব চেনে। ঠিক দিয়ে যাবে।

সত্যি, একটু পরেই বড় পেয়ালায় চা এল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কুমুদ বলল, আমি খুব বিপদে পড়েছি।

বিপদ? কি রকম বিপদ বলুন তো?

আস্তে আস্তে কুমুদ সব বলল।

সব শুনে লোকটা বলল, আপনি প্রাণে বেঁচেছেন মশাই। খুব বেঁচেছেন ওই বদমায়েশরা আপনাকে খতম করে ফেলত।

কুমুদ বলল, আমাকে আপনি বলবেন না, আমার বয়স আঠারো।

আমার বয়স আটত্রিশ। ঠিক আছে তুমিই বলব। তুমি কি কর?

এইবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি।

বাড়িতে কে আছে?

কুমুদ বলল।

বাবা কি করেন? তোমার জন্য নিশ্চয় তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

বাবা খুব নামকরা ডাক্তার। আমার জন্য চিন্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তোমাদের কলকাতায় কি নিজের বাড়ি? মোটর আছে?

কুমুদ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, বাড়ি গাড়ি দুই-ই আছে।

তাহলে একটা কাজ কর। আজ রাতটা ধর্মশালায় কাটিয়ে কাল পাটনা চলে যাও। সেখান থেকে কলকাতা। আমি তোমাকে সঙ্গে করে একেবারে বাড়ি পৌঁছে দেব।

NOT FOR SALE

কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে যে।

কি আবার মুশকিল হল?

আমার সঙ্গে রেলভাড়ার টাকা নেই।

কুমুদের কথা শেষ হবার আগেই দুহাতে পেট চেপে লোকটা হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ার জোগাড়।

কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, আরে এ আবার একটা কথা হল। আমি সব খরচ দেব, তারপর কলকাতায় গিয়ে তোমার বাবার কাছ থেকে না হয় টাকাটা নিয়ে নেব। আর তারই বা দরকার কি। আমার পেটে একটা দারুণ ব্যথা হয়। দিনদুয়েক অজ্ঞানের মতন পড়ে থাকি। ডাক্তার দেখাবার ফুরসতই পাই না। তোমার বাবাকে দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা করব। চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

লোকটা কুমুদকে চায়ের দাম কিছুতেই দিতে দিল না। তাকে প্রায় বগলদাবা করে রাস্তায় নামল।

প্রায় আধ মাইল যাবার পর ধর্মশালা মিলল।

জরাজীর্ণ একতলা। দেয়ালের ফাটলে ফাটলে বট অশ্বত্থের চারা। বাইরের রং আগে কি ছিল, বোঝা মুশকিল।

কুমুদকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে লোকটা বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ঘর খালি আছে কিনা খোঁজ নিয়ে আসি।

কুমুদ একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াল।

সে খুবই ভেঙে পড়েছিল। বাপের কাছে ফিরে যাবার কোন উপায় পাচ্ছিল না। ভগবান সদয়। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে এমন এক মহানুভব মানুষের উদয় হল।

তুলসীর কথা মনে হল। হয়তো এতদিনে তুলসী তার মা-বাপের কাছে ফিরে গেছে। কুমুদের জন্য নানাদিকে জোর তল্লাসী চলছে। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

লোকটা ফিরে এল।

এস, এস, তোমার ভাগ্য ভাল। ছোট একটা ঘর পাওয়া গেছে। একটু বিশ্রাম কর, আমি তোমার বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসব।

লোকটার পিছন পিছন কুমুদ ধর্মশালায় ঢুকল।

সামনের ঘরে একটা টেবিল, একটা চেয়ার।

চেয়ারে দশাসই চেহারার একটি লোক বসে।

NOT FOR SALE

ফর্সা গায়ের রং। কপালে লাল ফোঁটা। টিকিতে ফুল বাঁধা।

কুমুদ সামনে যেতেই লোকটা উঠে দাঁড়াল।

দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে বলল, রাম রাম বাবুসায়েব। আসুন, আসুন। আপনার মতন লোকের জন্য এ ধর্মশালা নয়। চেহারাতেই মালুম হচ্ছে আপনি রইস আদমির ছেলে। কষ্ট করে থাকুন, আর কি করবেন।

কুমুদ লোকটার সঙ্গে আরও এগিয়ে গেল।

পিছনের আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা একতলা বাড়ি।

দরজা খুলে লোকটা বলল, লালাজীর কথা শুনলে তো। কোনরকমে ক'টা দিন এখানে কাটাও, তোমার বাবা না আসা পর্যন্ত। আমার মনে হয় খবর পেলেই তিনি নিজে ছুটে আসবেন।

কুমুদ ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল, কোণের দিকে একটা দড়ির খাটিয়া। এদিকে একটা কাঠের টেবিল আর চেয়ার। কোন জানলা নেই, একেবারে ওপরে ছোট একটা ঘুলঘুলি।

ঘরের চেহারা কুমুদের মোটেই ভাল ঠেকল না। এ ঘরও সেই আগের মতন, যে ঘরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

কুমুদ বলেই ফেলল, এ কি রকম ঘর? আলো বাতাস আসবে কোথা থেকে? জানলা নেই।

লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

এ দেশে যেমন গরম, তেমনই ঠাণ্ডা। এখানে কোন ঘরে জানলা থাকে না। ওপরের ওই ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস আসবে। নাও, তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমি লালাজীর কাছ থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

কুমুদ নিজের ক্লান্ত দেহ কোনরকমে টেনে এনে খাটিয়ার ওপর বসল।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

গায়ে ঠেলা দিতে কুমুদ চমকে বিছানা থেকে উঠে বসল, অস্ফুট চিৎকার করে। সে স্বপ্ন দেখছিল। মূর্তিচোরের দল তাকে তাড়া করেছে। তাদের হাতে হাতে নানারকম অস্ত্র। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কুমুদ তীরবেগে ছুটেছে। লোকগুলো তার নাগাল পাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে কুমুদ পড়ে যেতেই তারা তাকে ধরে ফেলল।

তাই কুমুদ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

কি হল?

NOT FOR SALE

কুমুদ চোখ খুলে দেখল লোকটা একহাতে একটা শালপাতার ঠোঙা নিয়ে খাটিয়ার একপাশে বসে আছে।

দুহাতে চোখ মুছে কুমুদ বলল, বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

নাও, খেয়ে নাও। ঠোঙাতে পুরী আর তরকারি আছে। আর এই লোটাতে গরম দুধ।

লোকটা মেঝের ওপর রেখে একটা লোটা তুলে খাটিয়ার ওপর রাখল।

কুমুদ আর তিলমাত্র দেরি করল না।

ঠোঙা আর তরকারি দুই-ই গরম। কুমুদ যেন অমৃতের স্বাদ পেল।

খাওয়া শেষ করে কুমুদ লোটাতে চুমুক দিল।

ঘন দুধ। বোঝা যায় একবিন্দু জল পড়ে নি।

কুমুদ এবার বলল, একটু জল।

লোকটা তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ভাঁড়ে জল নিয়ে ফিরল।

জল শেষ করে কুমুদ বলল, আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

লোকটা লজ্জায় মাথা নীচু করল। মৃদুকণ্ঠে বলল।

ছি, ছি, ওসব কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না। বাঙালীর ছেলে বিদেশে বিপদে পড়েছ, তোমাকে দেখা আমার কর্তব্য। আমি সেইটুকুই করেছি। নাও, তোমার বাবার ঠিকানা বল।

কুমুদ বলল।

লোকটা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাতে লিখে নিতে নিতে বলল, আমি ভেবে দেখলাম টেলিগ্রাম করে লাভ নেই। অজ পাড়াগাঁ, টেলিগ্রাম কখন গিয়ে পৌঁছায় তার ঠিক নেই, তার চেয়ে চিঠি লেখাই ভাল। তুমি লেখ চিঠিটা।

কথার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা পকেট থেকে একটা কাগজ আর কলম বের করে কুমুদের সামনে রেখে বলল।

নাও, আমি যেমন বলছি, সেরকম লিখে দাও। ঠিক কাজ হবে।

কুমুদ কাগজ টেনে নিয়ে কলম হাতে তৈরি হয়ে বসল।

লোকটা বলে গেল।

শ্রীচরণেষু বাবা,

পত্র পাঠমাত্র বাহকের হাতে দশ হাজার টাকা দিবেন, নতুবা আমার জীবন-সংশয়।

NOT FOR SALE

কিছুটা লিখেই কুমুদ থেমে গেল। জিজ্ঞাসা করল, এর মানে?

লোকটা অমায়িক হাসল।

কোন্ জায়গার মানে বুঝতে পারছ না বাবাজী? এ তো একেবারে সহজ বাংলাভাষা। এ চিঠি নিয়ে যে যাবে, তার হাতে তোমার বাবা দশ হাজার টাকা তুলে দেবেন, নাহ'লে তোমার জীবন্ত ফেরার কোন আশা নেই।

আপনি যে এত নীচ তা তো বুঝতে পারি নি।

বাইরে থেকে আমরা আর কতটুকু বুঝতে পারি বল। তোমার চেহারা দেখেই কি আর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি এত বড়লোকের ছেলে! যাক্, যা বলছি, তা লেখ। দেরি কর না।

যদি না লিখি?

তাহলে যাতে লেখ, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কুমুদের প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়ল লোকটার কপালে।

লোকটা আর্তনাদ করে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

কুমুদ আর কালবিলম্ব না করে খোলা দরজার দিকে ছুটে গেল।

কিন্তু বের হতে পারল না। দরজা আগলে লালাজী।

বেড়াল যেমন ইঁদুরকে তুলে নেয়, তেমনি করে সে কুমুদের ঘাড় ধরে তুলে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কুমুদ পড়ে গেল।

কুমুদের মনে হল তার হাড়গোড় যেন চূর্ণ হয়ে গেল। সে আর উঠতেই পারবে না।

অনেক কষ্টে টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে দেখল লালাজী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে চকচকে ছোরা।

অন্য লোকটা তখনও মাটিতে পড়ে রয়েছে।

লালাজী হুংকার ছাড়ল, এই শয়তান, যা বলা হয়েছে তাই লেখ, নইলে একেবারে খতম করে দেব।

কুমুদের আপত্তি করতে আর সাহস হল না।

আপত্তি করলে এই তেপান্তর মাঠে তাকে মেরে ফেললে কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না।

কুমুদ লিখল। প্রথমে চিঠি, তারপর খামের ওপর ঠিকানা।

NOT FOR SALE

ঠিকানা লেখা শেষ হতে দেখল, লোকটা মেঝের ওপর উঠে বসল। কপালের একটা পাশ সুপুরির মতন ফুলে উঠেছে।

লোকটা কাতর গলায় বলল, উঃ, শয়তান ছেলেটার ঘুষির জোর আছে। এখনও চোখে অন্ধকার দেখছি।

লালাজী এগিয়ে এসে চিঠিটা তুলে নিয়ে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, দত্ত, দেখ তো বদমায়েশটা আমরা যা চাই, তাই লিখেছে কিনা।

কুমুদ বুঝতে পারল লোকটার পদবী দত্ত।

দত্ত চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে বলল, হ্যাঁ, ঠিকই আছে।

লালাজী বলল, তাহলে চিঠিটা নিয়ে তোমার যা করবার কর। আমি ছেলেটার তদারক করি। যদি শুনি এর বাপ টাকা দিতে অস্বীকার করেছে, কিংবা পুলিশের সাহায্য নেবার চেষ্টা করে, তাহলে ছেলের বাপকে ছেলেটার মুণ্ড পার্শ্বেল করে পাঠাব।

এমন ভঙ্গীতে লালাজী কথাগুলো বলল, শুনেই কুমুদ শিউরে উঠল।

একটু পরেই দত্ত আর লালাজী বের হয়ে গেল। বাইরের দরজায় তালা দেবার শব্দ কুমুদের কানে এল।

কুমুদের ব্যায়ামপুষ্ট শরীর। তার বয়সী ছেলেদের তুলনায় সে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু লালাজীর শক্তির কাছে সে যে কিছুই নয় সেটা বুঝতে তার বেশী সময় লাগল না।

অসহ্য একটা যন্ত্রণা সারা দেহে। সে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল।

সম্ভবতঃ এই দত্ত তার বাবার কাছে চিঠিটা নিয়ে যাবে। চিঠিটা পড়েই তার বাবা দত্তর হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দেবেন, এমন মনে হয় না।

বাবা কড়া আর বিচক্ষণ লোক। কলকাতা শহরে গণমান্য লোকের সঙ্গে প্রচুর জানাশোনা। পুলিশ মহলেও খাতির আছে।

দত্তকে কোন রকমে আটকে ঠিক পুলিশে খবর দেবেন।

সে খবর যখন লালাজীর কানে আসবে তখন তার কি অবস্থা হবে ভাবতেই তার সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠল।

যতবার কুমুদ বিপদমুক্ত হবার চেষ্টা করছে, ততবার সে নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়ছে।

তুলসীর কথা মনে পড়ল।

এতদিনে হয়তো নিজের মা বাবার কাছে ফিরে গেছে। কুমুদ কোথায় রয়েছে সেটা জানা তুলসীর পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো সেই পুরানো আস্তানায় সে পুলিশ নিয়ে যেতে পারে।

NOT FOR SALE

কিন্তু সেখানে তো কাউকেই পাবে না।

একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সে উঠে বসল। একটা ছোকরা একটা বাটিতে তরকারী আর একটা থালায় ভাত নিয়ে ঢুকল।

লাল রঙের ভাত। তাও মনে হল আধসেদ্ধ। ভাতের চেহারা দেখে কুমুদের খেতে ইচ্ছা করল না।

কুমুদ বলল শরীর খারাপ। খাব না।

ছোকরাটাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ভাবতে লাগল, একে মোক্ষম একটা ঘুষি মরে কাবু করা শক্ত নয়, তারপর যদি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে কোনরকমে স্টেশনে আশ্রয় নিতে পারে, তাহলে বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে যেতে পারে।

কি করবে ঠিক করার আগেই দরজায় লালাজীর বিরাট দেহ দেখা গেল।

সেই সঙ্গে বাজখাঁই গলার স্বর ভেসে এল।

এ রঘুয়া, কি বলছে শয়তানটা?

রঘুয়া পিছন দিকে ফিরে বলল, বলছে তবিয়ত খারাপ। খাবে না।

লালাজী ঘরে ঢুকল। কুমুদের কাছে এসে খিঁচিয়ে উঠল।

ওসব বেয়াদপি আমার কাছে চলবে না। নে, খেয়ে নে।

রাগে অপমানে কুমুদের মুখ লাল হয়ে উঠল। এভাবে কেউ কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলে নি।

একবার ভাবল, যা হবার হবে, সে প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটার ওপর।

কিন্তু কষ্টে সে নিজেকে সংযত করল। এখন এসব করতে গেলে তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

নিশ্চয় লালাজী একলা নয়। তার অনেক অনুচর আছে। তারা কুমুদকে ছাড়বে না।

তাছাড়া, লালাজীর দৈহিক শক্তির পরিচয় সে আগেই পেয়েছে। কুমুদ মাথা হেঁট করে খেতে আরম্ভ করল।

ভাত শক্ত, তরকারি অসম্ভব ঝাল।

কুমুদের চোখ থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল।

খাওয়া শেষ হতে রঘুয়া থালা বাটি নিয়ে গেল। একটু পরে ফিরল জলের গ্লাস নিয়ে।

জল খেয়ে কুমুদ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

আশ্চর্যের ব্যাপার, দরজা বন্ধ হল না। খোলাই রইল।

NOT FOR SALE

কুমুদ পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

টুল খালি। কেউ নেই।

কুমুদ উঁকি দিয়েই পিছিয়ে এল।

দত্ত আসছে, তার কপালে ব্যাণ্ডেজ।

মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল, ও কুমুদ, তোমার ঘুষির জোর আছে বটে। এখনও আমার মাথাটা ঘুরছে।

কুমুদ কোন উত্তর দিল না। খাটিয়ায় গিয়ে বসল।

দত্ত এগিয়ে এসে খাটিয়ার এক কোণে বসল।

মাথা দুলিয়ে বলল, কলকাতা শহর একটা গোলক ধাঁধা। গলি, উপগলি, চোরাগলির শেষ নেই। কি করে হাওড়া স্টেশন থেকে তোমাদের বাড়ি যাব, একবার তার হদিস দিয়ে দাও তো। হাজার হোক আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক।

কুমুদ এবারেও কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

দত্ত ঠোঁট টিপে হাসল।

কি, বাবুর গোঁসা হয়েছে? আরে চুপ করে থাকলে তোমার নিজেরই ক্ষতি। চিঠিটা নিয়ে যাব, টাকাটা হাতে এলেই, তোমাকে একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে ট্রেনে চড়িয়ে দেব। বলে ফেল, বলে ফেল।

কুমুদও ভেবে দেখল, চুপ করে লাভ নেই। কথা বলাবার ওষুধ এদের কাছে আছে। তাই সে কত নম্বর বাসে হাওড়া থেকে উঠে কোথায় নামতে হবে সে কথা বুঝিয়ে বলল।

দত্ত একটা কাগজে সব লিখে নিল।

৪

কুমুদের বাবা চুপচাপ বাইরের ঘরে বসেছিলেন। ইদানীং তাঁর কিছু ভাল লাগে না। হাসপাতালে, চেম্বারে যান, রোগীও দেখেন, কিন্তু সব সময়ে কেমন অন্যমনস্কভাবে।

সর্বদা ছেলে দুটোর কথা চিন্তা করেন। পারিজাত বক্সির কথামত কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কোন দিক থেকে আজ পর্যন্ত কোন সাড়া পাননি।

কুমুদের মা শয্যাশায়ী। প্রায় অন্নজল ত্যাগ করেছেন।

বাবু, ও বাবু।

চিৎকারে কুমুদের বাবা মুখ তুলে দেখলেন।

NOT FOR SALE

জানলার বাইরে একটা লোক। সাজপোশাক রিকশাচালক বলেই যেন মনে হল। হাতে ছোট একটা ঘটিও রয়েছে।

কি চাই?

একটা চিঠি।

চিঠি? কুমুদের বাবা উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। তাহলে কি বিজ্ঞাপনের উত্তর নিয়ে কেউ এল?

লোকটা হয়তো রিকশায় বসে আছে। চালকের হাতে চিঠিটা পাঠিয়েছে।

ভিতরে এস।

তাকে কুমুদের বাবা ঘরের মধ্যে আসতে বললেন। রিকশাচালক ভিতরে এসে চিঠিটা কুমুদের বাপের দিকে এগিয়ে দিল।

চিঠিটা যখন নিলেন তখন কুমুদের বাবা বুঝতে পারলেন তাঁর হাতের আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে।

চিঠিটা পড়তে পড়তে তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

পনের দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার চাতালে রেখে আসতে হবে। না রাখলে কুমুদকে খতম করে ফেলা হবে। টাকাটা রাখতে হবে সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে।

এই সঙ্গে কুমুদের হাতের চিঠিও রয়েছে। সেও জানিয়েছে দশ হাজার টাকা না দিলে তার প্রাণ সংশয়।

কুমুদের হাতের লেখা তিনি খুব চেনেন। তাঁর ভুল হবার নয়।

এ চিঠি তোমাকে কে দিয়েছে?

মোড়ে এক বাবু ট্যাক্সিতে বসে আছেন। আমার হাতে দুটো টাকা দিলেন, আর বললেন, চিঠিটা লাল বাড়িতে যে ডাক্তার থাকেন তাঁকে দিয়ে আসতে।

চল তো দেখে আসি।

কুমুদের বাবার পরনে ছিল গেঞ্জী আর পাঞ্জাবি। পোশাক পাল্টাবার কথা তাঁর আর মনে হয় না। সেইভাবেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তার ওপর রিকশা ছিল, চালক তাঁকে চড়তে বললেও তিনি রাজী হলেন না। গোটা ছয়েক বাড়ির পরেই চৌরাস্তা। এটুকু রাস্তা তিনি অনায়াসেই হেঁটে যেতে পারেন।

মোড়ের মাথায় কোন ট্যাক্সি দেখা গেল না।

কোথায় ট্যাক্সি?

এইখানেই তো ছিল। বাবু অবশ্য থাকবেন এমন কথা বলেন নি।

NOT FOR SALE

বাবুকে দেখতে কেমন?

খুব ফরসা, মোটাসোটা চেহারা।

বাঙালী?

সেইরকমই মনে হল।

কুমুদের বাবা আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে বাড়িতে ফিরে এলেন।

এখন কি করবেন?

কুমুদের মাকে জানালেই কান্নাকাটি শুরু হবে। তিনি বলবেন ছেলের জীবনের কাছে দশ হাজার টাকা কিছুই নয়। এখনই টাকাটা রেখে আসতে।

কুমুদের বাবার মনের ইচ্ছাও অবশ্য তাই।

কিন্তু যাই করুন পারিজাত বক্সিকে একবার জানানো দরকার।

জামাইয়ের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে। তুলসী কোথায় সে কথা কুমুদ কিছু লেখে নি। হতে পারে এ বিষয়ে তুলসীর বাবাও আলাদা চিঠি পেয়েছে।

সব দিক বিবেচনা করে কুমুদের বাবা ফোন তুলে নিলেন।

ভাগ্য ভাল পারিজাত বক্সি বাড়িতেই ছিলেন।

সব শুনে তিনি বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আধঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে যাচ্ছি।

আধ ঘন্টার আগেই পারিজাত বক্সি এসে গেলেন।

অনেকক্ষণ ধরে চিঠি দুটো পরীক্ষা করে বললেন, এটা আপনার ছেলের হাতের লেখা তো?

হ্যাঁ, ওটা কুমুদের হাতের লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পারিজাত বক্সি কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, মূর্তিচোরেরা সাধারণতঃ এ ধরনের কাজ করে না, তবে কিছুই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। চলুন, রিকশাচালককে একবার দেখাবেন।

দুজনে রাস্তার মোড়ে এলেন।

গোটা চারেক রিকশা সেখানে ছিল। সেই রিকশাচালক গ্লাসে চা খাচ্ছিল, এঁদের দেখে সেলাম করে এগিয়ে এল।

ডাক্তারবাবুকে এ চিঠি তুমি দিয়েছ?

হ্যাঁ বাবু।

যে তোমায় এ চিঠি দিয়েছে সে কি বলেছে।

আমি রিকশা নিয়ে এখানে বসেছিলাম, এক বাবু ট্যাক্সি চেপে এসে হাত নেড়ে আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে যেতে বললেন, লালবাড়িতে যে

NOT FOR SALE

ডাক্তারবাবু থাকেন, তাঁকে এই খামটা দিয়ে এস, আর এই নাও তোমার দু টাকা বখশিশ।

তুমি জিজ্ঞাসা করনি নিজে না গিয়ে এভাবে তোমার হাতে চিঠি পাঠাচ্ছে কেন?

না বাবু, বখশিশ পেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম, ওসব কথা ভাবি নি।

পারিজাত বক্সি আর কিছু না বলে কুমুদের বাবাকে নিয়ে ফিরে এলেন।

নিজের মোটরে উঠতে উঠতে বললেন।

এ চিঠি দুটো আপাততঃ আমার কাছে থাক।

কুমুদের বাবা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, টাকার ব্যাপারে আমি তাহলে কি করব?

এখন কিছু করার দরকার নেই। পনের দিন সময় আছে, তার মধ্যে আপনাকে জানিয়ে দেব।

পারিজাত বক্সি মোটর চালু করলেন, থামলেন এসে লালবাজারে।

সহকারী কমিশনারের ঘরে তাঁর অবারিত দ্বার।

মিস্টার বাসু, দেখুন তো এ হাতের লেখাটা আপনাদের রেকর্ডে আছে কি না।

মিস্টার বাসু চিঠিটা পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তার-ঘণ্টা বাজিয়ে মজুমদারকে ডাকলেন।

মজুমদার আসতে বললেন, এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে মজুমদার, ইনি স্বনামধন্য পারিজাত বক্সি।

মজুমদার দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, ওঁর নামের সঙ্গে আমার খুব পরিচয়।

দেখ তো রেকর্ড থেকে এটা কাদের লেখা হদিস পাও কি না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে মজুমদার বলল, এ তো এখনই হবে না। অনেক রেকর্ড ঘাঁটতে হবে। অন্ততঃ দুটো দিন সময় চাই।

পারিজাত বক্সি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ঠিক আছে, আমি পরশু বিকালে আসব।

পরশু বিকালে যেতেই খবর পেয়ে গেলেন।

মজুমদারই দিল।

বলল, ও হাতের লেখাটা তোরাব আলির।

তোরাব আলি কে?

NOT FOR SALE

নামকরা ডাকাত। চিঠি লিখে লোকের বাড়ি ডাকাতি করতে যেত।

তার ফটো যদি থাকে, দেখাতে পারেন?

তা পরি, কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে।

কি মুশকিল?

তোরাব আলি এখন দমদম জেলে। বছর তিনেক আগে তার সাত বছরের জন্য জেল হয়েছিল।

পারিজাত বক্সি হতাশ হলেন।

কি রকম হল? তোরাব আলি জেল থেকে নিশ্চয় এ চিঠি লেখে নি। সেটা সম্ভব নয়। অন্য কেউ লিখেছে।

মজুমদারকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন।

মজুমদার মনে করিয়ে দিল, ফটোটা দেখে যাবেন না?

দরকার নেই।

পারিজাত বক্সি কুমুদের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি করবেন, ঠিক করেছেন?

কুমুদের বাবা বললেন, আমি ঠিক করেছি, টাকাটা দিয়েই দেব, কারণ কুমুদের প্রাণের দাম আমাদের কাছে দশ হাজার টাকার অনেক বেশী।

বেশ, তাহলে একটা দিন ঠিক করুন। সেদিন আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

দিন ঠিক আর কি। আমি কালই যেতে চাই।

আমি তাহলে ছ'টার মধ্যে আপনার কাছে চলে আসব।

কুমুদের বাবা প্রশ্ন করলেন, আমার নাতি তুলসীর কি হবে?

পারিজাত বক্সি কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুলসী আর কুমুদ এক জায়গায় নেই। থাকলে তুলসীর জন্যও টাকা দাবি করে এ রকম চিঠি আসত।

কুমুদের বাবা স্বীকার করলেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তবুও আপনি একটা কাজ করুন।

কি বলুন?

আপনার জামাইয়ের কাছে একবার খোঁজ নিন।

তখনই কুমুদের বাবা পরিচিত একজনকে তুলসীর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, তুলসীর বাবা যেন লোকটির সঙ্গে চলে আসে।

বিকালেই তুলসীর বাবা এসে পৌঁছাল।

এই ক'দিনেই তুলসীর বাবা উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় আধখানা হয়ে গেছে।

NOT FOR SALE

তার ধারণা হয়েছিল শ্বশুরমশাই বুঝি কুমুদ আর তুলসী দুজনেরই খবর পেয়েছেন। কিন্তু তুলসীর কোন খবর পান নি জেনে মর্মাহত হল।

কুমুদের বাবা জামাইকে চিঠিটা দেখালেন।

এই দেখ, আমি এরকম একটা চিঠি পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম তুলসীর ব্যাপারে তুমিও বুঝি কোন চিঠি পেয়েছ।

তুলসীর বাবা মাথা নাড়ল, না, আমি কিছুই পাইনি। তুলসীর মা তো আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে। আমার ভয় হচ্ছে, সে কোন রকম শক্ত অসুখে না পড়ে যায়।

কুমুদের বাবা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

শরীর খারাপ করে লাভ কি। বিপদের মুখে এভাবে ভেঙে পড়ে তো কোন লাভ নেই। পারিজাতবাবুর ধারণা, কুমুদ আর তুলসী এক জায়গায় নেই। থাকলে তুলসীর জন্যও এরকম টাকা দাবি করে চিঠি আসত। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কুমুদকে যদি ফিরে পাই, তা হলে তার কাছে হয়তো তুলসীর খবর পেতে পারি।

তুলসীর বাবা কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

তারপর বলল, আপনি কুমুদের ব্যাপারে কি করবেন ঠিক করেছেন?

আমি তো টাকাটা দেব বলেই ঠিক করেছি।

তাহলে কি কুমুদকে পেয়ে যাবেন?

কুমুদের বাবা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

কেন, এ কথা বলছ কেন?

এ ধরনের কাহিনীতে পড়েছি দশ হাজার টাকা হাতে পেলে এদের লোভ বেড়ে যায়। আরো বেশী টাকা দাবি করে বসে।

অবশ্য কিছুই অসম্ভব নয়, তবে আমরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। মাত্র পনের দিন সময়। এর মধ্যে টাকা না দিতে পারলে ওরা কুমুদকে শেষ করে দেবে। একটা মানুষের প্রাণের দাম ওদের কাছে কানাকড়িও নয়।

ভোর পাঁচটায় কুমুদের বাবার বাইরের ঘরে কলিং বেল বেজে উঠল।

কুমুদের বাবা ওপর থেকেই শুনতে পেলেন, নীচে চাকর রঘু কার সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে কুমুদের বাবা দেখলেন, রঘুর সামনে একটা ভিখারি দাঁড়িয়ে। পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি, শতচ্ছিন্ন কাপড় হাঁটু পর্যন্ত। চুলে মাটি মাখা। গালের একদিকে দগদগে ঘা।

NOT FOR SALE

কে রে রঘু?

জানি না বাবু, বলছে আপনার সঙ্গে নাকি কি জরুরি দরকার আছে।

কুমুদের বাবার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কুমুদকে যারা আটকে রেখেছে, সেই দলের কেউ নয় তো। হয়তো টাকার ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছে, ইডেন গার্ডেনে নয়, অন্য কোথাও টাকাটা রেখে আসতে হবে।

তাই কুমুদের বাবা রঘুকে বললেন, ঠিক আছে, তুই যা, আমি দেখছি।

রঘু চলে যেতে ভিখারিটা কয়েক পা এগিয়ে বলল।

আমি পারিজাত বক্সি। আমি আগে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আপনি সাতটা নাগাদ চলে আসুন। ওখানে আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন না।

কুমুদের বাবা ঘাড় নাড়ল, ঠিক আছে।

কুমুদের বাবা যখন ইডেন গার্ডেনে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। তিনি সঙ্গে ড্রাইভার নেন নি। নিজেই মোটর চালিয়ে গিয়েছিলেন।

প্যাগোডার কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন, ঘাসের ওপর পারিজাত বক্সি বসে। তাঁর সামনে একটা থালা। চেঁচিয়ে ভিক্ষা চাইছে।

কুমুদের বাবা এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে বড় একটা খাম বের করে প্যাগোডার চাতালে রেখে দিলেন। আশেপাশে দু-একজন লোক পায়চারি করছে। এত সকালে ভিড় নেই।

কুমুদের বাবা খামটা রেখে সরে গেলেন নিজের মোটরের কাছে।

একটু পরেই একটা জীপ এসে দাঁড়াল। তার মধ্য থেকে পুলিশের পোশাক পরা একদল লোক বেরিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে খামটা তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে এল।

জীপে বোধহয় স্টার্ট দেওয়াই ছিল। লোকটা উঠে বসতেই জীপ ছুটতে শুরু করল।

পারিজাত বক্সি আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছুটে রাস্তার ওপর চলে এলেন।

মিনিট দুই তিন, তার মধ্যেই পারিজাত বক্সি কুমুদের বাপের মোটরে উঠে জীপটাকে অনুসরণ করলেন।

সোজা গঙ্গার কূল ঘেঁষে জীপ আর মোটর দৌড়াল। সন্ত্রস্ত পথচারী দুপাশে ছিটকে গেল।

NOT FOR SALE

ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে মোটর জীপের কাছাকাছি এসে গেল।

হঠাৎ গুরুম করে একটা শব্দ।

জীপ থেকে কে একজন নির্ভুল লক্ষ্যে মোটরের সামনের টায়ারে গুলি করল।

তীব্র আওয়াজ করে টায়ার ফাটল। মোটর ডানদিকে রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

এদিকে ফাঁকা মাঠ। দূরে সেনাদের ছাউনি।

অনেক কসরত করে পারিজাত বক্সি মোটর থামালেন।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে কুমুদের বাবার দিকে ফিরে বললেন।

তাই ত, ব্যাটারা পালাল। আপনার নোটগুলোর নম্বর সব লেখা আছে তো?

চিন্তায়, ভয়ে কুমুদের বাবা অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি কোনরকমে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, আছে।

সব ব্যাঙ্কে আগেই আমরা বেতারে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। সেসব জায়গায় নোট ভাঙাতে গেলেই মুশকিলে পড়বে।

কুমুদের বাবা শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কুমুদের কোন ক্ষতি হবে না তো?

ক্ষতি আর কি হবে? ওরা টাকা চেয়েছিল, টাকা আপনি দিয়েছেন। এবার চুক্তিমত কুমুদকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কথা বলতে বলতেই পারিজাত বক্সি জ্যাক দিয়ে মোটর তুলে টায়ার বদলি করে ফেললেন।

তারপর মোটরে উঠতে কুমুদের বাবা প্রশ্ন করলেন, এবার কোন্ দিকে যাবেন?

চলুন, একটু এগিয়ে দেখা যাক, যদি জীপটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়। জীপটার নম্বর আমি দেখে নিয়েছি, কিন্তু জানি সে দেখা কোন কাজে লাগবে না। কারণ নিশ্চয় ওটা ভূয়া নম্বর।

মোটর খিদিরপুর পৌঁছল। কোথাও জীপের চিহ্ন নেই।

মোটর একপাশে রেখে পারিজাত বক্সি নেমে পড়লেন।

কুমুদের বাবাকে অপেক্ষা করতে বলে রাস্তার ওপারে একটা সরাইখানায় গিয়ে ঢুকলেন।

NOT FOR SALE

নোংরা পরিবেশ। জন চারেক লোক বসে চা খাচ্ছে। এদিকে কাউন্টারের পিছনে হৃষ্টপুষ্ট একটি লোক ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে। সেই বোধহয় মালিক।

তার কাছে গিয়ে পারিজাত বক্সি বললেন, ওসমানকে একটু দরকার।

লোকটা নেমে ভিতরে চলে গেল।

একটু পরেই লুঙ্গিপরা বেঁটে একটি লোক সেলাম করে এসে দাঁড়াল। তার গলায় রুমাল বাঁধা, একটা চোখ কানা।

তাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রাস্তায় খুব জোরে কোন জীপ যেতে দেখেছ ওসমান?

ওসমান মাথা নাড়ল, না।

তোমাদের এখানে অনেকেই তো হাজার টাকার নোট ভাঙাতে আসে?

আসে, সে তো আপনি জানেনই।

শোন, এই নম্বরগুলো রেখে দাও, যদি এসব নম্বরের নোট কেউ ভাঙাতে আসে, আমাকে একটা খবর পাঠাতে পার? খবর পাঠাবে আর লোকটাকে আধ ঘন্টাখানেক আটকে রাখবে কোন ছুতোয়। আমার ফোন নম্বর তো তোমার জানা।

তা জানা, তবে মালিককেও একবার বলে যান।

পারিজাত বক্সি মালিককে বলে মোটরে এসে উঠলেন।

মোটরের মধ্যে কুমুদের বাবা চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে।

তাঁর মনের অবস্থা পারিজাত বক্সি বুঝতে পারলেন।

তিনি ভাবছেন, গোয়েন্দা ব্যাপারটার কোনই কূলকিনারা করতে পারলেন না।

লোকগুলো টাকাও নিল, হয়তো তার ছেলেকেও খতম করে দেবে।

পারিজাত বক্সি মোটর ঘুরিয়ে নিলেন।

রাত আটটা নাগাদ পারিজাত বক্সির বাড়ির ফোন বেজে উঠল।

পারিজাত বক্সি বসে বসে একটা বই পড়ছিলেন, লাফিয়ে উঠে ফোন ধরলেন।

স্যার আমি ওসমান, শীগগির চলে আসুন। একটা নম্বরী নোট নিয়ে একজন এসেছে।

পারিজাত বক্সি যেমন পোশাকে ছিলেন, তেমনিভাবেই নেমে গেলেন। মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে গেলেন।

NOT FOR SALE

ওসমান দোকানের বাইরে পায়চারি করছিল, পারিজাত বক্সিকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, আসুন স্যার, ওই যে মালিকের পাশে বসে আছে।

পারিজাত বক্সি ভিতরে ঢুকলেন। আড়চোখে দেখলেন, কাউন্টারের পিছনে মালিকের পাশে কালো রোগা একটা লোক বসে আছে।

পারিজাত বক্সি সোজাসুজি লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শোন, এদিকে এস।

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

হাজার টাকার নোটটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

লোকটা নির্বাক্। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বার দুয়েক প্রশ্নের পরই পারিজাত বক্সি হুংকার ছাড়লেন।

চাবকে তোমার পিঠের ছাল তুলে দেব, আমাকে তুমি চেন না। এখন টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাব। বল, নোটটা কোথায় পেয়েছ?

এবার লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুজুর মা-বাপ, নোটটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

খিদিরপুরের পথে ঘাটে নোট কুড়িয়ে পাওয়া যায় নাকি?

বিশ্বাস করুন হুজুর, ডকের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি।

বুঝতে পেরেছি, ভাল কথায় হবে না। ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। একে ধরে রাখ তো, আমি আসছি।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে খান তিনেক বাড়ি পরে এক ডাক্তারখানায় ঢুকে খিদিরপুর থানায় ফোন করলেন, নিজের পরিচয় দিয়ে।

মিনিট পনের পর দারোগা দুজন কনস্টেবল নিয়ে এসে হাজির।

লোকটা দারোগার সামনেও এক কথা বলল।

ডকের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি।

দারোগা কড়া ধমক দিল।

কুড়িয়ে পেয়েছিলে তো থানায় জমা দাও নি কেন?

বোবার শত্রু নেই। লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা লোকটাকে টানতে টানতে জীপে নিয়ে তুলল।

তাদের পিছনে পারিজাত বক্সি মোটর চালালেন।

লোকটাকে মোটেই নিরীহ মনে হচ্ছে না।

থানায় ধমক দিলে হয় তো কিছু বের হতে পারে।

কিন্তু না, থানাতেও লোকটার মুখ থেকে একটা কথাও বের করা গেল না।

NOT FOR SALE

তখন পারিজাত বক্সি দারোগাকে একপাশে ডেকে ফিসফিস করে কি বললেন।

দারোগা লোকটাকে বলল, যা ব্যাটা, আজ তোকে ছেড়ে দিলাম। তোর নাম-ধাম বলে যা। নোটটা আটকে রাখলাম, মালিককে দিয়ে দেব।

লোকটা নাম বলল, রতন পাঁড়ে। বর্তমান নিবাস মোমিনপুর। সবে ছাপরা থেকে এসেছে, এখনও কোথাও চাকরি পায় নি।

রতনকে ছেড়ে দিতে সে থানার বাইরে এসে এদিক ওদিক দেখল, তারপর রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করল।

অনেক পিছনে মোটরে পারিজাত বক্সি তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

প্রায় মাইল দেড়েক। লোকালয় শেষ হয়ে একটা মাঠ। তার পাশে কয়েকটা টিনের ঘর।

রতন একটা টিনের ঘরের দরজায় তিন বার টোকা দিল।

টুক, টুক, টুক।

ভিতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, এস।

পারিজাত বক্সি একটা গাছের ছায়ায় অন্ধকারে মোটর রেখে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন।

রতন ভিতরে ঢুকতে পারিজাত বক্সি টিনের ফুটোর ওপর চোখ রাখলেন।

টেবিলের ওপর হ্যারিকেন জ্বলছে। চেয়ারে দীর্ঘকায় লোক। পরনে শার্ট আর প্যান্ট। কপালের এক পাশে একটা কাটার দাগ।

তার সামনে রতন।

কি হল, নোটের খুচরো পাওয়া গেল না?

আজ্ঞে না, পারিজাত টিকটিকি পিছনে লেগে সব ভেস্তে দিয়েছে।

তাহলে ছেলেটার বাবা টিকটিকি লাগিয়েছে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

পারিজাত বক্সি কোমরে হাত ছোঁয়ালেন। রিভলবারটা ঠিকই আছে।

ভাবলেন, রিভলবারটা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢোকার এই উপযুক্ত সময়।

রিভলভারটা হাতে নিয়ে ঢুকতে যাবার মুখেই বাধা।

পিছন থেকে কে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানল।

চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার। সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরে উঠল। পারিজাত বক্সি পড়ে গেলেন।

NOT FOR SALE

যখন জ্ঞান হল দেখলেন একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। সেই টিনের ঘর কিন্তু নয়। পাকা বাড়ি।

কাছেই একটা চেয়ারে সেই দীর্ঘকায় লোকটা।

পারিজাত বক্সি চোখ খুলতেই লোকটা বলল।

কি পারিজাতবাবু, শরীর এখন কেমন?

কোন উত্তর না দিয়ে পারিজাত বক্সি প্রথমে মাথায় হাত দিলেন। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। এখন অল্প অল্প ব্যথা রয়েছে। কোমরে হাত দিয়ে দেখলেন রিভলবার নেই।

লোকটা হেসে বলল, যন্ত্রটা সরিয়ে রেখেছি। যদি হাত লেগে গুলি বেরিয়ে যায়।

পারিজাত বক্সি চুপ করে রইলেন।

কুমুদের বাবা কে?

তারপর কুমুদের বাবা আপনাকে কত টাকা দিয়েছে?

বোকা সাজবার চেষ্টা করবেন না, তাতে ফল হবে না। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সরে দাঁড়ান, নইলে খুব বিপদে পড়ে যাবেন।

খুব যে ভয় পেয়েছে, পারিজাত বক্সির মুখচোখে এমন কোন ভাব ফুটল না। বরং তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, বিশ্বাস করুন। কিছু জাল নোট বাজারে কারা ছড়িয়েছে। সেই ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

এবার লোক ভ্রু কোঁচকাল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, জাল নোট?

হ্যাঁ, তারই একটা আপনার লোক ভাঙ্গাতে গিয়েছিল।

লোকটা নিজেকে সামলে নিল। চাপা গলায় বলল।

ঠিক আছে। নোটগুলো না হয় জাল, কিন্তু ছেলেটা তো আর জাল নয়। যে আমাদের হাতের মুঠোয় আছে। আপনাকেও কিছুদিন আমাদের আশ্রয়ে থাকতে হবে। নোট ভাঙ্গাতে নানাদিকে লোক গেছে, তাদের রিপোর্ট শোনা যাক।

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

শুয়ে শুয়ে পারিজাত বক্সি দেখলেন লোকটা দরজা বন্ধ করে তালা দিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

NOT FOR SALE

আস্তে আস্তে পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন। জানলা নেই, অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি। এত ছোট যে তার মধ্য দিয়ে কোন পূর্ণবয়স্ক লোকের যাওয়া সম্ভব নয়।

পারিজাত বক্সি দেয়ালে কান পাতলেন। জলের শব্দ খুব স্পষ্ট। একেবারে পাশেই বোধহয় নদী।

দুটো হাত পিছনে রেখে পারিজাত বক্সি পায়চারি শুরু করলেন।

এখান থেকে পালানো অসম্ভব। কতদিন এভাবে বন্দী থাকতে হবে কে জানে! এরা কি কুমুদকে ছেড়ে দেবে? এক হাজার টাকা থানা আটকে রেখেছে। খুব সম্ভবতঃ এই এক হাজার টাকার জন্য এরা কুমুদের বাবাকে আবার চিঠি দেবে।

কিন্তু পারিজাত বক্সি বন্দী। পরামর্শ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

খট করে শব্দ হতে পারিজাত বক্সি ঘুরে দাঁড়ালেন।

দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকল। এক হাতে এক মগ চা, অন্য হাতে দু খানা রুটি।

সে চেয়ারের ওপর সবকিছু নামিয়ে রেখে হিন্দীতে বলল, নিন, খেয়ে নিন। আমি বাসন নিয়ে যাব।

পারিজাত বক্সি খাটিয়ায় বসে বললেন, আচ্ছা ভাই, যমুনার ঢেউয়ের এত শব্দ তো আগে শুনি নি।

লোকটা নিজের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে বলল, এখানে আবার যমুনা কোথায়? এ তো গঙ্গা। হরিহরপুরের গঙ্গার পার দেখা যায় না। আর কি ঢেউ!

পারিজাত বক্সি বুঝতে পারলেন, জায়গার নাম হরিহরপুর। পাশেই গঙ্গা নদী।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার বললেন, এখানে আর একটা ঘরে যে ছেলেটা রয়েছে তাকে চা দেওয়া হয়েছে?

লোকটা কিছুক্ষণ পারিজাত বক্সিকে একদৃষ্টে দেখল, তারপর বলল, ভীষণ বদমাইশ ছেলে। রোজ খাবার সময় ঝামেলা করে। একদিন তো আমার ঘাড়ে আচমকা ঝাঁপিয়েই পড়েছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে পারবে কেন? আমি তাকে—

এই পর্যন্ত বলে লোকটা হঠাৎ থেমে গেল। বোধহয় ভাবল, এত সব কথা এই বাবুকে বলা হয় তো উচিত হয় নি।

NOT FOR SALE

এর বেশী আর পারিজাত বক্সির শোনারও দরকার ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন এখানেই কুমুদ কিংবা তুলসী বন্দী রয়েছে। তবে কুমুদ হবার সম্ভাবনাই বেশী, কারণ এরা কুমুদের বাপের কাছেই টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল।

লোকটা বাইরে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল।

পারিজাত বক্সি দু হাতে নিজের চুল মুঠোয় ধরে চুপচাপ বসে রইলেন।

তাঁর এত দিনের গোয়েন্দা জীবনে এরকমভাবে বিপদে আর পড়েছেন বলে মনে করতে পারলেন না।

এটুকু বুঝতে পারলেন, হয়তো এরা তাঁর প্রাণহানি করবে না। কুমুদের বাবার কাছ থেকে টাকাটা পেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবে। বাকী এক হাজার টাকা।

কিন্তু পারিজাত বক্সির যে হার হল সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।

যেমন করে হোক উপায় একটা বের করতেই হবে।

পারিজাত বক্সি পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে ঘুলঘুলির দিকে দেখতে লাগলেন।

ঘুলঘুলিটা কোন কাজে লাগবে এমন মনে হল না। তবে বাইরের পৃথিবীর শব্দ ওই ঘুলঘুলিটা দিয়েই এঘরে ঢুকছে।

রাত হল। কোন বাতির ব্যবস্থা নেই। ঘন অন্ধকার।

এক সময়ে আবার দরজা খুলে গেল।

লোকটা একটা থালায় ভাত, কিছু তরকারি আর বাটিতে ডাল নিয়ে ভিতরে ঢুকল। সবগুলো চেয়ারে রেখে মেঝের ওপর বসে পড়ল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আমি বাসনগুলো নিয়ে যাব।

লোকটার আর এক হাতে জ্বালানো হ্যারিকেন। হ্যারিকেনটাও সে চেয়ারের ওপর রাখল।

ভাত তরকারির চেহারা দেখে পারিজাত বক্সির সে সব ছুঁতে ইচ্ছা হল না কিন্তু না ছুঁয়েই বা উপায় কি। না খেলে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়বেন।

কোন রকমে খাওয়া শেষ করলেন।

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলেন, লোকটা বসে বসে ঢুলছে।

পলকের জন্য লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাবু করে তার কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে কুমুদকে উদ্ধারের চেষ্টা করলে হয় না!

একটু ভাবলেন। না, এত তাড়াতাড়ি ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হবে না।

NOT FOR SALE

বাইরে আরও লোক পাহারায় আছে কিনা বলা যায় না। ধরা পড়লে পারিজাত বক্সিকে আরও কড়া শাসনে রাখবে। কিংবা দূরে কোথাও সরিয়ে দেবে। দুর্গম জায়গায়।

খাওয়া শেষ হতে বাসনপত্র আর হ্যারিকেন নিয়ে লোকটা যাবার সময় পারিজাত বক্সি বললেন, ভাই, হ্যারিকেনটা রেখে যাও না। অন্ধকারে থাকব।

লোকটা যেতে যেতে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, হুকুম নেই।

পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসে রইলেন। রাত বাড়ল। খাটিয়ার ওপর শুধু একটা বালিশ। বেশ জোলো বাতাস বইছে। এক সময় পারিজাত বক্সি শুয়ে পড়লেন।

সকাল হতেই দীর্ঘকায় লোকটি ভিতরে ঢুকল।

তখনও পারিজাত বক্সি বিছানায় শুয়ে।

নমস্কার বক্সি সায়েব, ভাল আছেন?

পারিজাত বক্সি উঠে বসলেন।

বললেন, কি করে ভাল থাকব। স্নান করতে পারছি না। রাতে একটা আলো নেই।

লোকটা হাসল, আরে স্নান করার ব্যবস্থা করে দেব। আর আলো? আপনি এত সাহসী পুরুষ, আপনার আলো কি হবে?

পারিজাত বক্সি হেসে বললেন, আর কিছু নয়, আমার ছুঁচোর ভয় খুব বেশী। অন্ধকারে ছুঁচোর উপদ্রব বেশী হয় কিনা।

লোকটি কি বুঝল কে জানে, কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে তারপর বলল।

কুমুদের বাবার কাছে চিঠি চলে গেছে। আশা করছি বাকী হাজার টাকা পেতে দেরি হবে না। বিশেষ করে যখন আপনার মতন পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে না।

আপনি কেন বারবার আমাকে জড়াচ্ছেন বলুন তো? কে কুমুদ, তার বাবাই বা কে, কিছুই জানি না! সরকার থেকে আমাকে নিয়োগ করেছে।

বক্সি সাহেব, আপনি বেড়ান ডালে ডালে, আমরা বেড়াই পাতায় পাতায়। যাক, এ নিয়ে অযথা কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। আপনার মাথার চোটটা কি রকম?

পারিজাত বক্সি হাসলেন।

চোটটা একটু কম। আপনার শাগরেদ তেমন জোরালো আঘাত করতে পারে নি।

NOT FOR SALE

জোরালো আঘাত করার নির্দেশ আমার ছিল না। আচ্ছা উঠি। আপনার স্নানের জল যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।

লোকটা বেরিয়ে গেল।

দুপুরের একটু আগে বড় এক বালতি জল আর গামছা এল। তারপর যথারীতি খাবারও! বিকালে চা।

তারপরই পারিজাত বক্সি কাজ শুরু করলেন।

চেয়ারটা বার কতক খাটিয়ার সঙ্গে ঠুকে ঠুকে একটা পায়া খসিয়ে ফেললেন।

ঘুলঘুলি দিয়ে ফিকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আজ আর অন্ধকার নয়।

পারিজাত বক্সি ঠিক করে নিলেন, যা হবার হবে, এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

দরজায় খুট করে শব্দ হতেই চেয়ারের পায়াটা হাতে নিয়ে পারিজাত বক্সি দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

দরজা খুলল। লোকটা হ্যারিকেন হাতে ঢুকে হ্যারিকেনটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে আবার বাইরে গেল।

ভাতের থালা আর তরকারির বাটি বাইরে রেখেছিল, সেগুলো নিয়ে আবার ভিতরে ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গে পারিজাত বক্সি চেয়ারের পায়া দিয়ে তার মাথার পিছনের দিকে সজোরে আঘাত হানলেন। একটা হাত দিয়ে লোকটার মুখ চেপে ধরলেন, যাতে তার আর্তনাদ না বের হয়।

লোকটা মেঝের ওপর পড়ে গেল। হাত থেকে থালা আর বাটি ছিটকে পড়ল।

তারই পরনের ধুতির কিছুটা খুলে পারিজাত বক্সি লোকটার মুখ আর দুটো হাত বাঁধলেন, তারপর লোকটার কোমর হাতড়ে চাবির রিং খুলে নিলেন।

রিংয়ে তিনটে চাবি।

চাবিগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে পারিজাত বক্সি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

NOT FOR SALE

৫

আচ্ছন্ন অবস্থাতেই তুলসী বুঝতে পারল লোকটা তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একটা মোটরে ওঠাল।

কিন্তু মোটর বেশীদূর গেল না। একটু গিয়েই দারুণ ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল। লোকটা নেমে মোটরের বনেট খুলে কিছুক্ষণ কি দেখল, তারপর বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে তুলসীকে কাঁধে তুলে নিল।

রাস্তা ছেড়ে লোকটা জঙ্গলে নামল। ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে কালো পাথরের চাঙড়।

দু একবার লোকটা হোঁচট খেল। নিজেকেই নিজে গালি দিল। তারপর বড় একটা পাথরের ওপর তুলসীকে নামিয়ে দিল।

তুলসী চোখ পিটপিট করে দেখল। পাশেই একটা ঝর্ণা। লোকটা দুটো হাত জোড় করে জল নিচ্ছে। বোধহয় তৃষ্ণার্ত।

কিন্তু না, জল নিয়ে এসে লোকটা তুলসীর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল।

একটু পরেই তুলসীর আচ্ছন্নভাব কেটে গেল। সে উঠে বসল।

কি রে শয়তান, এবার কি হবে? লোকটা দাঁত চেপে বলল।

তুলসী কোন উত্তর দিল না।

গিরিধারীকে বেকায়দায় পেয়ে ঘায়েল করে পালিয়েছিলি, এবার তোকে কে বাঁচায় দেখি। তার আগে আমার একটা কথার জবাব দে। তোরা দুটো পুলিশের চর। চারদিকে মূর্তি চুরি হচ্ছে বলে লুকিয়ে মন্দির পাহারা দিচ্ছিলি। তারপর আমাদের লরিতে লাফিয়ে পড়েছিস, ঠিক কিনা?

তুলসী মাথা নাড়ল, না। আগেও তো বলেছি, পুলিশের সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। আমরা এমনি বেড়াব বলে তোমাদের লরিতে উঠেছিলাম।

লোকটা মুখ বেঁকিয়ে হাসল। বলল, ভোর রাত্রে বেড়াতে উঠেছিলি? কি করে তোর কাছ থেকে কথা বের করতে হয় সে ওষুধ আমার জানা আছে। মূর্তিগুলো নিরাপদে চালান হয়ে যাক, তারপর তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করব। নে ওঠ।

লোকটা তুলসীর একটা হাত ধরে এমন জোরে টান দিল যে তুলসীর মনে হল, কাঁধের হাড়গুলো বুঝি খুলেই গেল।

তুলসীকে লোকটা টানতে টানতে নিয়ে চলল। বনবাদাড় পার হয়ে ছোট একটা পাহাড়। ঘোরানো পায়ে চলা পথ। দু ধারে কাঁটাগাছের ঝোপ।

NOT FOR SALE

পাহাড়ের অর্ধেকটা উঠতেই দেখা গেল একেবারে ওপরে একটা মন্দির। জরাজীর্ণ। আকার থেকে মনে হল শিবের মন্দির।

লোকটা তুলসীকে সেই মন্দিরের সামনে নিয়ে এল।

মন্দিরের দরজা নেই। দরজার জায়গায় ছোট একটা গর্ত। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়।

এবার লোকটা তুলসীর ঘাড় ধরে গর্তের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, যা ভিতরে। এখানে দিন দুয়েক থাকলেই শায়েস্তা হবি। পরশু এসে তোর খোঁজ করব, অবশ্য যদি বেঁচে থাকিস।

লোকটা জোর করে তুলসীকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, তারপর বিরাট একটা পাথর নিয়ে এসে গর্তের মুখ আড়াল করে দিল।

তুলসী গড়িয়ে পড়ল। বেশ অন্ধকার। প্রথমটা কিছুই চোখে দেখতে পেল না। তারপর একটু একটু করে অন্ধকার চোখে সহ্য হয়ে আসতে দেখল, ঠিকই আন্দাজ করেছিল। শিবমন্দির। মাঝখানে ছোট একটি শিবলিঙ্গ। কালো পাথরের। বোঝা যায়, এখানে সাত জন্মে কেউ পূজা দিতে আসে না। শান বাঁধানো মেঝের চারদিকে ফাটল। দেয়াল একেবারে চৌচির। সাপ লুকিয়ে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়।

এখানে তুলসী কি করে কাটাবে ভেবে পেল না। একে তো এই পরিবেশ, তার ওপর খিদেয় পেটের মধ্যে দারুণ মোচড় দিচ্ছে। বসে থাকতে পারছে না।

লোকটা বলে গেল বটে পরশু আসবে, কিন্তু আসবে যে তার কোন স্থিরতা নেই। তুলসীর মতন একটা ছেলে মরল কি বাঁচল, লোকটা কি তার পরোয়া করে!

তুলসী আস্তে আস্তে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ঘুম আসতে মোটেই দেরি হল না।

প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে তুলসীর ঘুম ভাঙল। মুখে রোদ লেগে।

চমকে তুলসী উঠে বসল। চারদিক বন্ধ, অথচ রোদ আসছে কোথা থেকে?

এদিক ওদিক দেখতেই চোখে পড়ল।

পাশের দেয়াল অনেকটা ফাটা। চোখ রাখলে বাইরের আকাশ, কিছু গাছ নজরে আসে। কিন্তু সেখান দিয়ে মানুষের পালানো অসম্ভব।

NOT FOR SALE

তবু তুলসীর মনে ক্ষীণ আশা ফুটে উঠল। বাইরের জগৎ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। এই ফাটল দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাবে। পাখির গান, জন্তুদের চিৎকার ভেসে আসবে।

তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। ঠিক শিবলিঙ্গের নীচে লোহার একটা পাইপ। সেই পাইপটা দেয়াল ফুটো করে বাইরে গিয়ে পড়েছে।

বোঝা গেল এক সময় এ মন্দিরে লোকসমাগম হত। লোকেরা শিবলিঙ্গে জল ঢালত। সেই জল যাতে মন্দিরে না জমে, তাই এই পাইপের ব্যবস্থা।

তুলসী নীচু হয়ে পাইপটা ধরে টান দিল। একবার, দুবার, তিনবার। সে শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে।

কয়েকবার হেঁচকা টানের পর পাইপটা বেঁকে গেল। এক জায়গা মরচে পড়েছিল।

তুলসী পাইপটা কয়েকবার নাড়াতেই সেটা খুলে গেল।

বেশ ভারী পাইপ। শাবলের কাজ করতে পারে।

তুলসী পাইপটা তুলে নিয়ে সবেগে ফাটলের ওপর আঘাত করতে লাগল। পাথরের দেয়াল। অনেক দিনের পুরানো হলেও শক্ত।

কিন্তু ফাটলের মধ্যে ঘা মারতে মারতে পাথরের টুকরো খসে খসে পড়ল। দারুণ উৎসাহে তুলসী আরও জোরে ঘা দিতে লাগল।

এক ঘন্টা চেষ্টার পর একটা মানুষ যাবার মতন ফাঁক হল।

তুলসী আর অপেক্ষা করল না। কিছু বলা যায় না। লোকটা বলে গেছে পরশু আসবে। কথাটা হয়তো মিথ্যা। হঠাৎ যদি ফিরে আসে, তাহলে তুলসীর কাণ্ড দেখলে তাকে আর আস্ত রাখবে না।

তুলসী নিজের দেহটা সন্তর্পণে ফাঁকের মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিল।

বেরোবার সময় পাথরের খোঁচা লেগে শরীরের দু এক জায়গা কেটে গেল। তুলসী ভ্রুক্ষেপ করল না।

বাইরে লাফ দিয়ে পড়তেই ঢালু জায়গায় গড়াতে শুরু করল। টাল সামলাতে পারল না। গড়াতে গড়াতে এক গাছের গুঁড়িতে গিয়ে আটকাল।

প্রথমবার কোন রকমে লরি থামিয়ে তুলসী তাতে উঠে পড়েছিল।

কিন্তু এখান থেকে রাস্তা অনেক দূরে। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। অন্ধকারে অরণ্যের চেহারা বদলে যায়। মাটির তলা তো নিরাপদ নয়ই, গাছের ওপরেও ভয় নেই, এমন কথা বলা যায় না।

NOT FOR SALE

সাপ থাকতে পারে। চিতাবাঘ গাছে উঠতে অভ্যস্ত।

তবু এই মন্দিরের আওতা থেকে দূরে সরে যেতেই হবে।

তুলসী ছুটতে শুরু করল। দেহে একটুও শক্তি নেই। বার বার কাঁটাগাছে দুটো পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

তুলসী থামল না।

পাহাড় থেকে নেমে একটু দাঁড়াল। ঠিক কোন দিক দিয়ে এসেছিল, আধ-অন্ধকারে বুঝতে পারল না। পায়ে চলা পথ তিন চার দিকে গিয়েছে। তারই একটা ধরে তুলসী ছুটল।

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এল। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। হঠাৎ দূরে শেয়াল ডেকে উঠল।

তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এগোনো সম্ভব নয়। এগোনো নিরাপদও নয়। সামনে একটা গাছ। কি গাছ তুলসী নাম জানে না।

রাতটা গাছে কাটানো ছাড়া উপায় নেই। তুলসী ডাল ধরে গাছে উঠে পড়ল।

একটা ডাল থেকে আর একটা ডালে পা রাখতে গিয়েই থেমে গেল। হিস্ হিস্ করে শব্দ।

ম্লান জ্যোৎস্না, কিন্তু তাতেই বেশ দেখা গেল।

কুচকুচে কালো শরীরের রং, চেরা জিভ, প্রসারিত ফণা সামনে যেন যমের দূত।

আর একটু হলেই তুলসীর মুখে ছোবল দিত।

তুলসী গ্রামের ছেলে। বিষাক্ত সাপও সে অনেক দেখেছে, কিন্তু এরকম ভয়াল দর্শন সাপ তার নজরে পড়েনি।

তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে তুলসী পা পিছলে নীচে পড়ল।

মন্দির থেকে বের হবার সময় আগেই তার শরীরে আঘাত লেগেছিল, এবার কাঁটাঝোপের ওপর গিয়ে পড়তে আবার সে সব জায়গায় রক্ত ঝরতে লাগল।

কিছুক্ষণ তুলসী দম বন্ধ করে রইল। দৃষ্টি অবশ্য সাপের দিকে।

কিন্তু এভাবে বসে থাকলেও বিপদ। পিছন থেকে হয়তো ধরবার জন্য লোকজন আসতে পারে।

তুলসী উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

কিন্তু এই অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে চলাও নিরাপদ নয়।

NOT FOR SALE

গাছে রাত কাটানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ে গাছের সন্ধান করতে লাগল।

হঠাৎ জঙ্গল কাঁপিয়ে বিকট শব্দ হল, গুরম। বন্দুকের আওয়াজ।

তুলসী ছুটে একটু দূরের একটা ঝাঁকড়া গাছে উঠে পড়ল।

কোন শিকারীর বন্দুকের শব্দ হতে পারে, কিংবা হয়তো তুলসীর খোঁজেই লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে। বন্য জন্তুকে তাড়াবার জন্য গুলির আওয়াজ করছে।

তুলসী পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসল।

মোটরের গর্জন। তীব্র আলোয় সব আলোকিত হয়ে উঠল।

সেই আলোয় তুলসী দেখল একটা রক্তাক্ত হরিণ ছুটতে ছুটতে এসে গাছের তলায় পড়ে গেল।

তারপরই গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা জীপ আসতে দেখা গেল। ফগ-লাইটের উজ্জ্বল আলো। জীপের ওপর দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দুজনের হাতেই বন্দুক।

একটু দূরে জীপটা থেমে গেল।

ভদ্রলোকরা লাফিয়ে নেমে সামনের দিকে ছুটে এল।

হরিণের কাছে এসে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল। হরিণের চারটে পা প্রসারিত। জিভটা বেরিয়ে পড়েছে।

একজন ভদ্রলোক আর একজনকে বলল, দেখলি কল্যাণ, বললাম হরিণটা এদিকেই এসেছে। ওই দেখ, তোর গুলিটা গলায় লেগেছে। অব্যর্থ শট।

অন্য লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

বাংলা কথা শুনে তুলসীর বুকে সাহস এল। এঁরা তাহলে বাঙালী শিকারী। এঁদের কাছে সব কথা খুলে বললে এঁরা হয়তো উদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

এস হরিণটাকে জীপে তোলা যাক।

দুজনে এগিয়ে এসে হরিণের পা ধরে তুলতে লাগল।

ঠিক সেই সময় তুলসী গাছের ওপর থেকে বলল।

শুনুন, শুনছেন।

দুজনেই চমকে উঠল, হরিণের দেহটা ধপাস করে মাটির ওপর পড়ে গেল।

NOT FOR SALE

এই যে আমি ওপরে।

একজন শক্ত হাতে বন্দুক ত্যাগ করল। আর একজন প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে টর্চ বের করে গাছের ওপর আলো ফেলল।

কে? কে ওখানে?

আমি নামছি। নেমে সব বলব।

তুলসী সাবধানে গাছ থেকে নেমে নীচে এসে দাঁড়াল।

লোক দুজন একদৃষ্টে তুলসীর দিকে দেখল।

তুলসী কাঁদ-কাঁদ গলায় নিজের কাহিনী সব বলল। জামা তুলে নিজের দেহের রক্তাক্ত জায়গাগুলো দেখাল।

একজন ভদ্রলোক তুলসীর একটা হাত ধরে বলল, তুমি বাহাদুর ছেলে। কোন ভয় নেই, এস আমাদের সঙ্গে। জীপে ওষুধ আছে লাগিয়ে দেব!

একরকম মলম তুলসীর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেওয়া হল। ভদ্রলোকদের পরিচয় পাওয়া গেল।

একজনের নাম কল্যাণ ঘোষ। আর একজন অনুপম সরকার। দুজনেই ভাগলপুরে থাকে। ওখানকার কোর্টের উকিল। শিকারের খুব নেশা, তাই মাঝে মাঝে বন্দুক নি
জঙ্গলে চলে আসে। এ জঙ্গলে বাঘ নেই, শুধু হরিণ আর ভালুক। মাঝে মাঝে অবশ্য পাহাড় থেকে বুনো হাতির দল নামে। যখন আখের চাষ হয়।

হরিণ আর তুলসীকে নিয়ে জীপ ছুটল।

ক্লান্ত তুলসী সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

জীপ থামতে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখল একটা একতলা বাড়ির সামনে জীপ থেমেছে।

অনুপম বলল, নামো তুলসী, এটা বন বিভাগের ডাক বাংলো।

তিন জনে নামল।

তুলসীকে হরলিক্স আর পাঁউরুটি খেতে দেওয়া হল।

কল্যাণ আর অনুপম তুলসীকে সোজা ভাগলপুর নিয়ে গেল।

সেখান থেকে ওদেরই নির্দেশে তুলসী বাপকে একটা চিঠি লিখল।

তুলসী ভাল আছে। শীঘ্রই বাড়ি ফিরছে।

কল্যাণ আর তুলসী দুজনেরই মত, যেমন করেই হোক এভাবে এদেশ থেকে মূর্তি চুরি বন্ধ করতেই হবে। এ জন্য প্রত্যেক দেশবাসীর সহযোগিতা দরকার।

NOT FOR SALE

তুলসী আর কুমুদ খুব ভাল কাজই করেছে।

কল্যাণ নিজে সঙ্গে করে তুলসীকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

তুলসীর বাবা উঠানে দাঁড়িয়ে ছিল, তুলসীকে দেখে ছুটে এসে তাকে বুকে জাপটে ধরল।

তুলসীর মাও এসে দাঁড়াল। কেঁদে কেঁদে তার দুচোখ লাল।

তুলসীকে আদর করতে করতে বলল, তুলসী তো ফিরে এল, কিন্তু কুমুর কি হবে?

তুলসী জিজ্ঞাসা করল, কুমুমামার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি মা?

না বাবা। গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে তবু কিছু হল না। বদমায়েশগুলো দশ হাজার টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছিল। বাবা সে টাকা পাঠিয়েও দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু কুমু ফিরে এল না।

গোয়েন্দার কথা কানে যেতেই কল্যাণ তুলসীর বাবাকে জিজ্ঞাসা করল। কোন গোয়েন্দাকে কাজের ভার দিয়েছেন?

পারিজাত বক্সি।

উনি তো বিখ্যাত গোয়েন্দা। অনেক বড় বড় কেসের সমাধান করেছেন।

হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি। তবে এ কেসে একটু মুশকিল হয়েছে।

কি মুশকিল?

আমার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে শুনলাম, তাঁকেও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

পাওয়া যাচ্ছে না?

না। যেদিন আমার শ্বশুরমশাই টাকাটা ইডেন গার্ডেনে রাখতে গিয়েছিলেন, সেদিন পারিজাতবাবু সঙ্গে ছিলেন। যে লোকটা টাকা নিয়ে গেল, তাকে অনুসরণ করা হয়েছিল কিন্তু ধরা যায় নি। তার দু দিন পর শ্বশুরমশাই পারিজাত বক্সির বাড়ি গিয়ে শুনলেন, তিনি নেই।

সম্ভবতঃ তিনি মূর্তি-চোরদের সন্ধানেই গিয়েছেন।

তা হবে, কিন্তু শ্বশুরমশাইয়ের কাছে হাজার টাকা চেয়ে আবার একটা চিঠি এসেছে। সে টাকাও তিনি দিয়েছেন।

দশ হাজারের ওপর আবার এক হাজার?

হ্যাঁ, চিঠিতে লেখা ছিল, আগে পাঠানো টাকার হাজার টাকা নাকি টিকটিকি পারিজাত বক্সির দোষেই হারিয়েছে। এবার শুধু কুমুদকে নয়, পারিজাত বক্সিকেও জামিন রাখা হয়েছে। টাকা না এলে দুজনকেই খতম করে দেওয়া হবে।

NOT FOR SALE

কল্যাণ মাথা নাড়ল। বলল, আমার মনে হয় এটা বাজে ধাপ্পা। শুধু ভয় দেখানো।

তা জানি না, তবে ওদের দাবি মেটানো সত্ত্বেও, পারিজাতবাবু আর কুমুদ কেউই এ পর্যন্ত ফিরে এল না।

কল্যাণ আর কিছু বলল না।

তুলসীর বাবা তাকে ছাড়ল না। খাইয়ে-দাইয়ে বিকালে যেতে দিল।

তুলসী বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তার বাবা বারণ করল।

না, তুমি বাড়ি থেকে এখন একদম বের হবে না। বদমায়েশগুলো তোমার সন্ধানে এখানে হানা দিতে পারে।

কল্যাণও তাই বলল।

তুলসীর বাবা সঙ্গে গেল।

যখন ফিরল তখন বেশ উত্তেজিত।

আরক্ত মুখ, উত্তেজনায় বুকটা ওঠানামা করছে।

তুলসীর মা জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

বলছি, আগে এক গ্লাস জল দাও।

জল খেয়ে চেয়ারে কিছুক্ষণ বসল।

ইতিমধ্যে তুলসীও মার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটু সুস্থ হয়ে তুলসীর বাবা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল।

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে একটা লোক কাগজ বিলি করছিল।

বলল, নতুন সাবান বেরিয়েছে। দামেও সস্তা, জিনিসও ভাল।

একটা কাগজ আমাকেও দিল।

কাগজটা পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম। মাঝ রাস্তায় কৌতূহল হল। কাগজটা খুললাম। দেখলাম "সুরূপ" সাবানের বিজ্ঞাপন। তলায় লাল কালিতে লেখা।

তুলসীকে খতম আমরা করবই, যদি তাকে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখেন, তবুও।

তুলসীর মা চেঁচিয়ে উঠল। তুলসীও যে ভয় পেল না, এমন নয়।

তুলসীর বাবা বলল, তুলসীর এখন বাইরে বার হওয়া একদম বন্ধ। কোন বন্ধু-বান্ধব ডাকলেও যাবে না। কাউকে এখন বিশ্বাস নেই।

কাজেই তুলসী বাড়িতে প্রায় বন্দী হয়ে রইল।

তুলসীর বাবা কলকাতায় শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করল।

NOT FOR SALE

কুমুদের বাপের শরীর খুব ভেঙে পড়েছে। রোগী দেখা খুব কমিয়ে দিয়েছেন। কুমুদের মা শয্যাশায়ী।

জামাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে কুমুদের বাপ শুধু বললেন, তাহলে কুমুদের কোন খবর তুলসী রাখে না?

তুলসীর বাবা বলল, তুলসী তো মন্দিরের মধ্যে একাই ছিল। প্রথম বারে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে কুমুদের সঙ্গে তুলসীর আর দেখা হয় নি।

কুমুদের বাপ নিঃশ্বাস ফেললেন, কি জানি, যা টাকা চেয়েছে, সেটাই পাঠিয়ে দিলাম, তবু ছেলেকে ফেরত পেলাম না। কুমুদ আর ফিরে আসবে এ ভরসা আমার নেই। পারিজাত বক্সির খুব নাম শুনেছিলাম। অনেক বড় বড় কেসের ফয়সালা করেছেন খবরের কাগজে পড়েছি। পুলিশ মহলেও তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু আমার বেলাতেই তিনি কিছু করতে পারলেন না।

পারিজাতবাবুকেও শুনছি ক'দিন পাওয়া যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, আমি বারকয়েক গিয়েছিলাম, বাড়ির লোকও কোন খবর বলতে পারল না। অবশ্য বাড়ির লোক জানলেও ঠিক খবর হয়তো দেবে না। হতে পারে ভদ্রলোক হয়তো অন্য একটা কেসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

বাড়তি হাজার টাকাও তো আপনি দিয়েছেন?

হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একটা গাছের ডালে ঝোলানো টিনের মধ্যে টাকাটা রাখার নির্দেশ ছিল। আমি ঝোপের আড়াল থেকে দেখলাম একটা লম্বা লোক টিনটা খুলে নিয়ে চলে গেল। আমি তার পিছন পিছন গিয়ে দেখি লোকটা একটা লরিতে উঠে উধাও।

কুমুদের বাপের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কোণের দিকে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল, ঝন, ঝন, ঝন।

৬

কুমুদের বাবা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন।

খুব অল্পক্ষণ কথা হল। ফোন নামিয়ে কুমুদের বাবা যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর মুখ চোখের চেহারা অনেকটা শান্ত।

ওদের কাছ থেকেই খবর এসেছিল।

তুলসীর বাবা প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

NOT FOR SALE

কে একজন জানাল, আমার বাকী টাকা পেয়েছে। কুমুদকে এবার ছেড়ে দেব, তবে ওদের নিজেদের কিছু কাজ বাকী আছে, তাই ক'দিন দেরি হবে।

আর পারিজাত বক্সি?

কি জানি, তাঁর কথা তো কিছু বলল না।

তুলসীর বাবা বলল, যতক্ষণ না কুমুদ বাড়ি ফিরে আসে ততদিন বিশ্বাস নেই। তুলসীর কাছে যা শুনলাম তা তো ভীষণ ব্যাপার।

কি রকম?

তুলসীকে পাহাড়ের ওপর এক মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে লোকটা চলে গিয়েছিল, বের হবার একমাত্র পথ পাথর চাপা দিয়ে। আমার তো মনে হয়, উদ্দেশ্যই ছিল তুলসীকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা। তুলসী কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

এখন দেখছি ওদের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

তুলসীর বাবা ওঠবার মুখে তার শ্বশুর সাবধান করে দিল।

তুমি নিজে একটু সাবধান হয়ে চলাফেরা করো।

আমি?

তুলসীর বাবা বিস্মিত হল।

কিছু বলা যায় না। তুলসীকে না পেলে তার রাগটা তোমার ওপর পড়াও বিচিত্র নয়। তুমি ফাঁকা জায়গায় একদম যাবে না, আর তুলসীকে বাড়ি থেকে কোথাও বের হতে দেবে না।

তুলসীর বাবা চলে যেতেই কুমুদের বাপ বেরিয়ে পড়লেন।

লালবাজারে গিয়ে সহকারী কমিশনার মিস্টার বাসুর কাছে নিজের কার্ড পাঠালেন।

মিনিট দশেক, তারপরই মিস্টার বাসু ডেকে পাঠালেন।

কি, বলুন?

কুমুদের বাবা সব বললেন। পারিজাত বক্সির কথাও।

মিস্টার বাসু মাথা নাড়ালেন, মনে পড়ছে, পারিজাত বক্সি হাতের লেখার একটা ব্যাপারে এখানে এসেছিলেন। আমার তো মনে হয়, আপনার ছেলে ফিরে আসবে। কয়েকদিন সময় নিয়েছে এই জন্য, এর মধ্যে তারা হয়তো মূর্তিগুলো বাইরে পাচার করবে। আপনি দিন পনেরো পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। পারিজাত বক্সির ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি নিশ্চয় একটা সুরাহা করতে পারবেন।

NOT FOR SALE

কুমুদের বাবা বেরিয়ে এলেন।

কোন কাজে মন দিতে পারেন না। দারুণ একটা অস্বস্তি। কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল। ছেলে বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনল।

ভাবলেন, একবার সরাসরি তুলসীর সঙ্গে কথা বলবেন। যদিও জামাইয়ের সঙ্গে সকালেই কথা হয়েছে, তবু তুলসী কি বলে সেটাও শোনা দরকার। মন্দিরটা ঠিক কোন্ জায়গায় সেটাও জানতে পারলে ভাল হত।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন সোজা জামাইয়ের বাড়ি যেতে।

ঘন্টা আড়াই, তার মধ্যেই মোটর রতনগড়ে পৌঁছে গেল।

জামাইয়ের বাড়ির কাছ বরাবর গিয়েই কুমুদের বাবা চমকে উঠলেন।

বহুলোকের জটলা বাড়ির সামনে।

কুমুদের বাবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

কি হল, তুলসীকে কি আবার কোনরকমে ধরে নিয়ে গেল!

কুমুদের বাপ মোটর থেকে নামতেই গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল।

কি হয়েছে?

কুমুদের বাপের প্রশ্নের উত্তরে লোকেরা আঙুল দিয়ে দেখাল।

বাড়ির সামনে দিকের অনেকটা ধসে পড়েছে। জানলার দুটো পাল্লা ঝুলছে।

কি করে হল?

বোমা।

কুমুদের বাপ লোকের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

মাঝখানে ঘরে খাটের ওপর তুলসী। তার মাথায় হাতে ব্যাণ্ডেজ। মাথার কাছে তুলসীর মা। একটু দূরে তুলসীর বাবা দাঁড়িয়ে।

বাপকে ঢুকতে দেখেই মেয়ে ছুটে কাছে এল।

বাবা, এ সময়ে আপনি?

কেমন মনটা হল, ভাবলাম সব কিছু তুলসীর মুখ থেকে শুনে আসি। কিন্তু কি ব্যাপার?

তুলসীর বাবা বলল, তুলসীকে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। সে বাড়ি থেকে বের হয় না। আজ বাইরের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় একটা বাউল কাঁধে ঝোলা, একতারা বাজিয়ে গান করছিল। হঠাৎ ঝোলা থেকে বোমা বের করে জানলার দিকে ছুঁড়ে দিল। কি প্রচণ্ড আওয়াজ। সারা বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল। দেখেছেন তো সামনের দিকটা কিভাবে ভেঙে পড়েছে।

NOT FOR SALE

কুমুদের বাবা একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুলসীর চোট কি খুব বেশী।

তুলসীর বাবা বলল, তুলসী খুব সময়ে জানলা থেকে সরে এসেছে, নইলে কি হত বুঝতেই পারছেন। দেয়াল ভেঙে ইঁটের টুকরো মাথায় আর হাতে লেগেছে। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছে।

কুমুদের বাপ নাতির বিছানার ওপর বসলেন।

তুলসীর চোখ বন্ধ। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে থাকবে।

কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। না জ্বর নেই, তবে পরে জ্বর হতে পারে।

জামাইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, বাউলটাকে কেউ ধরতে পারে নি?

ঠিক দুপুর বেলা, কোথাও কেউ ছিল না। আওয়াজ শুনে সবাই এসে জড়ো হয়েছে।

লোকটাকে তুলসী চিনতে পেরেছে?

না। বললে তো একে কখনও দেখে নি। তবে বোমার শব্দের একটু পরেই জঙ্গলের মধ্যে মোটরের শব্দ পেয়েছিল। লোকটা বোধহয় মোটরে এসেছিল।

উঃ, কী সাহস!

লোকটার পোশাক আর একতারা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে ছিল! একটা লোক কুড়িয়ে এনেছে।

থানায় খবর দেওয়া হয়েছে?

দারোগা এসে সব লিখে নিয়ে গেছে। ভাবছি তুলসীকে কিছুদিন এখান থেকে সরিয়ে দেব। আপনাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আবার ভাবছি নিয়ে যাবার সময় পথে গোলমাল না হয়।

কুমুদের বাপ একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, গোলমাল আর কি হবে। তোমরা যদি বল, তাহলে আমি পুলিশ নিয়ে আসতে পারি।

দেখি তুলসী সেরে উঠুক।

কুমুদের বাপ বাড়ি গিয়ে শুনলেন, লালবাজার থেকে ফোন এসেছিল।

লালবাজার থেকে ফোন!

তবে কি পুলিশ কুমুদের কোন খবর পেয়েছে? দুর্বৃত্তরা কুমুদকে ছেড়ে দেবে এ-কথা ফোনে তাঁকে বলেছিল।

NOT FOR SALE

কে ফোন করেছিল কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ, ডেপুটি কমিশনার মিস্টার বাসু ফোন করেছিলেন। বলেছেন আপনি এলেই যেন ফোন করেন।

কুমুদের বাবা তখনই ফোন তুললেন।

একটু পরেই মিস্টার বাসুকে পাওয়া গেল।

আপনি ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার।

কখন বলুন?

কখন আপনার সুবিধা হবে?

সন্ধ্যার সময় যদি যাই।

ঠিক আছে। তাই আসুন।

কিছু খবর আছে?

আপনার সঙ্গে দেখা হলে বলব।

মিস্টার বাসু ফোন নামিয়ে রাখলেন।

কুমুদের বাপ রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কুমুদ ফিরে এসেছে এমন খবর তো মিস্টার বাসু অনায়াসেই দিতে পারতেন।

নিশ্চয় অশুভ খবর, তাই তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

কুমুদের বাপ যখন গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে, তখন তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন।

ক্লান্ত বিষণ্ণ চেহারা। কোন রকমে ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। এই অল্প পরিশ্রমেই হাঁপাচ্ছেন।

তুলসী কেমন আছে?

কুমুদের বাপ ঠিক খবর বললেন না। বললে তাঁর স্ত্রী আরও চিন্তিত হতেন।

তাই তিনি শুধু বললেন, ভাল।

কুমুর কথা কিছু বলল?

না, কুমু আর তুলসী এক জায়গায় ছিল না, কাজেই কুমুর কথা তুলসী জানে না। কুমুর খবর তো পেয়েছি।

পেয়েছ? কই আমাকে তো কিছু বল নি।

উত্তেজনায় কুমুদের মার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

পুরো টাকা পাঠিয়েছি, এবার তাকে ছেড়ে দেবে।

NOT FOR SALE

কবে?

তা জানি না। আজ সন্ধ্যার পর তো লালবাজারে যাচ্ছি, দেখি যদি কোন খবর পাই।

কুমুদের মা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার আগেই কুমুদের বাপ লালবাজার রওনা হয়ে গেলেন।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পরই কুমুদের বাপের ডাক এল।

এবার মিস্টার বাসু যেন বেশ গম্ভীর।

একবার চোখ তুলে কুমুদের বাপকে দেখে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, আপনি যে ক'দিন আগে ফোন পেয়েছিলেন, তাতে আপনার ছেলে ছাড়া আর কারও কথা বলেছিল?

কুমুদের বাপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, আর কার কথা বলবে?

পারিজাত বক্সির কথা?

না।

মিস্টার বাসু ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করে কুমুদের বাপের সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন, চিঠিটা পড়ে দেখুন।

খামের ওপর লেখা—মিসেস পারিজাত বক্সি। তলায় ঠিকানা।

কুমুদের বাপ খাম থেকে চিঠিটা বের করলেন।

চৌকো সাদা কাগজ। টাইপ করা চারটে লাইন। তলায় কোন নাম নেই—

টিকটিকি ফাঁদে পড়েছে। সহজে ছাড়া পাবে না। আমাদের পিছনে লাগার উপযুক্ত ফল ভোগ করতে হবে।

লেখাটা ইংরাজীতে।

তার মানে পারিজাত বক্সিও ধরা পড়েছে।

পারিজাত বক্সিকে কুমুদের বাপই নিয়োগ করেছিলেন, কাজেই কুমুদকে যে ছেড়ে দেবে, এমন মনে হয় না। কুমুদের বাপের ওপর রাগটা ছেলের ওপর পড়বে।

কুমুদের বাবা চুপচাপ বসে রইলেন, কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

কবে কখন আপনার কাছে ফোন এসেছিল জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, কারণ খোঁজ নিলে দেখা যাবে ফোনটা কোন পাবলিক ফোন থেকে করা হয়েছিল। লোকের পাত্তা পাওয়া যাবে না।

এবার কুমুদের বাপ জিজ্ঞাসা করল, কি করবেন ঠিক করেছেন?

ভাবছি আপনার নাতির সঙ্গে একবার কথা বলব।

NOT FOR SALE

কিন্তু সে তো কুমুদকে দেখে নি। মানে একসঙ্গে তারা ছিল না।

না দেখলেও, যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের চেহারার বর্ণনা শুনতে চাই। আপনার নাতিকে কতকগুলো ফটোর অ্যালবাম দেখাব, যদি চেহারা মিলে যায়। তাকে কবে আনতে পারবেন?

তাকে আনার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা আছে।

অসুবিধা? কি অসুবিধা?

কুমুদের বাপ বোমার ঘটনাটা বললেন। বাউল বেশী দুর্বৃত্তের কথাও।

শুনতে শুনতে মিস্টার বাসু উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপর সক্রোধে ঘুষি মেলে বললেন, বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। এ আমাদের চ্যালেঞ্জ করা। ঠিক আছে, আমরাও এবার আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। শুনুন, কাল আমি নিজে গিয়ে আপনার নাতিকে নিয়ে আসব। আমার সঙ্গে পুলিশ থাকবে। কোন ভয় নেই। তবে আমি আপনার জামাইয়ের বাড়ি চিনি না, দয়া করে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। কখন আপনার সুবিধা হবে, আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। আপনার ঠিকানা আমার জানা।

আপনি যখন বলবেন।

সকাল দশটা।

মিস্টার বাসু তুলসীদের বাড়ি গিয়ে দেখলেন ফটকের দু'পাশে দুজন পুলিশ। থানার দারোগা এই বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

মিস্টার বাসুর সঙ্গে চারজন সশস্ত্র পুলিশ।

তুলসীর বাবা বাড়িতেই ছিল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

মিস্টার বাসু, কুমুদের বাপ তুলসীর কাছে গিয়ে বসলেন।

তার কাছে মিস্টার বাসু সব শুনলেন।

মিস্টার বাসুর আসার খবর পেয়ে থানার দারোগাও এসে হাজির।

তাকে মিস্টার বাসু প্রয়োজনমত নির্দেশ দিলেন।

তুলসীকে যেন চোখে চোখে রাখা হয়। এ বাড়ির ত্রি-সীমানায় উটকো লোক না ঢোকে। গাঁয়ে নতুন কোন সন্দেহজনক লোক এলেই যেন তাকে পাকড়াও করে জেরা করা হয়।

কিছুক্ষণ পর তিনি তুলসীকে মোটরে উঠিয়ে নিলেন। সঙ্গে তুলসীর বাবাও গেল।

NOT FOR SALE

লালবাজারে তুলসীর সামনে বিরাট একটা ফটোর অ্যালবাম রেখে মিস্টার বাসু বললেন, এই ফটোগুলো দেখে যাও। তোমাকে যে ধরে মন্দিরের মধ্যে রেখে দিয়েছিল, দেখ তো তার ফটো আছে কিনা।

তুলসী খুব মনোযোগ দিয়ে গোটা অ্যালবাম দেখে গেল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, তার ফটো এখানে নেই।

লোকটাকে কেমন দেখতে?

খুব লম্বা, ফর্সা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। লোকটার গায়েও অসীম শক্তি।

অসীম শক্তি?

হ্যাঁ, তা না হলে অবলীলাক্রমে আমাকে কাঁধে ফেলে চলতে পারে!

মিস্টার বাসু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, লোকটার ফটো যে থাকবে না, এটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম, কারণ খোদ কর্তারা পিছনে থাকে। তাদের শাগরেদদের দিয়ে এসব কাজ করায়। যা হোক, তুমি কিন্তু বাড়ি থেকে একদম বের হবে না। যদিও আমরা পাহারা দেবার সব রকম চেষ্টা করছি, তবু সাবধান হওয়াই ভাল।

তুলসী সায় দিল। তার খুব শিক্ষা হয়েছে। সে কিছুদিন বাড়ির বাইরে যাবে না।

মিস্টার বাসু তুলসীর কাছ থেকে বাউলের চেহারার বর্ণনাও শুনলেন।

তুলসীদের ফেরার বন্দোবস্ত করে দিয়ে মিস্টার বাসু বিহারের পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন।

তাঁর কাছে কুমুদ আর পারিজাত বক্সির ফটো পাঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, অন্ততঃ ভাগলপুরের কাছাকাছি থানায় এর কপি যেন পাঠিয়ে দিয়ে তল্লাসী করা হয়।

কুমুদের বাপ দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, সে কথাও জানিয়ে দিলেন।

এরপর মিস্টার বাসু সহকারীদের নিয়ে জরুরী মিটিং-এ বসলেন।

পারিজাত বক্সি তাঁদের শুধু পরিচিতই নন, বিশেষ বন্ধু লোক। বহুবার পুলিশের অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছেন।

লোকটার একমাত্র দোষ, ভীষণ রকম বেপরোয়া। নিরস্ত্র অবস্থায় কিংবা সামান্য অস্ত্র নিয়ে বিপজ্জনক এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে।

NOT FOR SALE

এদেশের অপরাধী মহলের তিনি এক নম্বরের শত্রু। যদি হাতের কাছে পায়, তাহলে সহজে ছাড়বে, এমন মনে হয় না।

দুজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বিহার রওনা হয়ে গেল।

মিস্টার বাসু রাত দশটায় বাড়ি ফিরে শুনলেন তাঁর একটা ফোন এসেছিল।

কার ফোন?

তা কিছু বলে নি। বলেছে রাত এগারোটায় আবার ফোন করবে।

মিস্টার বাসু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

দুর্বৃত্তরা কি পারিজাত বক্সিকে খতম করে তাঁকে সেই সংবাদ জানাচ্ছে? এদের অসাধ্য কিছু নেই!

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে মিস্টার বাসু ফোনের কাছে এসে বসলেন।

এগারোটায় নয়, ফোন বেজে উঠল এগারোটা দশে।

মিস্টার বাসু?

কথা বলছি।

ফোনের ওপারের কণ্ঠ শুনে মিস্টার বাসু অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

কুমুদের বাবা কথা বলছেন।

আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে।

শুনুন, আপনাকে আমি একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি, সেই ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলুন।

মিস্টার বাসু একটা নম্বর দিয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

একটু পরেই তাঁর প্রাইভেট ফোন বেজে উঠল।

মিস্টার বাসু ফোন তুলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এবার বলুন।

আমি একটা চিঠি পেয়েছি।

কি চিঠি?

পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে।

কুমুদের বাপ পড়ে শোনালেন—

আপনাকে আগে জানানো হয়েছিল যে আপনার ছেলেকে মুক্তি দেওয়া হবে। তার মুক্তিপণের টাকা আমাদের হস্তগত হয়েছে, কিন্তু পুনরায় বিবেচনা করে ঠিক করা হয়েছে যে, যেহেতু আপনি মূর্খের মতন সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশের গোচরে এনেছেন এবং একজন টিকটিকি নিয়োগ করেছেন, সেইজন্য দণ্ডস্বরূপ আপনাকে আরও দশ হাজার টাকা দিতে হবে।

NOT FOR SALE

পাঁচ দিনের মধ্যে এ টাকা না পেলে আপনাকে পার্সেল যোগে আপনার পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড পাঠানো হবে।

এই দশ হাজার টাকা একশ টাকার নোটে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের সামনে যে মূর্তি আছে তার পায়ের ফাঁকে দুপুরবেলা রেখে চলে যাবেন। সেখানে অপেক্ষা করবেন না।

যদি আপনি সঙ্গে পুলিশ আনেন তাহলে সেই বোকামির চূড়ান্ত দায়িত্ব আপনার। শুধু পুত্রের নয়, আপনারও প্রাণসংশয় জানবেন।

কুমুদের বাবার চিঠিটা পড়া দেখেই বোঝা গেল তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। শুধু ভয়ই নয়, আশাভঙ্গও। আশা করেছিলেন, কুমুদ ফিরে আসবে। সে আশা শেষ হয়ে গেল।

আপনার চিঠিটা কি ডাকে এসেছে?

না, আমার রোগীর মধ্যে কেউ বন্ধ খামটা কম্পাউণ্ডারের হাতে দিয়ে গেছে। রোগী মানে, রোগী সেজে এসেছিল।

চিঠিটা নিয়ে কাল আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

খুব ভোরে কুমুদের বাপ আবার এক ফোন পেলেন।

মিস্টার বাসুর গলা।

শুনুন, ভেবে দেখলাম আপনার এখানে আসা ঠিক হবে না। বদমায়েশগুলো নিশ্চয় আপনার ওপর নজর রাখবে। আপনি আসবেন না, আমি দিন দুয়েকের মধ্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

পরের দিন কুমুদের বাপ বসে বসে রোগী দেখছেন, এমন সময়ে হাত বাঁধা একজন এসে পিছনের বেঞ্চে বসল।

ইদানীং খুব জরুরী কেস ছাড়া কুমুদের বাপ দেখেন না। মনের এ চাঞ্চল্য নিয়ে বেশী পরিশ্রম করতেও পারেন না।

হাত বাঁধা রোগী সব শেষে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার? মারপিট নাকি?

লোকটা মুচকি হেসে বলল, আমি মিস্টার বাসুর কাছ থেকে আসছি।

পলকে কুমুদের বাপ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ভিতরে এস।

রোগী দেখার ভিতরের চেম্বারে লোকটা ঢুকল।

পিছন পিছন কুমুদের বাপ।

NOT FOR SALE

লোকটা বলল, মিস্টার বাসু আপনাকে জানাতে বলেছেন যে পরশু আপনি টাকাটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রেখে আসবেন।

কুমুদের বাপ রীতিমত বিস্মিত হলেন।

সে কি, মিস্টার বাসু টাকাটা দিয়ে দিতে বলেছেন! কিছুদিন আগে তাঁর এগারো হাজার টাকা গেছে, আবার দশ হাজার যাবে! টাকার জন্য নয়, এ পর্যন্ত ছেলে ফিরে এল না। দুর্বৃত্তদের যা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, এইভাবে কোন না কোন অছিলায় তারা কেবল টাকা চেয়েই যাবে। এই যদি পুলিশের কর্মতৎপরতা হয়, তাহলে লোকেরা এদের ওপর নির্ভর করবে কি করে!

লোকটা বোধ হয় কুমুদের বাপের মনের অবস্থা বুঝতে পারল। আপনি বিচলিত হবেন না। টাকা আপনাকে দিতে হবে না।

টাকা দিতে হবে না?

না। টাকার মাপে কাগজ কেটে একটা খামে ভরে যেখানে রাখবার কথা সেখানে দুপুরবেলা রেখে আসবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাকি যা করার মিস্টার বাসুই করবেন। তাহলে চলি। ওই কথা রইল। পরশু দুপুরবেলা।

লোকটা বেরিয়ে গেল।

কুমুদের বাপ চুপচাপ বসে রইলেন। শত্রু সামান্য তো নয়ই, রীতিমত দুর্দান্ত এবং নিষ্ঠুর। ওদের সঙ্গে প্রতারণা করার ফল তাঁকেই ভোগ করতে হবে। হয়তো ছেলেকে চিরদিনের জন্য হারাবেন। নিজেরও বিপদ হতে পারে। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে গিয়েও তো লাভ নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে কুমুদের বাপ ঠিক করলেন পুলিশের কথামত কাজ করাই ভাল। তারাই দেশের রক্ষক।

ঠিক দিনে কুমুদের বাপ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে হাজির হলেন। পকেটে খাম। তাতে নোটের সাইজের কাগজ।

দুপুরবেলা মেমোরিয়াল একেবারে ফাঁকা। ধারে কাছে কাউকে দেখা গেল না।

খামটা সন্তর্পণে মূর্তির পায়ের কাছে রেখে দিয়ে ফিরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালেন।

মিনিট পনের কুড়ি, কেউ এল না।

হঠাৎ একটা মোটরের শব্দ। কুমুদের বাপ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সবুজ রংয়ের একটা মোটর গেটের একটু দূরে এসে থামল।

NOT FOR SALE

মোটর থেকে কালো বেঁটে একটি লোক নামল। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। মাথায় টিকি। দেহাত থেকে শহর দেখতে যে ধরনের লোক আসে, ঠিক তেমনই।

লোকটা এদিক ওদিক দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আর একবার এদিক ওদিক দেখে খামটা তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপর্যয়।

ঝোপের আড়ালে একটা লোক লুকিয়ে ছিল। তার পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি আর প্যান্ট। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি, তাতে নানা রংয়ের কাগজ ঝোলানো।

লোকটাকে কুমুদের বাপও লক্ষ্য করেন নি।

পাগলা সিংহবিক্রমে সেই দেহাতী লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দেহাতী লোকটা পকেট থেকে রিভলভার বের করে পাগলাটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুৰম।

পাগলাটা রক্তাক্ত দেহে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

দেহাতী লোকটা ছুটে গেটের দিকে পালাল।

কিন্তু গেট পর্যন্ত পালাতে পারল না, তার আগেই সাদা প্যান্ট পরা চারজন লোক পিস্তল হাতে তাকে ঘিরে ফেলল।

গুৰম, গুৰম।

এবার সবুজ মোটর থেকে গুলির শব্দ এল।

মাত্র দুবার।

কুমুদের বাপ দেখলেন দুজন লোক যারা মাঠে আইসক্রিম বিক্রি করছিল, তারা মোটরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দেহাতী লোকটাকে চারজন মিলে টানতে টানতে মোটরের দিকে নিয়ে গেল।

কুমুদের বাপ আর অপেক্ষা করতে সাহস করলেন না। ছুটে নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

বিকালের দিকে তিনি নিজের থেকেই লালবাজারে গেলেন।

মিস্টার বাসুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন, সুখবর, দুজনকে ধরতে পেরেছি।

কুমুদের বাপ যে আড়াল থেকে সব দেখেছেন, সে কথা কিছু বললেন না।

তিনি শুধু বললেন, এতে আমার ছেলের কিছু অমঙ্গল হবে না?

NOT FOR SALE

মিস্টার বাসু মাথা নাড়লেন, কি হবে? এবার বরং ওরা ভয় পাবে। ওদের হাতে যেমন আপনার ছেলে আর পারিজাত বক্সি রয়েছে, তেমনই আমাদের হাতে ওদের দলের দুজন রয়েছে।

লোকদুটো স্বীকার করেছে?

এ পর্যন্ত নয়। একটা লোক তো বলছে সে দেহাত থেকে শহর দেখতে এসেছিল। মূর্তির পায়ের কাছে একটা খাম পড়ে থাকতে দেখে কৌতূহলবশতঃ সেটা তুলে নিয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করা হল, বাপু গুলি ছুঁড়লে কেন? বলল, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। পাগলটা ওভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর রিভলভারের লাইসেন্স দেখতে চাওয়া হল। তখন আর দেখাতে পারে না। সঙ্গীরও ওই এক অবস্থা। ছেলে চুরি কিংবা মূর্তি চুরির সম্বন্ধে একটি কথাও বের করা যাচ্ছে না। দেখা যাক, কত দিন মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে।

কুমুদের বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের যে ছেলেটি পাগল সেজে আহত হয়েছিল, তার অবস্থা কেমন?

মিস্টার বাসু উত্তর দিলেন, ভালই আছে। হাতে সামান্য চোট লেগেছিল। ভাগ্য ভাল গুলি চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কুমুদের বাপ চলে যেতে মিস্টার বাসু উঠে যে ঘরে টিকিধারী লোকটা আটক আছে সে ঘরে ঢুকলেন।

দুজনকে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে।

একেবারে কোণে একটা টুলের ওপর লোকটা বসেছিল। ধস্তাধস্তির সময় মুখের দু এক জায়গায় চোট লেগেছে।

মিস্টার বাসু ঘরে ঢুকতে লোকটা ভ্রূক্ষেপও করল না। একভাবে বসে রইল।

মিস্টার বাসু লোকটার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তোমার স্যাঙ্গাত সব কিছু স্বীকার করেছে। দলের অন্য সকলের নামধামও বলে দিয়েছে। তোমার এ বিষয়ে কিছু বলার আছে?

লোকটি অবিচল।

কি হল?

লোকটি মুখ তুলে একবার মিস্টার বাসুর দিকে দেখল, তারপর বলল, এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। আপনাকে তো আগেই বলেছি এসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি এ শহরে নতুন। শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম।

NOT FOR SALE

এবার মিস্টার বাসু লোকটার দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, তা হলে আর একটা খবর শোন। তোমার পক্ষে খুব দরকারি খবর।

লোকটা কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। ফিরেও দেখল না।

যে পাগলটিকে তুমি গুলি করেছিলে, সে আজ সকালে হাসপাতালে মারা গেছে। এর কি ফল হতে পারে এবং হবে, আশা করি বুঝতে পারার মতন বুদ্ধি তোমার আছে।

এবার লোকটা একটু নড়েচড়ে বসল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমাকে গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল।

বিনা লাইসেন্স-এর রিভলভার দিয়ে? বেশ, কোর্টে ওই কথাই বল। আমি তোমার জন্য খুব দুঃখিত।

মিস্টার বাসু সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শেষের ঘরে অন্য লোকটি বন্দী ছিল। সে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সেখানে একটি ইন্সপেক্টর বসেছিল। মিস্টার বাসু ঢুকতেই সে স্যালুট করে বেরিয়ে গেল।

এ লোকটার পরনে শার্ট আর ফুলপ্যাণ্ট। বলিষ্ঠ গড়ন। চেহারা দেখে নেপালী বলেই মনে হয়।

তোমার কিছু বলবার আছে?

কি বিষয়ে?

ময়দানের ঘটনা সম্পর্কে?

যা বলার আমি কোর্টেই বলব। আপনারা অযথা বিরক্ত করতে আসবেন না।

মিস্টার বাসু বুঝতে পারলেন, একেবারে পাকা লোক। এর কাছ থেকে কথা বের করা বেশ শক্ত ব্যাপার।

তবু শেষ চেষ্টা হিসাবে বললেন, আপনার সঙ্গী সব কথাই আমাদের বলেছেন। আপনাকে জ্বালাতন করার আর আমাদের দরকার হবে না।

লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

মিস্টার বাসু নিজের কামরায় ফিরে এলেন।

সহকারীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমাদের এলবামে এদের ফটো আছে?

না স্যার। মনে হচ্ছে এরা নতুন।

NOT FOR SALE

মিস্টার বাসু সায় দিলেন, এরা এক লোক বেশীদিন এক জায়গায় রাখে না। দেশে বিদেশে চালান দেয়। আমি ভাবছি একবার তুলসীকে ডেকে পাঠাব, যদি সে ওদের কাউকে চিনতে পারে।

সেই ভাল স্যার। ঘন্টা দুয়েক ধরে এদের জেরা করেছি, একটি দরকারী কথাও বের করতে পারি নি।

মিস্টার বাসু বললেন, কুমুদের বাবাকে একবার ফোনটা দাও তো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কুমুদের বাপকে ফোনে পাওয়া গেল।

ডাক্তার সায়েব, আপনার নাতি তুলসীকে একবার আমার দরকার।

কি ব্যাপার?

আর কিছু নয়, লোক দুটোকে যদি চিনতে পারে।

কিন্তু তুলসীকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিপদের কথা তো জানেন।

সে দায়িত্ব আমার। গতবারের মতন আমি নিয়ে আসার সব বন্দোবস্ত করব।

কবে দরকার।

দেরি করতে চাই না। কাল হলেই ভাল হয়। ধরুন, কাল সকাল এগারোটা। আগে আপনাকে তুলে নেব।

আগের বারের মতন সশস্ত্র পুলিশ পরিবৃত হয়ে তুলসী লালবাজারে এসে পৌঁছলো।

সঙ্গে কুমুদের বাপ।

প্রথমে তাকে নেপালীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

তুলসী তাকে চিনতে পারল না।

তারপর তাকে আর একটা ঘরে নিয়ে আসা হল।

লোকটা পায়চারি করছিল।

তাকে দেখেই তুলসী চেঁচিয়ে উঠল, ওই সেই লোক।

তুলসী একটা হাত দিয়ে তার দাদুর হাত আঁকড়ে ধরল।

মিস্টার বাসু পাশেই ছিলেন। তিনি একটা হাত তুলসীর কাঁধে রাখলেন। কোন ভয় নেই, লোকটা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি বল একে কোথায় দেখেছ।

এই লোকটাই আমাকে অজ্ঞান করে কাঁধে নিয়ে কিছুটা রাস্তা গিয়েছিল। এই লোকটাই আমাকে মন্দিরের মুখে ঠেলে দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে এসেছিল।

NOT FOR SALE

মিস্টার বাসু জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক করে দেখছ তো? কোন ভুল হয় নি?

তুলসী মাথা নাড়ল, ভুল হতেই পারে না। ও মুখ আমি জীবনে ভুলব না।

আশ্চর্য কাণ্ড, তুলসী যখন এসব কথা বলছে, তখন লোকটার চেহারাও যেন বদলে যাচ্ছে।

আরক্ত দুটি চোখ। কপালের, গালের শিরাগুলো স্পষ্ট, দাঁত কিড়মিড় করে কি যেন বলার চেষ্টা করছে।

একটু পরেই লোকটা রাগে ফেটে পড়ল, একবার যদি তোকে হাতের মধ্যে পাই, তাহলে খতম করে দেব। তুই বেঁচে আছিস, আমি ভেবেছিলাম বুনো জন্তুদের শিকার হয়েছিস।

মিস্টার বাসু হাসলেন, তোমার হাতে পড়বার এর আর কোন অবকাশ হবে না, কারণ ফাঁসির পর আর মানুষ বাঁচে না। তোমার গুলিতে একজন প্রাণে মারা গেছে।

তুলসীকে নিয়ে মিস্টার বাসু সরে এলেন।

কুমুদের বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, এদিকটা তো হল, কিন্তু কুমুদকে উদ্ধার করার কি হবে?

বোঝা গেল, এ বিষয়ে মিস্টার বাসুও যথেষ্ট চিন্তিত।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, দেখি কি করা যায়। আমার মনে হয় কুমুদ আর পারিজাত বক্সি একই জায়গায় আছে। সম্ভবতঃ কুমুদকে বাঁচাতে গিয়েই পারিজাত বক্সি ধরা পড়েছেন। আপনি এক কাজ করুন, তুলসীকে আপনার কাছেই রাখুন। ওকে মাঝে মাঝে আমাদের দরকার হবে। অতদূর থেকে আনার অসুবিধা। এখন বাড়তি কোন বিপদের ঝুঁকি আমি নিতে চাই না।

কিন্তু—

কোন ভয় নেই। অষ্টপ্রহর যাতে পুলিশ প্রহরা থাকে সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি ওকে একেবারে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেন না।

কুমুদের বাপ নাতিকে নিয়ে চলে যাবার পাঁচ মিনিট পরই মিস্টার বাসুর কাছে একটা স্লিপ এল।

স্লিপে লেখা নামটা দেখে মিস্টার বাসু কিছুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করে রইলেন তারপর হুকুম করলেন, পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই একটি সুন্দরী মহিলা এসে ঢুকল।

মিস্টার বাসু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বসুন মিসেস বক্সি।

মহিলা বসল।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সির কোন খবর আছে?

মহিলা কোলের ওপর রাখা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা কাগজ বের করে মিস্টার বাসুর হাতে দিল।

সাদা চৌকো কাগজ। তাতে টাইপ করা কয়েকটা লাইন।

মিস্টার বাসু পড়লেন।

মিসেস বক্সি,

আপনার স্বামী আমাদের বহু কাজ বিনষ্ট করেছে। তার জন্য অনেক কাজ আমরা নির্বিবাদে হাসিল করতে পারি নি। এবারেও তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করে নি। এবার তাকে আমরা মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। তার নিস্তার নেই।

মিস্টার বাসু বার দুয়েক চিঠিটা পড়লেন।

মুক্তির বিনিময়ে কোন টাকার উল্লেখ নেই। শুধু ভয় দেখানো চিঠি। তবে এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

মিস্টার বাসু মিসেস বক্সিকে জিজ্ঞাসা করলেন।

এ চিঠি আপনি কবে পেয়েছেন?

আজ সকালে।

কি ভাবে।

ডাকবাক্সের মধ্যে থেকে।

ডাকবাক্সের চাবি কার কাছে থাকে?

আমার কাছে আর মিস্টার বক্সির কাছে। তবে সচরাচর ডাকবাক্স আমিই খুলি।

ঠিক আছে, চিঠিটা আমার কাছে রেখে যান। আর আপনাকে একটা সুখবর শোনাই। দলের দুটি লোক ধরা পড়েছে।

ধরা পড়েছে?

হ্যাঁ, আশা করছি তাদের কাছ থেকে কিছু খবর আমরা বের করতে পারব।

মহিলা উঠে দাঁড়াল।

মিস্টার বক্সির কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন?

নিশ্চয়, আপনি তো জানেন পারিজাত বক্সি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন।

মহিলা বেরিয়ে যেতে মিস্টার বাসু সহকারীকে ডাকলেন।

NOT FOR SALE

সে আসতে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, দেখ তো, অন্য যে সব চিঠি আমরা এই কেসে পেয়েছি, তার সঙ্গে মিলিয়ে। একই টাইপরাইটার থেকে টাইপ করা কিনা আমাকে জানিয়ে যেও।

সহকারী চলে যেতে মিস্টার বাসু পায়চারি করতে শুরু করলেন। যেখান দিয়ে বাইরে মূর্তি পাচার করা সম্ভব, জলপথে অথবা স্থলপথে, সেখানেই তিনি ওয়্যারলেস পাঠিয়ে দিয়েছেন। সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কোনরকম সন্দেহজনক প্যাকিং দেখলেই যেন আটক করা হয়।

কোন জায়গা থেকে খবর আসে নি।

একটি লোককে সনাক্ত করা গেছে, কিন্তু মূর্তি চুরির সঙ্গে এই মুহূর্তে জড়ানো সম্ভব নয়। ছেলে চুরি এবং তাকে হত্যা করার চেষ্টার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা চলে।

পারিজাত বক্সি আগেও এ ধরনের বিপদে পড়েছেন, কিন্তু সে বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন।

কিন্তু এবার ব্যাপার একটু আলাদা।

দুর্বৃত্তদের দুজন ধরা পড়েছে সেই আক্রোশে পারিজাত বক্সি আর কুমুদের ওপর চরম আঘাত হানা বিচিত্র নয়।

এরা ভীষণ নিষ্ঠুর, বিবেকহীন।

পারিজাত বক্সির কিছু হলে পুলিশ মুখ দেখাতে পারবে না। দিল্লী থেকে অপদার্থতার কৈফিয়ত তলব করবে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

মিস্টার বাসু ছুটে এসে ফোন ধরলেন।

লালবাজারের অপারেটর বলল, ট্রাঙ্ক কল স্যার।

প্রথমে অস্পষ্ট কণ্ঠ। ঠিক কিছু শোনা গেল না।

জোরে, একটু জোরে বলুন।

কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হল

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে মিস্টার বাসু চিৎকার করে উঠলেন।

॥ ৭ ॥

পারিজাত বক্সি বাইরে এসে দেখলেন একটু দূরে একটা চালাঘর, তার সামনে খাটিয়ার ওপর একটা লোক শুয়ে।

NOT FOR SALE

অস্পষ্ট কুয়াশার জন্য পরিষ্কার কিছু দেখা গেল না।

পারিজাত বক্সি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

লোকটা মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। তখনও অজ্ঞান।

পারিজাত বক্সি নিজের পোশাক খুলে লোকটাকে পরালেন। শক্ত করে মুখ বাঁধলেন। লোকটার ধুতি আর গেঞ্জি নিজে পরলেন।

ধুতির কিছুটা খুলে নিজের মাথা ঢাকলেন, তারপর থালা গ্লাস নিয়ে আবার বের হলেন। বেরিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর সন্তর্পণে পা ফেলে চালাঘরের মধ্যে ঢুকলেন। যখন খাটিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখন খাটিয়ার ওপর শোওয়া লোকটা জড়ানো হিন্দীতে বলল, নে বাবা তাড়াতাড়ি নে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আজ সিদ্ধির নেশাটা খুব জব্বর হয়েছে।

পারিজাত বক্সি কোন উত্তর দেবার চেষ্টা না করে চালাঘরে ঢুকলেন। আর একটা থালায় ভাত, তরকারি আর গ্লাসে জল তৈরি ছিল, সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

প্রথমে মাঝখানের ঘরটা খুললেন। চোখ কুঁচকে দেখলেন তিনটে বস্তু প্যাক করা। এগুলো মূর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়।

এরপর কোণের ঘরটা খুলেই দেখলেন, একটি ছেলে খাটিয়ার ওপর শুয়ে।

এই হয়তো কুমুদ। কিন্তু একে জাগাতে গেলেই যদি চিৎকার করে ওঠে?

পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে পারিজাত বক্সি দেখলেন। কুমুদের ফটো তিনি আগেই দেখেছেন। কাজেই চিনতে অসুবিধা হল না।

পারিজাত বক্সি কুমুদের কাছে গিয়ে কুমুদের মুখটা সজোরে চেপে ধরলেন।

কুমুদ আঁ করে চিৎকার করেই চুপ হয়ে গেল।

পারিজাত বক্সি কুমুদের কানে কানে বললেন, কুমুদ, কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। কোন রকম শব্দ করো না।

কুমুদ মাথা নাড়ল, অর্থাৎ সে বুঝেছে।

পারিজাত বক্সি তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, তারপর ইঙ্গিতে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন।

দুজনে মাঝখানের ঘরে এসে দাঁড়াল। তিনটি প্যাক করা বস্তু একটার পর একটা ধরে বাইরে আনা হল।

NOT FOR SALE

ঠিক নীচেই গোটা চারেক নৌকা বাঁধা। মাঝিরা পাটাতনের ওপর ঘুমোচ্ছে।

পারিজাত বক্সি কাদা ভেঙে একটা মাঝিকে ওঠালেন।

প্রথমেই তার হাতে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে প্যাক করা জিনিসগুলো নৌকায় তোলালেন। দুর্বৃত্তরা তাকে আঘাত করে অজ্ঞান অবস্থায় তার রিভলভারটা সরিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু সেলাই করা আস্তরণের মধ্যে লুকানো টাকার বোধহয় সন্ধান পায় নি।

কুমুদও এসে নৌকায় উঠল।

নৌকার মাঝি জিজ্ঞাসা করল, এত রাতে কোথায় যাবেন বাবু?

এখানে বড় থানা কতদূরে?

হরিহরপুর থানা এখান থেকে পাঁচ মাইল।

তাড়াতাড়ি সেখানেই চল। ভোরের আগে পৌঁছে দিতে পারলে আরো দশ টাকা দেব।

মাঝি প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা বাইতে লাগল।

এতক্ষণ কুমুদ কোন কথা বলে নি। চুপচাপ ছইয়ের মধ্যে বসেছিল।

এবার ক্লান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে?

আমার পরিচয় পরে জানতে পারবে, এখন এইটুকু জেনে রাখ, তোমার বাবা তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমাকে নিয়োগ করেছেন।

তুলসী, তুলসীর খবর জানেন?

তুলসী দুর্বৃত্তদের হাত থেকে একবার পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু আবার ধরা পড়েছে।

সে কি! আবার কি করে ধরা পড়ল?

সে-সব কথা পরে শুনবে, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। জানি, তুমি খুবই ক্ষুধার্ত। তোমাকে আমি ভাত খাবার সময়টুকুও দিই নি, কিন্তু তুমি নিশ্চয় এটুকু বুঝতে পারবে, নষ্ট করার মতন একটু সময়ও আমাদের হাতে ছিল না। কোন রকমে কেউ দেখে ফেললে, আমাদের দুজনেরই প্রাণ নিয়ে ফেরা সম্ভব হত না।

কুমুদ আর কিছু বলল না। হাত-পা মুড়ে শুয়ে পড়ল।

হরিহরপুর থানা পর্যন্ত নৌকাকে যেতে হল না। তার আগেই সাইরেন দিয়ে একটা স্টীমার নদীর মাঝ বরাবর ছুটে এল।

NOT FOR SALE

মাঝি জিজ্ঞাসা করল, বাবু, আপনাদের ওই প্যাক করা জিনিসগুলো গোলমেলে কিছু নয় তো?

পারিজাত বক্সি এ প্রশ্নে বিস্মিত হলেন, কেন?

জল পুলিশের স্টীমার আসছে। এত রাতে নৌকা চলতে দেখলে সন্দেহ করে হয়তো সার্চ করতে পারে।

জল পুলিশের স্টীমার? তুমি এক কাজ কর তো। তোমার নৌকা স্টীমারের যত কাছাকাছি সম্ভব নিয়ে চল।

মাঝি আশঙ্কা প্রকাশ করল, স্টীমারের যা ঢেউ বাবু, কাছে গেলে বিপদ আছে।

বেশী কাছে যাবার দরকার নেই। বললাম তো, যতটা সম্ভব ততটা কাছে নিয়ে চল। ভয় নেই, জল-পুলিশ আমার জানা।

নৌকা স্টীমারের কাছ বরাবর যেতে পারিজাত বক্সি মাঝির গামছাটা নিয়ে পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে গামছাটা ঘোরাতে লাগলেন।

স্টীমারের সার্চলাইট নৌকার ওপর পড়তেই স্টীমারের গতি কমে এল।

স্টীমার থেকে একজন চোঙ মুখে দিয়ে চেঁচাল, কি ব্যাপার?

দুটো হাত মুখের দু'পাশে রেখে পারিজাত বক্সি চেঁচালেন, সাহায্য চাই।

আসছি।

আস্তে আস্তে স্টীমার একেবারে নৌকার গায়ে ভিড়ল।

স্টীমার থেকে সাদা পোশাক পরা দুটি লোক লাফিয়ে নৌকার ওপর পড়ল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বলুন তো?

পারিজাত বক্সি জামার ভিতর থেকে ছোট একটা কার্ড বের করে লোকটার হাতে দিল।

কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই লোকটা সম্ভ্রমের সুরে বলল, আপনি সেই বিখ্যাত গোয়েন্দা পারিজাত বক্সি! আপনার রহস্য সমাধানের অনেক কাহিনী খবরের কাগজে আমি পড়েছি। আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি বলুন?

পারিজাত বক্সি সংক্ষেপে সব ঘটনাটা বললেন। তারপর প্যাক করা বস্তুগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আন্দাজ করছি ওগুলো চোরাই মূর্তি। এদেশের বাইরে চালান দেবার জন্য রেডি করে রাখা হয়েছে।

NOT FOR SALE

সাদা পোশাক পরা লোকটি বলল, দুঃখের বিষয় এসব জল-পুলিশের এলাকার ব্যাপার নয়। আপনাকে অন্য কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?

পারিজাত বক্সি উত্তর দিলেন, আর কোন সাহায্য নয়। আপনি দয়া করে আমাদের দুজনকে আর এই জিনিসগুলো স্টীমারে তুলে নিন। আমাদের ভয় হচ্ছে বদমাইশগুলো টের পেয়ে হয়তো আমাদের অনুসরণ করতে পারে। মোটরবোটে যদি আসে তাহলে আমাদের নৌকার নাগাল পেতে মোটেই দেরি হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে স্টীমারের লোকটি বলল, ঠিক আছে, আপনাকে আমরা হরিহরপুর থানায় পৌঁছে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তারপর লোকটা স্টীমারের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করতেই স্টীমার থেকে একটা লম্বা কাঠের তক্তা নৌকার ওপর ফেলে দিল।

স্টীমার থেকে দুজন লোক তক্তার ওপর দিয়ে নৌকায় এসে দাঁড়াল, তারপর প্যাক করা তিনটে জিনিস স্টীমারে উঠিয়ে নিল।

এরপর কুমুদ আর পারিজাত বক্সি। সব শেষে সাদা পোশাক পরা লোকটা।

নৌকা ছাড়বার আগে পারিজাত বক্সি মাঝির হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এই নাও তোমার ভাড়া।

মাঝি মৃদু আপত্তি করল, আপনারা তো পুরো রাস্তা যান নি বাবু, তবে এ টাকা কেন?

পারিজাত বক্সি হাসলেন, ধরো নাও এ টাকা তোমার বকশিশ।

মাঝি টাকাটা নিয়ে সেলাম করল।

স্টীমার জল কেটে তীরবেগে ছুটল।

তার মধ্যেই স্টীমারের লোকেরা কুমুদ আর পারিজাত বক্সিকে চা, রুটি, ডিম দিল।

স্টীমার যখন পাড়ে ভিরল, তখন মাঝরাত।

বড় একটা অশ্বত্থগাছের তলায় গোটা চারেক টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। চালকদের কোথাও দেখা গেল না।

স্টীমার থেকে একটা লোক সঙ্গে এসেছিল, সে বলল, একটু দাঁড়ান স্যার, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, থানা এখান থেকে কতদূর?

তা মাইল আড়াই হবে।

NOT FOR SALE

লোকটা আর দাঁড়াল না। জোর পায়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

কুমুদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নিজের মুক্তিতে তার যে আনন্দ হয় নি, এমন নয়, কিন্তু তুলসীর কথা মনে হতেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে।

আহা বেচারি, পালিয়েও আবার ধরা পড়ে গেল। বদমাইশগুলো আবার তাকে হাতে পেয়ে রাগের চোটে হয়তো খতমই করে ফেলেছে।

তুলসী তার ভাগ্নে হলে হবে কি, দুজনে একেবারে বন্ধুর মতন। একজনকে ছাড়া আর একজনের অস্তিত্বও যেন কল্পনা করা যায় না।

কুমুদ হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিল।

স্টীমারের লোকটা আর একজন লোককে প্রায় টানতে টানতে এনে হাজির হল।

এই যে স্যার, আব্দুলকে ধরে এনেছি। টাঙ্গাওয়ালা আব্দুল। নে, কোন্ টাঙ্গাটা তোর? ঠিক কর, আমরা হরিহরপুর থানায় যাব।

আধ-ঘুমন্ত আব্দুল তার টাঙ্গায় উঠে বসল।

পারিজাত বক্সি কুমুদকে নিয়ে উঠলেন। তারপর স্টীমারর লোকটির সাহায্যে তিনটে প্যাকিং করা জিনিসও ওঠানো হল।

চারদিক একেবারে নিশুতি। মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুরের চিৎকার। একটা ষাঁড়কে ঘুরতে দেখা গেল।

চৌরাস্তার মোড়ে একটা ঘড়িতে তিনটে বাজতে দশ।

টাঙ্গা যখন থানায় পৌঁছল, তখন ঠিক তিনটে।

দারোগা ওপরেই ছিল, সিপাইয়ের চেঁচামেচিতে নেমে এল।

সব শুনে হুঙ্কার ছাড়ল, জায়গাটা কোথায় বলুন তো, আমি সবগুলোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছি।

পারিজাত বক্সি বললেন, আপনার সঙ্গে আমিও যাব, নইলে জায়গাটা আর মানুষগুলো আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না।

কুমুদ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে পারিজাত বক্সির একটা হাত আঁকড়ে ধরে বলল, না, না, আপনি যাবেন না। আপনাকে হাতের কাছে পেলে বদমাইশগুলো আবার বিপদে ফেলে দেবে।

পারিজাত বক্সি হেসে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, ভয় নেই, এবার আমরা তৈরি হয়েই যাব।

দারোগা সঙ্গে চারজন সশস্ত্র পুলিশ নিল।

NOT FOR SALE

তার আগে পারিজাত বক্সি বললেন, দয়া করে একবার এ তিনটে প্যাকিং খুলুন। ভিতরে কি আছে দেখা যাক। আপনার সামনে খুলব বলেই এতক্ষণ আমরা হাত দিই নি।

প্যাকিং খোলা হল।

দুটো মূর্তি খুলতেই কুমুদ চেঁচিয়ে উঠল, এই তো রতনগড়ের ধর্মরাজের মন্দিরের মূর্তি। দুটোরই মুণ্ড নেই। একটা মূর্তি পদ্মের ওপর বসে, আর একটা অদ্ভূত এক জানোয়ারের ওপর। দুটো মূর্তির দেহ থেকে উজ্জ্বল সোনালী আলো বের হচ্ছে।

তৃতীয় মূর্তিটি কষ্টিপাথরের গণেশ। আকারে ছোট।

পারিজাত বক্সি বললেন, চোরাই মূর্তি সনাক্ত করা হয়েছে, আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়া যাক, নইলে আসল মূর্তি পালাবে।

পুলিশের জীপ যখন গিয়ে পৌঁছাল, তখনও ভাল করে ভোর হয় নি। অন্ধকার সবে একটু তরল হচ্ছে।

পারিজাত বক্সি হতাশ হলেন। খাটিয়া খালি, কেউ শুয়ে নেই।

সকলে পাশের চালাঘরে ঢুকল।

ঘরের একেবারে কোণে একটা খাটিয়া। তার ওপর কে যেন আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়ে আছে।

তার ওপর টর্চের আলো ফেলতেই লোকটা ধড়মড় করে জেগে উঠল। তারপরই বালিশের তলা থেকে রিভলভার বের করে ছোঁড়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু কিছু করার আগেই, পুলিশ দুজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

তারপর পারিজাত বক্সি দারোগাকে নিয়ে যেখানে তিনি বন্দী ছিলেন, সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

চাবি দিয়ে তালা খোলবার আগে সাবধান করে দিলেন, আপনারা তৈরি থাকবেন। আমি লোকটিকে ভাল করেই বেঁধে গিয়েছিলাম, বাঁধন খুলে ফেলেছে কিনা জানি না।

দরজা খুলতে দেখা গেল লোকটা গড়িয়ে ঘরের আর এক কোণে চলে গেছে। পায়ের বাঁধন খোলা।

নিঃঝুম হয়ে পড়েছিল, একটা পুলিশ নীচু হয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করতেই লোকটা তাকে সবেগে লাথি মারল।

NOT FOR SALE

আরে বাপ! বলে পুলিশটা মুখে হাত দিয়ে ছিটকে পড়ল। তার হাতের পাশে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দারোগা বাকী দুজন পুলিশ নিয়ে লোকটাকে বেদম প্রহার দিতে আরম্ভ করল।

দুজনকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ জীপে ওঠাল।

জীপ যখন বেশ কিছুটা গিয়েছে তখন পারিজাত বক্সি আঙুল দিয়ে দারোগাকে দেখালেন, ওই দেখুন, ওই সবুজ গাড়িটা অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছে। আমার মনে হয় ওরা বোধহয় এদের দুজনকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে।

দারোগা বলল, ঠিক আছে। আসুক না, আমরা তো দলে ভারী আছি।

পারিজাত বক্সি বললেন, এক কাজ করুন, সামনের বাঁকের মুখে জীপটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলুন, আর একজন পুলিশকে বলুন, এ দুটো লোকের মুখে কাপড় গুঁজে দিতে, যাতে এরা চিৎকার না করতে পারে।

তাই করা হল। জীপটাকে ঘুরিয়ে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে রাখা হল। পারিজাত বক্সির নির্দেশে দারোগা আর পুলিশেরা রিভলভার হাতে কয়েকটা পাথরের পিছনে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই সবুজ মোটরটা ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মোটর থেকে দুজন লোক নামল। একজনের চোখে দূরবীন, আর একজনের হাতে বোমা।

দূরবীন চোখে লোকটা সামনের রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ দেখল, তারপর অন্য লোকটার কানে কানে কি বলল।

তারপর দুজনেই পাশের জঙ্গলের দিকে মুখ ফেরাল।

বোঝা গেল, তারা সন্দেহ করছে পুলিশের জীপ পাশের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে রয়েছে।

দূরবীন চোখে লোকটা দূরবীন নামিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করল। দুজনেই সাবধানে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে লাগল।

একেবারে পাথরের সামনে আসতেই পারিজাত বক্সি দারোগার গা টিপে ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দারোগার রিভলভার থেকে গুলি ছুটল।

অব্যর্থ লক্ষ্য। যে লোকটি হাতে বোমা ছিল, তার মণিবন্ধে গুলি লাগল।

লোকটা আর্তনাদ করে হাত চেপে বসে পড়ল। হাতের বোমা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল। প্রচণ্ড শব্দ। ধুলোর বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারদিক অন্ধকার। অন্ধকার কমতে দেখা গেল সুবজ গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

NOT FOR SALE

অন্ধকার দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে দারোগা আর পুলিশেরা লোক দুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বন্দী করে ফেলল। তারপর দড়ি দিয়ে ভাল করে বেঁধে জীপে তুলল।

দারোগা বলল, খুব জোরালো বোমা স্যার। আমাদের জীপের ওপর পড়লে কি হত বুঝতে পারছেন!

পারিজাত বক্সি কোন উত্তর দিলেন না। শুধু মুচকি হাসলেন।

থানায় যখন সবাই গিয়ে পৌঁছল, তখন বেশ রোদ উঠেছে।

লোক চারজনকে হাজতে রাখা হল। পুলিশের সতর্ক প্রহরায়।

খাওয়া-দাওয়া করে পারিজাত বক্সি দারোগাকে বললেন, আমি একটা ট্রাঙ্ককল করব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুন।

পারিজাত বক্সি মিস্টার বাসুকে ফোন করে সব জানালেন।

মিস্টার বাসু খুব খুশী। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর বললেন, আমি বিহারের পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করছি। তোমরা পুলিশের সঙ্গে ছাড়া আসবার চেষ্টা করো না। পথে বিপদ হতে পারে। মূর্তিচোরের দল সারা দেশে ছড়ানো। তোমাদের আবার আক্রমণ করাও বিচিত্র নয়।

পারিজাত বক্সি বললেন, ঠিক আছে, আমরা পুলিশ গার্ড ছাড়া বের হব না।

একেবারে রাজকীয় ব্যবস্থা। বিহার পুলিশের উচ্চপদস্থ এক অফিসার মোটর নিয়ে হাজির। সঙ্গে গোটা চারেক সশস্ত্র পুলিশ।

ওরা বাংলা দেশের সীমান্ত পর্যন্ত যাবে, সেখান থেকে দায়িত্ব নেবে বাংলার পুলিশ।

খাওয়া-দাওয়া দারোগার বাড়িতেই হল।

দারোগা পারিজাত বক্সির পিঠ চাপড়ে বলল, মিস্টার বক্সি আপনার কৃতিত্বের কথা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। আপনার জন্যই এই কুখ্যাত দলটিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলাম। এরা নিজেদের মাতৃভূমি থেকে পবিত্র দেবদেবীর মূর্তি শুধু অর্থের জন্য দেশ-বিদেশে চালান দেয়। এমন ঘৃণ্য কাজ আর কি হতে পারে!

পারিজাত বক্সি বাধা দিয়ে বললেন, কৃতিত্ব আমার কিছুই নয়। আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এ কাজ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আসল কৃতিত্ব কাদের জানেন?

NOT FOR SALE

কাদের?

এই কুমুদ আর তার ভাগ্নে তুলসীর। এদের অসম-সাহসিকতার তুলনা নেই। একজনকে আমার সঙ্গে নিয়ে চলেছি, কিন্তু তুলসী কোথায় আমাদের জানা নেই।

দারোগা হুঙ্কার ছাড়ল, তুলসীর বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যখন এরা ধরা পড়েছে তখন কি করে মুখ খোলাতে হয়, সে ওষুধ আমার জানা আছে।

যাবার সময়ে কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, এই মূর্তিগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবেন না? অন্ততঃ রতনগড়ের মন্দিরের মূর্তি দুটো?

পারিজাত বক্সি হাসলেন, এ মূর্তি নিয়ে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। বিহার কোর্টে কেস হবে। কেস শেষ হয়ে গেলে মূর্তি দুটো আবার রতনগড়ের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হবে। চল, কুমুদ এবার আমরা রওনা হই।

এদের যাত্রার খবর পশ্চিমবাংলার পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো হয়েছিল।

বাংলা-বিহার সীমান্তে পৌঁছে পারিজাত বক্সি নিজেই অবাক।

পুলিশ নিয়ে মিস্টার বাসু নিজে এসেছেন নিয়ে যেতে।

কুমুদ আর পারিজাত বক্সি নামতেই তিনি বললেন, এস বিজয়ী বীর। কুমুদ, ওই দ্যাখ, কারা এসেছেন।

কুমুদ দেখল, রাস্তার ধারে দাদুর মোটর। মোটরের সামনে বাবা, মা, দিদি, জামাইবাবু আর তুলসী।

তুলসী ছুটে এসে কুমুদকে জড়িয়ে ধরতেই কুমুদ জিজ্ঞাসা করল, আরে তুলসী, তুই!

তুলসী বলল, কুমুদমামা চল, যেতে যেতে তোমাকে সব বলব কি করে আমি পালিয়ে এসেছি।

সকলের চোখে জল, তবে এ জল আনন্দের। বাড়ির ছেলের বাড়ি ফিরে আসার জন্য।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

রামগতির দুর্গতি

ভোরবেলা দরজা খুলেই রামগতিবাবুর চোখ কপালে উঠল।

সর্বনাশ, এমন কাণ্ড কে করলে! কোন হতভাগার কাজ। ঠিক চৌকাঠের ওপাশে বেশ প্রমাণ সাইজের একটি সরস্বতী মুর্তি। হাতের বীণা আর পায়ের তলায় বাহন নিয়ে তৈরী।

রামগতিবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। একেবারে সদর রাস্তার ওপর। এই ঠাকুর যদি ঘরে তুলতে হয় তা হলেই তো কেলেঙ্কারি। পূজোর যোগাড় করো, পুরুত খোঁজো, নৈবেদ্য সাজাও। এ সবের মানে এক গাদা টাকা বের করো। শরীর পাত করে উপায় করা টাকা।

রামগতিবাবু এবার কপাল চাপড়াতে শুরু করলেন। পথচলতি দু-একজন দেখেও দেখল না। পারতপক্ষে সকালের দিকে পাড়ার কেউ তাঁর দিকে চায় না। লোকে বলে খালি পেটে রামগতিবাবুর দিকে দেখলে নাকি সেদিন আর অন্ন জোটে না। ভরা পেটে দেখলেও হাঁড়ি ফাটে। রাতে প্রায় নিরম্বু উপবাস। কথাটা চারদিকে এত চালু হয়ে গেছে যে ট্রামে বাসে রামগতিবাবু উঠলে কণ্ডাকটাররা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে টিকেট চায়। চার চক্ষে মিলন না হয়ে যায়!

অবশ্য ট্রামে বাসে রামগতিবাবুকে বিশেষ চড়তে হয় না। অফিসের বালাই তো আর নেই। তবে সুদের টাকা আদায় করতে মাঝে মাঝে বেরোতে হয়। তাও মাইল চারেকের পথ হলে রামগতিবাবু হেঁটেই মেরে দেন। গাড়ির পরোয়া করেন না। অবশ্য হাঁটেন যখন, জুতো বগলে থাকে, নয়তো পাকা রাস্তায় নতুন জুতোর দফা শেষ হয়ে যাবে যে!

নতুন জুতো মানে কত নতুন তাও রামগতিবাবু সকলকে বলেন। রামগতির ঠাকুরদা ন্যায়গতি মারা যাবার সময় তাঁর বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাগরা জুতোটা নাতিকে দিয়ে গিয়েছিলেন। রামগতির বাপ সত্যগতিকেই দিতেন কিন্তু তাঁর বেহিসেবী চলাফেরা ন্যায়গতির ভাল লাগে

NOT FOR SALE

নি। রোজ সকালে উঠে ছোলা ভিজানো খেতেন বাপ সত্যগতি আর ছেলে রামগতি। এই ছোলাও কিনতে হত না। সামনেই বাজার। বাজার শেষ হলে ন্যায়গতি পড়ে থাকা ছোলার রাশ রোজ কুড়িয়ে আনতেন। তাতেই রোজকার জলখাওয়াটা হয়ে যেত।

রামগতি সেই ছোলা দিব্যি হাসিমুখ করে খেয়ে যেতেন কিন্তু বাপ সত্যগতির নবাবী স্বভাব। ছোলার সঙ্গে রোজ এক আনার আখের গুড় চাই। বাবুয়ানী দেখে ন্যায়গতির চক্ষুস্থির। রোজ এক আনা হলে মাসে কত পড়ে? আর বছরে? হিসাবটা ন্যায়গতি আর শেষ করতে পারেন নি। সর্বনাশের চেহারা দেখে মাথা ঘুরে দাওয়ার ওপর পড়ে গিয়েছিলেন। এমন ছেলেকে টাকা পয়সা বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেলে তো দু-দিনে উড়িয়ে দেবে। তাই তাঁর সব কিছু মায় বাপের কাছ থেকে পাওয়া জুতোটা পর্যন্ত রামগতিকে দিয়ে গেছেন।

রামগতিও সে দানের মর্যাদা রেখেছেন। জুতোজোড়া আজও প্রায় অটুট। শুধু বাঁ পাটির একটা কোণে একটু ফুটো হয়ে গেছে। একটা আঙুল বেরিয়ে থাকে। আঙুলটা লোকের নজরে পড়ে। তা পরুক, রামগতি তো আর অঙ্গহীন নন। আঙুল আছে বলেই তো লোকে দেখতে পায়।

তবে লোকে যে বিশেষ দেখতে পায় এমন নয়। কারণ পথেঘাটে রামগতি জুতো পায়েই দেন না। পাছে শুকিয়ে ছোট হয়ে যায়, তাই রাত্রে শুতে যাবার সময় জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে বিছানার ওপর চলাফেরা করেন। জুতো পরাও হল, আবার তলা ক্ষয়ে যাবারও ভয় নেই।

এ হেন রামগতির এমন সর্বনাশ কে করলে! মাথা চাপড়াতে চাপড়াতেই রামগতিবাবু ভাবতে শুরু করলেন। পাড়ার বারোয়ারী সরস্বতী পুজোয় ছেলেরা চাঁদা চাইতে এসেছিল। নগদ ছটা নয়া পয়সা দিলেই হত। তখন তাদের তাড়াবার জন্য ওরকম ভাবে দুকানে গামছা বেঁধে হঠাৎ কালা সাজাটা উচিত হয় নি।

—আর বাবাসকল, কাল থেকে যে কানে কী হয়েছে, একেবারে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। দাদুরা, তোমরা দিনদশেক বাদে এস।

তখন ছেলেগুলোর চোখমুখের চেহারা রামগতিবাবুর ভাল ঠেকে নি! এ নিশ্চয় তাদের কাজ!

NOT FOR SALE

কখন এই দুষ্কর্ম করে গেছে কে জানে। আর ভোরে হলে রামগতিবাবু সরস্বতীর মূর্তিটা তুলে অন্য কারুর বাড়ির দরজায় রেখে আসতেন। কিন্তু এখন সকাল হয়ে গেছে। লোকজন চারদিকে উঠে পড়েছে। মূর্তি সরাতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন।

এদিকওদিক চেয়ে রামগতিবাবু চোখ বন্ধ করে হাতজোড় করলেন।

—মা, মাগো!—বলেই মনে পড়ে গেল। দুর্গাকে যখন মা বলা হয়, তখন সরস্বতী তো বোন। সম্বোধনের গোলমাল হলে চটে যায়।

তাই রামগতিবাবু আবার শুরু করলেন, ভগ্নি, হে মহাভগ্নি, তোমরা তো দেবতার জাত। ইচ্ছা করলে যেমন আবির্ভাব হতে পারো, তেমনি চট্ করে অন্তর্ধানও করতে পার। আমি তোমার বেকার, অক্ষম ভাই। তুমি এখান থেকে সরে চৌধুরীদের উঠানে চলে যাও ভগ্নি, লালমোহন চৌধুরীদের বাড়ি। কিংবা আরো কাছে বোকা ঘোষ রয়েছে। বোকা ঘোষ মানে তিনকড়ি ঘোষ। বোকা পাঁঠার ব্যবসা করে বলে তার নামই হয়ে গেছে বোকা ঘোষ। তুমি তো অন্তর্যামী ভগ্নি। সবই তুমি জানো। এবার যাও ভগ্নি। বেলা বাড়ছে। পুজো দেরিতে শুরু হলে, তোমারই কষ্ট।

প্রথমে বাঁ চোখ, তারপরে রামগতিবাবু আস্তে আস্তে ডান চোখ খুললেন। মূর্তি এক ইঞ্চি নড়ে নি। ঠিক একজায়গায় বসে মুচকি মুচকি হাসছে।

এবার রামগতিবাবুর চোখে জল এসে গেল।

কোন উপায় নেই। হিন্দুর ছেলে, এ মূর্তি এখানে এভাবে ফেরে রেখে যেতে পারবেন না। অভিশাপে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু ঘরে তোলা মানে এক রাশ পয়সার শ্রাদ্ধ। প্রথমে পুরুত খুঁজতে যেতে হবে। কোন পুরুত যে রামগতিবাবুর বাড়ি আসবে এমন আশা কম। হয়তো আগাম করকরে একটা টাকাই চেয়ে বসবে। তার ওপর নৈবেদ্যের খরচই কি কম! ধনেপ্রাণে রামগতিবাবু মারা পড়বেন।

এই খরচের ভয়ে এত বছর পর্যন্ত তিনি বিয়ে থা করেন নি। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ার পাঠ নেই, পাছে তারা আসে তাঁর বাড়িতে। পাড়ায় কেউ তাকে নিমন্ত্রণ করে না, করলেও তিনি যেতেন না, সে বিষয়ে কোন

NOT FOR SALE

সন্দেহ নেই। এত কষ্টে, জমানো টাকা এইভাবে একদিনে ফুটকড়াই হয়ে যাবে, তা কি কোনদিন তিনি কল্পনা করতে পেরেছেন।

রামগতিবাবু আবার চোখ বুজলেন। চিরদিনের জন্য নয়, সাময়িকভাবে। বিড়বিড় করে বললেন, বিপদের সময় রসিকতা ভাল লাগছে না ভগ্নি। তুমি সত্যি সত্যি অন্য কোথাও যাও। এ পাড়ায় কারো বাড়ি পছন্দ না হয়, বাহন হাঁস তো রয়েইছে, দূরে কোথাও, কোন মফস্বলেও চালাতে পারো। সেখানে মাইকের ঝামেলা নেই, নৈবেদ্যটাও ভাল হয়। তাই যাও ভগ্নি। এভাবে জ্ঞাতিভাইয়ের সর্বনাশ কোরো না।

—রামগতিকা ঘর কিধার হ্যায়?

জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামগতিবাবু চমকে উঠে চোখ খুলেই হতবাক। জটাজুটধারী, দীর্ঘদেহী, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, হাতে ত্রিশূল।

রামগতিবাবুর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। মেয়েকে নিয়ে যেতে কৈলাস থেকে বাপ নিজে এসেছেন। আকুল প্রার্থনায় মেয়ে টলে নি, বাপ টলেছে। কিন্তু রামগতিবাবুর একটা খটকা লাগল। শিবের মুখে হিন্দী কেন? কৈলাসশিখরেও কি রাষ্ট্রভাষা চালু হয়েছে? কিছু বলা যায় না। এও হয়তো তেনজিংয়ের কীর্তি। জাতীয় পতাকার সঙ্গে সুনীতিবাবুর পাঠশালাও হয়তো নিয়ে গিয়েছিল।

রামগতিবাবু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, প্রভু, এই অধমই রামগতি। দয়া করে আপনার ছোট্ট মেয়েকে কোলে করে নিয়ে যান ঠাকুর। কলকাতা বড় খারাপ জায়গা। লরী আর স্টেট বাসে ঠাকুরদেবতা মানে না।

—বেটা, তুম বড়া ভাগ্যবান! কথার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে রামগতিবাবুর দেহে ছিটিয়ে দিল।

রামগতিবাবু অবোধের মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। দেবাদিদেবের এ আবার কী মস্করা! বাড়ির দরজায় এই বিপদ আর তিনি ভাগ্যবান! প্রভুর নেশার মাত্রা বোধ হয় আজ ঠিক নেই।

—সরস্বতীমায়ীকো উঠায়কে ঘরকা আন্দার লে চলো। পূজাকা দের্ হো যায় গা।

NOT FOR SALE

—কিন্তু মহেশ, আমার সামর্থ্য তো আপনার অজানা নেই। এতো খরচের ঠেলা কী করে সামলাবো প্রভু?

—কুছ খরচা নেই বেটা। মায়ীকা পূজা মায়ী কর লে গা।

সন্ন্যাসীর অভয়বাণীতে রামগতিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হিন্দী ভাষাটা তাঁর খুব রপ্ত নয়। তবে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারছেন। বিশেষ করে খরচ না হওয়ার প্রসঙ্গটা।

তবু মনের কোণে সামান্য একটু সন্দেহ।

—প্রভু, পুজো মানেই পুরুত, নৈবেদ্য, আয়োজন। চেপেচুপে করলেও খরচের বহর কম নয়।

সন্ন্যাসী হাসল। অভয় দেবার ভঙ্গীতে হাতটা তুলে বলল, কুছ লাগবে না। পূজা হামি করবে। ফুল ফলের কুছ দরকার নেই। ভক্তি, প্রেম আর প্রীত, ইস্‌সে ভারী নৈবেদ্য দুনিয়ামে কুছ নেহি।

রামগতিবাবু আশ্বস্ত হলেন। রাষ্ট্রভাষাটা অনেক তরল হয়েছে বলে নয়, নিখরচায় পূজা সাঙ্গ হবে বলে।

গোপন কথাটা সন্ন্যাসী ভাঙলো সরস্বতীর মূর্তি ঘরে তোলবার পর।

—আরে বেটা, এ মহাসরস্বতী আছে। এঁর কাছে তোর দুখ্ জানা। কামনা সফল হোয়ে গা। যো কুছ ইয়ে দেবীকা সামনামে রাখে গা, সব ডবল হো যায়ে গা।

—অ্যাঁ?—রামগতিবাবু জানলার গরাদ ধরে মূর্ছা সামলালেন। যা সামনে রাখবেন সব ডবল? ঘটি, বাটি, গামছা, চাদর, টাকা পয়সা সব?

সন্ন্যাসী কথা বলল না। আসন বিছিয়ে পূজায় বসে পড়ল।

রামগতিবাবু উঠে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। কে কোথা দিয়ে উঁকি মারে ঠিক নেই। পুজো হচ্ছে দেখলেই প্রসাদের লোভে ঘরে ঢুকে পড়বে।

পূজাসাঙ্গ হল দুপুরবেলা।

সত্যিই ফল, মূল, ফুল, ধূপ, ধুনো কিছুই লাগল না। কেবল সন্ন্যাসী ওং বোং ঠোং করে মন্ত্র পড়তে লাগল। রামগতিবাবু হাতজোড় করে পাশে বসে রইলেন।

NOT FOR SALE

পুজো শেষ হতে সন্ন্যাসী বলল, নিয়ে আয় বেটা কী ডবল করবি। এবার হামায় যেতে হোবে।

রামগতিবাবু চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখলেন। বাঁশের আলনায় একটা ছেঁড়া কোট, একটা গামছা। গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার যোগাড়। ঘরের এ কোণে একটা ঘটি। থালার বালাই নেই। কোথাও থেকে একটা কলাপাতা ছিঁড়ে আনেন। এ সব ডবল করে আর লাভ কি। কী আর সুবিধা। তবে হ্যাঁ—

মনে হতেই রামগতিবাবু চমকে উঠলেন। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। কিন্তু যদি কেউ টের পায়। ঠিক এক জায়গায় নয়। পিছনে বাগানে গাছের তলায় পোঁতা আছে। সেগুলো যদি ডবল হয়ে যায়, তবে রামগতিবাবুকে আর পায় কে! একশো দুশো হয়ে যাবে হাজার দু-হাজার।

দুটো হাত দিয়ে বুকটা সজোরে চেপে রামগতিবাবু বুকের স্পন্দন থামালেন। আনন্দে হার্টফেল না করেন। টাকা পয়সা ডবল হবার আগেই।

অনেক ভেবে চিন্তে রামগতিবাবু একটা মতলব ঠিক করলেন! শুধু মানকচু গাছতলায় যেটুকু পোঁতা আছে, সেটা দিয়েই পরীক্ষা করবেন। একেবারে সব বের করবেন না। সে টাকাগুলো যদি ডবল হয়ে যায়, পরে বাকীগুলো খুঁড়ে বের করবেন।

তাই করলেন। বোধ হয় গোটা পঞ্চাশেক টাকা ছিল। একটা ছোট থলিতে ভরে রামগতিবাবু সন্ন্যাসীর হাতে দিতে গেলেন।

—আমি গরীব মানুষ। বেশী টাকা কোথায় পাবো বাবা! এ কটাই ডবল করে দাও।

সন্ন্যাসী আঁতকে উঠল, খবরদার বেটা, টাকা আমার গায়ে ছোঁয়াস নি! ও পাপ, ও মায়া, ও ছুঁলে আমি ধর্মে পতিত হোবে। আমার এতোদিনের যাগযজ্ঞকা ফল সব নাশ হোবে। ও থলি তুই নিজের কাছে নিয়ে বোস্।

সন্ন্যাসীর তরল হিন্দী তরলতর হয়ে এল। প্রায় বাংলাঘেঁষা।

রামগতিবাবু টাকার থলি কোলে নিয়ে বসলেন। সন্ন্যাসীর ওপর রীতিমত ভক্তি এল। টাকা স্পর্শ করেন না পর্যন্ত। একে বারে খাঁটি সাধু সন্দেহ নেই।। পেয়ারাগাছতলার টাকাটা বের করলেই হত। এরপর আর ডবল করতে সন্ন্যাসী রাজী হবে কিনা কে জানে।

NOT FOR SALE

সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে রামগতিবাবুও। মিনিট পনেরো পর সন্ন্যাসী কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে রামগতিবাবুর হাতে দিয়ে বলল, লে বেটা, পি লে।

রামগতিবাবু অঞ্জলি পেতে পান্ করলেন। একবার, দুবার নয়, সাত সাত বার।

রামগতিবাবু যখন চোখ খুললেন তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। সন্ন্যাসী নেই।

কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি থলিটা রামগতিবাবু ছুঁয়ে দেখলেন তারপরই আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। থলিটা বেশ ভারী। ডবল নয়, বুঝি টাকাগুলো চার ডবলই হয়ে গেছে। জয় মহাসরস্বতী, জয় সন্ন্যাসী।

তাড়াতাড়ি উঠে রামগতিবাবু দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সন্ন্যাসী বোধ হয় এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছে।

ফিরে এসে রামগতিবাবু থলিটা মেঝেতে উপুড় করেই আর একবার চিৎকার করে উঠলেন। এবার আর আনন্দে নয়।

মেঝেতে বড় বড় পাথরের নুড়ি ছড়িয়ে পড়ল। রীতিমত ভারী। সর্বনাশ, রামগতিবাবু ধেইধেই করে নাচতে শুরু করলেন। দু-হাত কোমরে দিয়ে নয়, দু-হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে।

সরস্বতীর দিকে নজর পড়তেই রামগতিবাবু নাচ থেমে গেল। চুল ছেঁড়াও বন্ধ হল।

একভাবে মুচকে মুচকে হাসছে। রামগতিবাবুর এমন বিপর্যয়েও হাসি বন্ধ হয় নি।

রামগতিবাবুর রক্ত মাথায় উঠল। দাঁতে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠলেন, নিকুচি করেছে ভগ্নীর।

রামগতিবাবু সরস্বতীর মূর্তিটা বগলদাবা করে তীরবেগে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। কোন দিকে না চেয়ে সোজা ছুটলেন গঙ্গার দিকে।

ঠিক এই অবস্থাতেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রামগতিবাবুর দেখা হয়েছিল। রামগতিবাবুর চেহারা দেখে তারা আর কথা বলতে সাহস করে নি।

NOT FOR SALE

অবশ্য সেই সন্ন্যাসীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। টাকা ডবল করে হয়তো সে কৈলাসেই ফিরে গেছে।

তবে পাড়ার বদমাইশ ছেলেরা আজও বলাবলি করে যে সন্ন্যাসীর চেহারাটা নাকি পাড়ার চাটুজ্জে বাড়ির পিণ্টুর জগামামার মতন। যে পিণ্টু রামগতিবাবুর কাছে সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গিয়েছিল। আর যে মামা ভবানীপুরের শৌখিন দলের নামকরা অভিনেতা।

—সমাপ্ত—

NOT FOR SALE

বল করে

সন্ন্যাসীর
যে পিণ্টু
যে মামা

কাঠের পা

প্রথমে খোঁজ পেল হরিয়া মালী।

বেশ বেলা হয়েছে। এ সময়ে প্রফেসর উঠে পড়েন। সোজা রাস্তা ধরে বাদামতলা পর্যন্ত বেড়িয়ে আসেন। তারপর বারান্দায় বসে চায়ে চুমুক দেন।

হরিয়াই চা তৈরি করে দেয়। বিস্কুট কেনা থাকে।

হরিয়া উঁকি দিল। দরজা বন্ধ, জানলাগুলোও।

এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই পাহাড়ে জায়গায় শীতের প্রকোপ বেশ বেশী।

একটু পরে হরিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। কোন সাড়া নেই।

আশ্চর্য কাণ্ড। এরকম তো হবার কথা নয়।

হরিয়া দরজায় কান পেতে রইল। না, নিস্তব্ধ। ক্রাচের কোন শব্দ নেই।

ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকল না।

হরিয়া বেরিয়ে গেল।

একটু দূরে দীনবন্ধু বাবুর বাড়ি। অবসর প্রাপ্ত নামজাদা সাবজজ। প্রফেসরের বিশেষ বন্ধু।

হরিয়া ডাকল, সরকার বাবু সরকার বাবু।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দীনবন্ধু সরকার একটা বই পড়ছিলেন, হরিয়ার চীৎকারে এগিয়ে এলেন।

কিরে হরিয়া?

আজ্ঞে, প্রফেসরকে এত করে ডাকছি, কোন সাড়া পাচ্ছি না।

সেকি? চল্, আমি যাচ্ছি।

দীনবন্ধু সরকার কোট গায়ে দিয়ে হরিয়ার পিছন পিছন এ বাড়িতে এসে দাঁড়ালো।

NOT FOR SALE

হরিয়া আবার দরজায় ধাক্কা দিল।

দীনবন্ধু সরকার চীৎকার করলেন।

প্রফেসর, ও প্রফেসর।

কোন সাড়া নেই।

দীনবন্ধু সরকার চিন্তিত হলেন।

আমি তো ভাল বুঝছি না হরিয়া। তুই সাইকেলে করে একবার থানায় চলে যা। আমার নাম করে ছোট দারোগাকে আসতে বল।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে হরিয়া সাইকেলে বেরিয়ে গেল।

দীনবন্ধু সরকার একটা গাছের গুঁড়িতে বসলেন।

প্রফেসর এখানে আছেন দশ বছরেরও বেশী। কোন এক কলেজে পড়াতেন। বিপত্নীক। ছেলেমেয়ে নেই। রিটায়ার করে এখানে আস্তানা বেঁধেছেন।

নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। হরিয়া দেখা শোনা করে। আদিবাসী একটি প্রৌঢ়া দুবেলা রেঁধে দিয়ে যেত।

মাঝে মাঝে কিছু লোক আসত।

প্রফেসর বলতেন, ছাত্রের দল মাঝে মাঝে জ্বালাতে আসে। আর বলেন কেন। কিছু কি আর মনে আছে। এখন কত রকম নতুন থিয়োরি হয়েছে। প্রফেসর বোটানি পড়াতেন। মাঝে মাঝে কখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যান। গাছপালা সংগ্রহ করে আনেন।

প্রফেসরের একটা পা নেই। হাঁটু থেকে কাঠের পা লাগানো। বগলে ক্রাচ। এ অসুবিধায় প্রফেসর অভ্যস্ত। অবসর গ্রহণ করার পরই এক দুর্ঘটনায় পা হারিয়েছিলেন। রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের তলায় পাটা থেঁতলে গিয়েছিল। যমে মানুষে টানাটানি। পা কেটে বাদ দিয়ে প্রফেসর বাড়ি ফিরেছিলেন।

প্রফেসর দীনবন্ধু বাবুর দাবার সঙ্গী।

রোজ সন্ধ্যায় দুজনে দাবার ছক পেতে বসেন। খেলা জমে উঠলে দুজনের কেউই উঠতে চায় না।

হরিয়া ডেকে ডেকে প্রফেসরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত।

সাইকেলের শব্দ হ'তে দীনবন্ধু বাবু ফিরে দেখলেন।

NOT FOR SALE

হরিয়া সাইকেলে ফিরছে।

কিরে কি হল?

ছোট দারোগা জীপে করে আসছেন।

দীনবন্ধু বাবু রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই পথের বাঁকে জীপ দেখা গেল।

শুকনো পাতার স্তূপ উড়িয়ে দুরন্ত বেগে আসছে।

ঠিক দীনবন্ধুবাবুর সামনে এসে জীপ থামল।

জীপ থেকে ওসি মোহন সিং লাফিয়ে নামল।

নমস্কার সরকার সাব কি ব্যাপার?

কিছু বুঝতে পারছি না। প্রফেসরের দরজায় ধাক্কা দিয়েও দরজা খুলতে পারছি না।

চলুন, দেখি একবার।

মোহন সিং-য়ের ইঙ্গিতে জীপ থেকে একজন কনেষ্টবল নামল।

বন্ধ দরজায় সজোরে বুটের লাথি।

দরজার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

মোহন সিং হরিয়ার দিকে ফিরে বলল।

বাড়িতে শাবল আছে?

হরিয়া একটা শাবল এনে দিল।

কনেষ্টবল দরজার ফাঁকে শাবল দিয়ে চাপ দিল। কয়েকবার চাপ দেবার পরই দরজার কব্জা খুলে পাল্লা কাত হয়ে পড়ল।

মোহন সিং টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

আগে মোহন সিং, তারপর কনেষ্টবল, সবশেষে দীনবন্ধু সরকার আর হরিয়া।

বিছানার ওপর প্রফেসর শুয়ে।

শোবার ভঙ্গীটা কারোরই ভাল ঠেকল না।

কাছে গিয়ে দেখল, দুটো চোখ বিস্ফারিত, মুখের দু পাশে ফেনা।

মোহন সিং দেহের ওপর হাত রেখে বলল, অনেকক্ষণ সব শেষ হয়ে গেছে। দেহ বেশ শক্ত।

NOT FOR SALE

দীনবন্ধুবাবুর দিকে ফিরে মোহন সিং জিজ্ঞাসা করল।

কত বয়স হয়েছিল ভদ্রলোকের?

তা প্রায় বাষট্টি হবে। বয়সের আগেই কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

কি মনে হচ্ছে আপনার?

স্বাভাবিক মৃত্যু বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখছেন মুখ চোখের ভঙ্গী যেন দমবন্ধ করে মেরেছে।

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু কে মারল, সে বের হ'ল কি করে? ঘর তো ভিতর থেকে বন্ধ।

মোহন সিং একটু চিন্তিত হল।

এগিয়ে গিয়ে জানলাগুলো পরীক্ষা করল। জানলাগুলো সব ভিতর থেকে ছিটকানি দেওয়া।

কাঠের পা আর ক্রাচ কোণের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা।

তাহলে আততায়ী এল কি ভাবে?

মোহন সিং বলল, আগে ডেড বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিই, রিপোর্ট কি বলে দেখি তারপর কর্তব্য ঠিক করা যাবে।

কনেস্টবল জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মোহন সিং ঘরে তালা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

লোক এসে হাতের ছাপ নিয়ে যাবে। কলকাতা এখান থেকে খুব দূর নয়। দরকার হলে ফোরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট থেকেও লোক আসতে পারে।

মোহন সিং দীনবন্ধু সরকারকে জিজ্ঞাসা করল।

আপনি শেষ কবে প্রফেসরকে দেখেছেন?

দীনবন্ধুবাবু শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল, এত দ্রুত একটা পরিচিত মানুষ চিরদিনের জন্য সরে যাবে।

মোহন সিংয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন।

কাল রাত্রেও প্রফেসর আমার সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন। তবে একটু যেন অন্যমনস্ক। উনি খুব পাকা খেলোয়াড়। কোনদিন ওঁকে হারাতে পারি না, কাল দুবার মাত করে দিয়েছি।

NOT FOR SALE

আমি বলেছিলাম, কি হ'ল প্রফেসর, মনটা কোনদিকে?

প্রফেসর চমকে উঠে বলেছিলেন, মন ঠিক আছে। দুপুর থেকে শরীরটা খুব যুত নেই। আজ তাড়াতাড়ি উঠব।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই প্রফেসর উঠে পড়েছিলেন।

আমি ভেবেছিলাম, আমাদের তো বয়স হচ্ছে। শরীর সব দিন কি আর এক রকম থাকে।

হরিয়াও প্রশ্নের উত্তরে নতুন কোন আলোকপাত করতে পারল না।

কেবল বলল, দুপুর বেলা দুটি লোক এসেছিল, বোধ হয় ছাত্রই হবে। দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল।

প্রফেসরের দেহ পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল। লোক এসে হাতের ছাপও তুলে নিল। নানাদিক থেকে ঘরের ফটো। কলকাতায় ফোরেনসিক ডিপার্টমেণ্টে পাঠাবে।

দীনবন্ধু সরকার যখন বাড়ি ফিরলেন বেশ ম্রিয়মান অবস্থা।

বিশেষ কারও সঙ্গে মিশতেন না একমাত্র প্রফেসর ছাড়া।

এই বয়সে নতুন করে বন্ধু সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়।

দীনবন্ধু বাবুর স্ত্রী উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগো, কি শুনছি?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দীনবন্ধুবাবু বললেন—

প্রফেসর মারা গেলেন।

হঠাৎ?

মানুষ কি আর বলে কয়ে মারা যায়।

আমার কিন্তু বাবু সন্দেহ হচ্ছে।

সন্দেহ, কিসের সন্দেহ?

জলজ্যান্ত লোকটা তাবলে এভাবে মারা যাবে।

দেখি ডাক্তারের রিপোর্ট আসুক।

অন্যদিন দীনবন্ধুবাবু একটু বেড়িয়ে আসেন, আজ বাড়ীর মধ্যেই বসে রইলেন। মনটা খুব খারাপ। কে বলেছিল, পরমায়ু পদ্মপাত্রে জল। ঠিক কথাই। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে থানার দিকে গেলেন।

NOT FOR SALE

মোহন সিং থানায় ছিল।

অভ্যর্থনা করে বলল আসুন, আসুন কি খবর?

খবর তো আপনাদের কাছে।

এই একটু আগে রিপোর্ট এসেছে, অবশ্য লিখিত রিপোর্ট নয়, ডাক্তার সেন ফোনে জানিয়েছেন যে মৃত্যু হয়েছে করোনারি অ্যাটাকে। যাক নিশ্চিন্ত। নয়তো এই নিয়ে ঝামেলা হত।

করোনারি অ্যাটাকে?

তাই তো বললেন। প্রফেসরের হার্টের অবস্থার কথা কিছু জানেন আপনি? উনি কোনদিন কিছু বলেছেন?

না, হার্টের অবস্থা খারাপ এমন কথা বলেননি। তবে খুব সাবধানী লোক ছিলেন। তিনমাস অন্তর রক্তপরীক্ষা করাতেন। সুগার, কোলেস্টরাল, ইউরিয়া সব চেক করাতেন।

মোহন সিং দার্শনিকের ভঙ্গীতে বলল।

আর মশাই যত চেক করান, মৃত্যু যখন থাবা বসায়, তখন কিছুর পরোয়া করে না। সব রিপোর্ট বানচাল করে দেয়।

আচ্ছা চলি।

দীনবন্ধুবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

মোহন সিংও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

স্যর, এ খবরের জন্য আপনি এতটা হেঁটে এলেন কেন? বাড়ীতে ফোন রয়েছে, ফোন করে জেনে নিলেই পারতেন।

একটু হাঁটতেও বেরিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে খবরটা নিয়ে গেলাম।

দীনবন্ধু সরকার বাড়ী ফিরে এলেন।

সামনের বাগানে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল।

স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন।

আমি একটা কাজ করেছি।

কি কাজ?

পারিজাত বক্সীকে ফোন করে দিয়েছি।

দীনবন্ধু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সীর নাম শোননি? বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা।

দীনবন্ধুবাবুর মনে পড়ে গেল।

পারিজাতবাবুর সম্বন্ধে চমকপ্রদ সব কাহিনী এখানে ওখানে শুনেছেন। খবরের কাগজের পাতায় পড়েছেন। বিখ্যাত গোয়েন্দা। ব্যোমকেশ বক্সীর ভাইপো।

আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল।

গৃহিনীর সঙ্গে পারিজাত বাবুর লতায় পাতায় কি একটা সম্পর্কও আছে।

কি বললেন পারিজাত বক্সী?

আজ রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

দীনবন্ধু হাত ঘড়ি দেখলেন।

প্রায় ছটা।

শীতের বিকাল। এর মধ্যেই সন্ধ্যার রূপ নিয়েছে।

তাহলে ষ্টেশনে কাউকে পাঠাতে হয়।

কাকে আর পাঠাবে। কেউ তো ওঁকে চেনে না। তা ছাড়া উনিও বলেছেন, কারও ষ্টেশনে থাকার দরকার নেই, উনি ঠিক চিনে আসতে পারবেন।

দুজনে অপেক্ষা করলেন। সাড়ে আট বাজল। পারিজাতবাবুর দেখা নেই। ষ্টেশন খুব দূরে নয়। মিনিট দশেকের পথ। রিক্সায় মিনিট পাঁচেক। ট্রেন ঠিক সময়ে এসেছে। ট্রেনের শব্দ বাড়ী থেকে পাওয়া গেছে।

নটা বাজল।

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

কই গো, তোমার পারিজাত বক্সীর কি হ'ল?

কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে তো বললেন, নিশ্চয় আসব।

আর এসেই বা লাভ কি। প্রফেসরের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

পৌনে দশ, দুজনে যখন শুতে যাচ্ছে, বাড়ীর সামনে রিক্সা এসে থামল।

সুটকেশ হাতে নিয়ে পারিজাত বক্সী নামলেন।

দীনবন্ধুবাবু পারিজাত বক্সীকে কোনদিন দেখেন নি। তিনি কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে বললেন।

NOT FOR SALE

খুব লোক যা হোক। এই আপনার সাড়ে সাতটা?

পারিজাত বক্সী হাতযোড় করে দুজনকে নমস্কার করে বললেন দেরী করে আসার জন্য মাপ চাইছি। কতকগুলো কাজ সেরে এলাম।

কথা হ'ল খাবার টেবিলে।

দীনবন্ধুবাবুর ঠিক সময়ে খাওয়ার অভ্যাস। তিনি আগেই খেয়ে নিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী আর পারিজাত বক্সী একসঙ্গে খেতে বসলেন।

একটা চেয়ার নিয়ে দীনবন্ধুবাবু সামনে বসে রইলেন।

আমি বাড়িটা দেখে এলাম। করোনারী এ্যাটাক কিনা জানি না, তবে হার্টফেল করে আপনাদের প্রফেসর মারা গেছেন, সেটুকু বোঝা যাচ্ছে। ভিসারায় বিষ জাতীয় কিছু পাওয়া যায় নি। দেহেও বিষের কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস?

দীনবন্ধুবাবুর প্রশ্নের উত্তরে পারিজাত বক্সী বললেন।

এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা মুস্কিল। আমাকে দিন কয়েক সময় দিন।

খাওয়া দাওয়ার পর সুটকেশ থেকে কোলের বালিশ আর একটা বিলাতী কম্বল বের করে পারিজাত বক্সী বললেন, আমি চলি।

দীনবন্ধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক।

এত রাত্রে আপনি আবার কোথায় যাবেন?

আমি প্রফেসরের বাড়িতে শোব।

কিন্তু সে বাড়ী তো তালাবন্ধ।

আমি থানায় গিয়ে মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে চাবি নিয়ে এসেছি। আচ্ছা গুড নাইট। কাল সকালে দেখা হবে।

পারিজাত বক্সী বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ী খালি।

হরিয়া মালীও নেই। প্রফেসরের মৃত্যু হবার পর তার আর এখানে রাত কাটাতে সাহস হয় নি।

তালা খুলে পারিজাত বক্সী ভিতরে ঢুকলেন।

হাতড়ে হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন।

NOT FOR SALE

তারপর এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়ালেন।

দুটো মাত্র ঘর। একটা একটু বড় আর একটা ছোট।

শোবার ঘরে একটা শেলফ। তাতে কিছু বোটানির বই, কিছু হালকা নভেল। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। একটা খাট।

ভিতরের ঘরে একটা আলনা। তাতে কিছু জামাকাপড় ঝুলছে। একটা দেয়াল আলমারি। তাতে কয়েকটা ওষুধের শিশি।

সেগুলো পেড়ে মনোযোগ দিয়ে পারিজাত বক্সী দেখলেন। ঘুমের বড়ি, মাথা ধরার অ্যানাসিন ডায়াবিনিস। শেষের ওষুধটা দেখে মনে হ'ল প্রফেসরের ডায়বেটিস ছিল।

একদিকে একটা ফাইল। সেটা পেড়ে নিয়ে পারিজাত বক্সী বিছানায় বসলেন, পরপর রক্তের রিপোর্ট প্রস্রাব ষ্টুল যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করিয়েছেন। সবই স্বাভাবিক শেষদিকে ডায়বেটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু রক্তে শর্করার ভাগ খুবই সামান্য। ওষুধ খেয়ে প্রফেসর সেরে গেছেন।

পারিজাত বক্সী এবার আলনায় ঝোলানো জামাকাপড় গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। লম্বা কোটের পকেটে কিছু গাছের পাতা বোধ হয় তাঁর বোটানী চর্চার জন্য। একটা রুমাল, নস্যির কৌটা।

সব দেখা হলে পারিজাত বক্সী প্রফেসরের বিছানাটা তুললেন।

না, কিছু নেই।

এ ভদ্রলোকের বোধ হয় কেউ কোথাও ছিল না। কোন চিঠিপত্র নেই। এমন কি যে ছাত্ররা আসাযাওয়া করত, তারাও কোনদিন এক লাইন লিখে খোঁজ নেয় নি।

রীতিমত আশ্চর্য জনক।

পারিজাত বক্সী হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন।

রাত বারোটা বেজে গেছে।

মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়।

পারিজাত বক্সী উঠে বসে ঘরের চেহারাটা আর একবার দেখলেন।

কোণের দিকে একটা ক্রাচ আর কাঠের পা।

NOT FOR SALE

তিনি আগেই শুনেছিলেন দুর্ঘটনায় প্রফেসর একটা পা হারিয়েছিলেন। কাঠের পা ব্যবহার করতেন।

পারিজাত বক্সী উঠে গিয়ে ক্রাচ আর কাঠের পাটা নিয়ে এলেন।

ক্রাচটা নামী বিলাতী কোম্পানীর কেনা। চকচকে পালিশ। দামী কাঠ। বগলে চেপে রাখার জায়গাটা মোটা রবারের।

অবশ্য এটা খুব স্বাভাবিক। সারাজীবনের জিনিস। কাজেই এই নিত্য দিনের সঙ্গীটির পিছনে প্রফেসর পয়সা খরচ করবেন এটাই আশা করা যায়।

ক্রাচটি নাড়াচাড়া করতে করতে পারিজাত বক্সীর ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে এল।

ক্রাচটির মাঝামাঝি জায়গায় একটা স্ক্রু।

এখানে স্ক্রু থাকবার তো কোন কারণ নেই।

স্ক্রুটি নাড়াচাড়া করতে করতে ক্রাচটিও দু ভাগ হয়ে গেল।

ওপরের অংশ ছোট, নীচের অংশ বড়।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার নীচের অংশ ফাঁপা।

কাগজপত্র গুটিয়ে কিংবা অন্য কোন জিনিস বেশ রাখা যায়।

ক্রাচটি কোলে নিয়ে পারিজাত বক্সী চুপচাপ বসে রইলেন।

জীবনে ক্রাচ অনেক দেখেছেন, কিন্তু ঠিক এভাবের ফাঁপা ক্রাচ এর আগে আর দেখেন নি।

গোপনীয় দলিল, নিষিদ্ধ জিনিষপত্র রাখার পক্ষে আদর্শ ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রফেসর কি ধরণের লোক ছিলেন যে এই প্যাটার্ণের ক্রাচ করার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

রোদ পড়েছে। পারিজাত বক্সী ক্রাচ আর কাঠের পা কোণের দিকে সরিয়ে রেখে উঠে পড়লেন।

মুখ হাত ধুয়ে দরজায় তালা দিয়ে দীনবন্ধু বাবুর বাড়ি চলে এলেন।

দীনবন্ধুবাবু বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন।

পোশাক দেখে মনে হয়, প্রাতভ্রমণ শেষ করে অপেক্ষা করছেন।

পারিজাত বক্সীকে দেখে বললেন।

কাল অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছেন বলে আর ডাকতে পাঠাই নি।

পারিজাত বক্সী বললেন।

NOT FOR SALE

আপনার সঙ্গে প্রফেসরের আলাপ কি এখানে আসার পর, না আগে?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দীনবন্ধুবাবু উত্তর দিলেন।

না, আগে আলাপ ছিল না। এখানে আসার পর।

ভদ্রলোকের আসল নাম তো তারকনাথ রায়?

হ্যাঁ। কলেজে প্রফেসরী করতেন বলে সবাই প্রফেসর বলত।

কোন কলেজে পড়াতেন জানেন?

শুনেছিলাম মেট্রোপোলিটান কলেজের বোটানীর প্রফেসর ছিলেন।

দুর্ঘটনায় একটা পা কাটা যায়?

তাই শুনেছি।

আচ্ছা আপনি প্রফেসরের বাড়ীতে গেছেন?

হ্যাঁ গেছি বইকি। তবে উনিই আমার বাড়ী বেশী আসতেন।

এমন কি কোনদিন হয়েছে, আপনার সামনে ওঁর ছাত্রের দল এসেছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

আপনার সামনে উনি তাদের সঙ্গে বোটানী নিয়ে আলোচনা করতেন?

না, ছাত্রদের বলতেন, তোমরা একটু বস, এঁর সঙ্গে কথা শেষ করে তোমাদের কথা শুনব।

চা জলখাবার শেষ করে পারিজাত বক্সী বললেন।

দীনবন্ধুবাবু আমি আজ একবার কলকাতায় যাব।

কলকাতায়?

হ্যাঁ, আমার কতকগুলো কাজ আছে। সম্ভব হলে আজ রাত্রে ফিরব, কিংবা কাল। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি বলুন।

আমি তালার ওপর আমার তালা দিয়ে যাচ্ছি। মোহন সিং যদি আসেন, বলবেন যেন প্রফেসরের বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা না করেন।

আপনার কি মনে হচ্ছে পারিজাতবাবু?

দীনবন্ধুবাবু আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না।

এখন কিছু বলতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে প্রফেসরের মৃত্যুর মধ্যে রহস্য আছে। সেই রহস্যের জট আমাকে ছাড়াতে হবে।

NOT FOR SALE

দীনবন্ধুবাবু চুপ করে শুনলেন।

হঠাৎ পারিজাত বক্সী জিজ্ঞাসা করলেন।

আচ্ছা হরিয়া মালী কেমন লোক?

হরিয়া! হরিয়াকে তো ভালই মনে হয়। বাড়িওয়ালার লোক। প্রফেসর আসবার আগে থেকেই এবাড়ীর দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে হাঁড়িয়া খায়, এছাড়া আর কোন দোষ নেই।

একটু পরেই পারিজাত বক্সী রওনা হয়ে গেলেন।

মোহন সিং এদিকে এল না। বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে দীনবন্ধুবাবুই থানায় গেলেন।

জীপ থেকে মোহন সিং নামছিল, দীনবন্ধুবাবুকে দেখে বলল।

কি স্যার, কিছু বলবেন?

না, কি আর বলব।

কিছু মনে করবেন না স্যার। শখের গোয়েন্দাদের কাজই এই। সোজা কাজ আরও কঠিন করে তোলা। স্বাভাবিক একটা মৃত্যুকে নিয়ে মিষ্টার বক্সী যা প্যাঁচ কষছেন। আমার অবশ্য কিছু বলার নেই। ডেপুটি কমিশনার ফোন করে আমায় নির্দেশ দিয়েছেন, মিষ্টার বক্সীকে সাহায্য করার জন্য। আমি সাহায্য করে যাব।

মোহন সিংয়ের কথায় মনে হ'ল, বাইরে থেকে পারিজাত বক্সী এসে এ কেসে হাত দেওয়াতে সে খুব সন্তুষ্ট নয়।

অবশ্য শখের গোয়েন্দা আর পুলিশ অফিসারের মধ্যে এই মানসিক সংঘর্ষ সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

পারিজাত বক্সীকে দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন শুনলে হয়তো মোহন সিং মোটেই খুশী হবে না।

পারিজাত বক্সী ফিরলেন তারপরের দিন বিকালে।

মুখ চোখের চেহারা বেশ গম্ভীর।

মনে হল গম্ভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

দীনবন্ধুবাবু নন, তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু হদিশ হ'ল?

NOT FOR SALE

কিসের?

প্রফেসরের কেসের?

এখনও সব হয়নি তবে এইটুকু জেনে রাখুন মেট্রোপোলিটন কলেজে তারকনাথ রায় বলে, বোটানীর কেন, কোন বিষয়ের কোন প্রফেসর ছিল না।

দীনবন্ধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

সে কি?

হ্যাঁ। আর মোটর দুর্ঘটনায় প্রফেসরের সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার কথাও ঠিক নয়। আমি বড় বড় হাসপাতালের বেশ কয়েক বছরের রেকর্ড দেখেছি।

তাহলে এ ধরণের মিথ্যা কথা বলে লাভ?

লাভের কথা যিনি বলতে পারতেন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আচ্ছা পুলিশের লোক কি প্রফেসরের বাড়িতে এসেছিল?

না।

এবার দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন।

তাহলে যেসব ছাত্ররা প্রফেসরের কাছে আসত?

প্রফেসর যেমন ভূয়ো, ছাত্রেরা তেমনই ভূয়ো হ'তে পারে।

একটু থেমে পারিজাত বক্সী বললেন।

আর প্রশ্ন নয় আমাকে একটু চা দিন তো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লজ্জিত হয়ে দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন।

ছি, ছি, আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

রাত্রে পারিজাত বক্সী প্রফেসরের বাড়ীতে চলে এলেন।

ক্রাচটা নিয়ে আবার বসলেন।

ঘর অন্ধকার। বক্সীর হাতে জোরালো টর্চ।

উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

না আর কোথাও কিছু নেই।

এবার কাঠের পা টেনে নিলেন।

সাধারণ কাঠের পা। বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

পায়ের সঙ্গে আটকানোর জন্য চামড়ার স্ট্র্যাপ রয়েছে।

NOT FOR SALE

ষ্ট্র্যাপটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো মেঝের ওপর পড়ল।

পারিজাত বক্সী কাগজের টুকরোটা কুড়িয়ে নিলেন।

সাধারণ ছোট কাগজ। মাঝখানে কালো কালিতে দুটি অক্ষর লেখা।

শি-ত।

কথাটা শীত নয়, সেটা বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। কারণ শীত বানান যে শিত নয় সেটুকু জানার মতন বিদ্যা প্রফেসরের ছিল।

তাছাড়া মাঝখানে হাইফেনই বা কেন?

শব্দটা মামুলি নয়, তাহলে এত যত্ন করে কাঠের পায়ের ষ্ট্র্যাপের সঙ্গে বাঁধা থাকত না।

যদি কিছু রহস্য থাকে তাহলে তা এই কাগজকে কেন্দ্র করেই।

এবারেও পারিজাত বক্সী মেঝের ওপর বিছানা পাতলেন।

চোখে ঘুম নেই। কেবল চিন্তা, শি-ত কথাটার কি অর্থ হ'তে পারে।

যদি অন্য কোন ভাষার কথা হয় তা হ'লেই মুস্কিল। সে ভাষা জানতে পারলে জীবনে এর রহস্যোদ্ধার করা যাবে না।

রাত অনেক। একটু তন্দ্রার মতন এসে থাকবে, হঠাৎ খুট করে শব্দ!

পারিজাত বক্সীর ঘুম খুব সজাগ।

মনে হ'ল শব্দটা খাটের পাশের জানালার কাছ থেকে আসছে।

কে যেন জানলা খোলার চেষ্টা করছে।

শুয়ে শুয়েই পারিজাত বক্সী ভিতর দিকে সরে গেলেন। খাটের আড়ালে।

সব দরজায় কাঁচ দেওয়া। ভারি, শক্ত কাঁচ। তার ওপর লোহার ক্রশবার। কাঁচ ভেঙে গেলেও ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

খুট, খুট, খুট।

দেয়ালে হেলান দিয়ে পারিজাত বক্সী দেখতে লাগলেন।

বাইরে ফিকে জ্যোৎস্না। সব অর্ধস্পষ্ট। একটা লোকের কালো কাঠামো দেখা গেল।

একটু পরেই কাঁচ খুলে গেল। লোহার ক্রশবারও বিচিত্র উপায়ে সরানো হ'ল।

NOT FOR SALE

বিরাট আকারের একটি লোক ঘরে ঢুকল।

লম্বায় বোধ হয় সাড়ে ছফিট। সবল চেহারা। নিগ্রো হওয়া আশ্চর্য্য নয়। মনিবন্ধে বাঁধা চ্যাপ্টা টর্চ। সেই আলোর সাহায্যে লোকটা সোজা ক্রাচ আর কাঠের পা নিয়ে খাটের ওপর বসল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রাচের প্যাঁচ খুলে ফেলল। কাঠের পায়ের ষ্ট্র্যাপও।

তারপর ভিতরে হাত দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিছু না পেয়ে হতাশব্যঞ্জক একটা শব্দ করল।

বাইরে শিয়াল ডেকে উঠতেই লোকটা চমকে উঠল। আস্তে আস্তে উঠে আবার জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জানলার কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারপর আর দেখা গেল না।

পারিজাত বক্সী তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে বসলেন।

জানলার কাঁচ ঠিক আটকানো রয়েছে। লোহার ক্রশবারও।

জানালার কাছে মুখ রেখে পারিজাত বক্সী দেখলেন, দীর্ঘ লোকটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

এবার পারিজাত বক্সী নিঃসন্দেহ হলেন।

লোকটা এই কাগজটার সন্ধানেই এসেছিল। কাগজটা কোথায় আছে সেটা তার জানা। কাগজটার মধ্যে লেখা শব্দ দুটো কোন সঙ্কেত ছিল।

বাকি রাত পারিজাত বক্সী পায়চারি করলেন।

কি হতে পারে ওই শব্দ দুটোর অর্থ!

নিশ্চয় কোন নিষিদ্ধ দ্রব্যের কারবারে প্রফেসর লিপ্ত ছিল। ছাত্র সেজে যারা আসত, তারা ছাত্র নয় এই কারবারের অংশীদার।

এ সব ব্যবসায় যা হয়ে থাকে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে রেষারেষি। একজন আর একজনকে পৃথিবী থেকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

দীনবন্ধুবাবুর শরণ নিতে হবে। এখানে শি-তে বলে কোন সাঁওতালি মহল্লা আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে। কিংবা এ দুটো অক্ষর কোন লোকের আদ্যাক্ষর নয়তো!

ভেবে পারিজাত বক্সী কিছু কুলকিনারা পেলেন না।

NOT FOR SALE

ভোর হ'ল। পারিজাত বক্সী আগে জানলাটা পরীক্ষা করলেন। অন্য কাঁচগুলো ঠিক আছে। একটা জানালার কাঁচ আলগা বসানো। ক্রশবারের স্ক্রুগুলোও খোলার ব্যবস্থা আছে।

তার মানে, রাতে সদর দরজা না খুলে, জানলার কাঁচ সরিয়ে প্রফেসরের নিজের পক্ষে বাইরে আসাযাওয়ার সুবিধা ছিল। দরকার হ'লে রাতবিরাতে বাইরের আগন্তুককেও বাড়ির মধ্যে আনা চলত।

সকালে পারিজাত বক্সীকে দেখে দীনবন্ধুবাবু চমকে উঠলেন।

কি ব্যাপার? চেহারা এমন হয়েছে কেন? সারা রাত ঘুমান নি?

পারিজাত বক্সী হাসলেন।

ঘুমাব কি। আপনাদের দেশে প্রহরে প্রহরে যা শেয়ালের ডাক।

চা পানের পর পারিজাত বক্সী বললেন।

দীনবন্ধুবাবু, আপনার ফোনটা ব্যবহার করব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, এর জন্য আপনি আবার জিজ্ঞাসা করছেন। আপনি তো আছেন আমরা স্বামী-স্ত্রী একটু হাটে যাব। আজ হাট বার।

পারিজাত বক্সী ডেপুটি কমিশনার গোয়েন্দা বিভাগের বাড়ীতে ফোন করলেন।

আমাকে একটা খোঁজ দিতে হবে।

বলুন।

সাড়ে ছ'ফিট লম্বা লোক, বিদেশী হওয়াও বিচিত্র নয়, একটু খুঁড়িয়ে চলে। জাহাজের খালাসি হলেও হ'তে পারে।

গালের কাছে খুব বড় কাটা দাগ?

কি জানি অন্ধকারে দেখেছি অতটা লক্ষ্য করিনি।

ফটো দেখলে চিনতে পারবেন?

বোধ হয় পারব।

ঠিক আছে, আমার লোক গোটা চার পাঁচ ফটো নিয়ে আপনার কাছে যাবে। মোটরে পাঠাব। ঘণ্টা আড়াই তিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আপনি দেখে বলবেন।

ঘণ্টাখানেক পর দীনবন্ধু দম্পতি হাট থেকে ফিরলেন।

NOT FOR SALE

দীনবন্ধুবাবুর হাতে ঝুড়িতে তরিতরকারি। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রীর হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা।

দীনবন্ধুর স্ত্রী বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর রাখা রেকাবিতে ঠোঙা উপুড় করে দিলেন একরাশ শিউলি ফুল পড়ল।

বসে বসে পারিজাত বক্সী দেখছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন এ ফুলও কি হাট থেকে কিনলেন?

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী মাথা নাড়লেন।

না, না, এসব পয়সা দিয়ে কেনা নয়। প্রফেসরের বাগানে শিউলিতলায় পড়েছিল কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।

পারিজাত বক্সী চমকে সোজা হয়ে বসলেন।

মনে মনে বিড় বিড় করলেন, শিউলিতলা মানে শি-ত। তাইত এই সহজ কথাটা মনে আসে নি।

দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন।

কি বললেন?

না কিছুনা। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পারিজাত বক্সী প্রফেসরের বাড়ীতে চলে এল।

দীনবন্ধু দম্পতী দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

একটা খাটিয়ায় বসে হরিয়া দড়ি পাকাচ্ছিল।

পারিজাত বক্সী তার সামনে গিয়ে বসল।

হরিয়া একটা কাজ করতে হবে।

বলুন বাবু।

একটা চিঠি থানার অফিসারকে দিয়ে আসতে হবে।

দিন।

পারিজাত বক্সী একটা চিঠি আর একটা পাঁচ টাকার নোট হরিয়ার হাতে দিলেন।

টাকা কি হবে বাবু?

রেখে দাও তোমার কাছে। এতটা পথ যাবে।

NOT FOR SALE

হরিয়া বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের জন্য পারিজাত বক্সী নিশ্চিন্ত।

সাঁওতালের হাতে টাকা এলে সে হাড়িয়া না খেয়ে ফিরবে না।

শিউলি গাছটা বাড়ীর পিছন দিকে।

তখনও শিউলি তলায় অনেক ফুল পড়ে রয়েছে।

কে যেন সাদা আসন বিছিয়ে রেখেছে।

কোমরে বেল্টে বাঁধা যন্ত্র বের করে পারিজাত বক্সী কাজে লেগে গেলেন।

প্রায় একঘণ্টা এদিক ওদিক খোঁড়ার পর একটা কাঠের বাক্সের সন্ধান মিলল।

চন্দন কাঠের ছোট বাক্স। তালা বন্ধ।

তালা খুলতে অসুবিধা হ'ল না।

ওপরে কাগজের ফালি, সেগুলো সরাতেই পারিজাত বক্সীর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল।

গোটা দশেক হীরা। ঔজ্জ্বল্যে চকমক করছে।

আসল কি নকল পারিজাত বক্সীর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যদি আসল হয়, তবে তার দাম অনেক।

এবার বোঝা গেল প্রফেসর হীরার চোরাকারবারে লিপ্ত ছিলেন। বাইরে থেকে হীরা আসত, কিংবা এখান থেকে বাইরে চালান যেত।

এ সব ব্যবসায় শেষ পর্যন্ত যা হয়, প্রফেসরের তাই হয়েছিল। ভাগ নিয়ে পয়সা, কিংবা দলপতি হবার স্পৃহা। একজন আর একজনকে খতম করার চেষ্টা করে।

পারিজাত বক্সী বাক্সটা সাবধানে নিয়ে আবার ভাল করে মাটি চাপা দিলেন।

•

দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি ফেরার একটু পরই একটা মোটর এসে দাঁড়াল।

একটি লোক কয়েকটি ফটো পারিজাত বক্সীর হাতে দিল।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সী গভীর মনোনিবেশ সহকারে ফটোগুলো দেখলেন।

প্রতিটি ফটোর পিছনে নাম আর বিশেষত্ব লেখা।

বিশেষত্ব অর্থাৎ লোকটা কি ধরণের ব্যবসায় লিপ্ত।

একটা ফটো চোখে লাগল।

লম্বা চেহারা। সাড়ে ছ ফুটের কাছাকাছি। গালে কাটা দাগ। পিছনে নাম লেখা, আফজল ইরানী। বাঁ পায়ে গুলি লাগার পর একটু খুঁড়িয়ে চলে। পাথরের কারবার! পেশায় জাহাজের খালাসী।

পারিজাত বক্সী জিজ্ঞাসা করলেন এ লোকটা কোথায় আছে এখন?

একবার জেল হবার পর খালাসীর চাকরি আর নেই। কোথায় আছে রেকর্ড নেই।

জেল হয়েছিল কেন?

একটা লোককে ছোরা মেরেছিল। কি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল।

ঠিক আছে, এই ছবিটা আমি রাখলাম। বাকিগুলো আপনি নিয়ে যান।

লোকটা চলে যেতে পারিজাত বক্সী হীরাগুলো বাক্স থেকে বের করে নিজের সুটকেশের গোপন পকেটে রেখে দিলেন। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে বাক্সর মধ্যে রেখে দিলেন।

এবার প্রফেসরের ঘরের মধ্যে ঢুকে দুটো বইয়ের মাঝখানে বাক্সটা রেখে দিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী বললেন, কি ব্যাপার আপনার, দুপুরে ঘুমান নি?

পারিজাত বক্সী হেসে উত্তর দিলেন, যে কাজের ভার দিয়েছেন, ঘুম চোখ থেকে পালিয়েছে।

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু কিনারা হ'ল?

মনে তো হয়, অদ্য শেষ রজনী। দেখা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই তিনজন কনেষ্টবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

পারিজাত বক্সী তাদের সঙ্গে চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন।

তারপর রাত আর একটু গভীর হ'তে চারজন বেরিয়ে পড়ল।

খুব সুবিধা। অন্ধকার রাত। কোথাও একটি তারার ইশারাও নেই।

NOT FOR SALE

বেশ শীত।

চারজনে প্রফেসরের বাড়ীর পাশে ঝোপের আড়ালে রইল।

সময় যেন আর কাটে না।

ঝোপে ঝোপে জোনাকীর ঝাঁক। প্রহরে প্রহরে শিয়ালের চীৎকার। কনকনে পাহাড়ে ঠাণ্ডা।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে দীর্ঘাকৃতি এক ছায়ার আবির্ভাব। খুব ধীর পদক্ষেপে একটা লোক এগিয়ে এল।

একটু দাঁড়াল। দেখল এদিক ওদিক তারপর প্রফেসরের বাড়ীর দিকে পা চালাল।

পারিজাত বক্সী খুব সাবধানে লোকটাকে অনুসরণ করলেন।

জানালা খুলে লোকটা ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। জোরালো টর্চের বাতি জ্বেলে সারা ঘর দেখল। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে বইয়ের ফাঁকে কাঠের বাক্সটা দেখতে পেয়ে সেটা বুকে তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের চীৎকার।

বাইরে পা দিতেই পারিজাত বক্সীর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল।

আফজল ইরানী, মাথার ওপর দুটো হাত তোলো।

লোকটা চমকে উঠে পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই দেখল পুলিশ বাহিনী তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। ফগলাইটের উজ্জ্বল আলো তার ওপর।

বল, তারক রায় তোমার কি ক্ষতি করেছিল?

দু'এক মিনিটের দ্বিধা তারপর লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

লোকটা বেইমান, আমার সঙ্গে নেমকহারামি করেছে।

আফজল বাকি কথা বলল থানার মধ্যে।

তারক রায়ের সঙ্গে আফজলের অনেকদিনের পরিচয়। সুদূর বর্মায়। ক্রমে অন্তরঙ্গতা হয়। দুজনে ব্যবসা শুরু করে। আফজল দেশ বিদেশ থেকে দামী পাথর নিয়ে আসে, তারক রায় সে সব পাথর জহুরীদের কাছে বিক্রী করে পয়সা ভাগ করে নেয়। বর্মা থেকে তারক রায় এদেশে আসার পরও ব্যবসা চলে। খুব বড় শহরে আসা যাওয়া করা একটু অসুবিধা। পুলিশের নজরে পড়ার ভয় ছিল, তাই তারক রায় এইরকম জায়গায় ডেরা বাঁধে।

NOT FOR SALE

বেশ চলছিল ব্যবসা, কিন্তু তারক রায় নিমকহারামি শুরু করে। একবার গোটা ছয়েক নীলা আফজল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, তারক রায় সেগুলো ফুটো বলে ফেরৎ দেয়। তারপর দশটা পোকরাজের বেলাতেও তাই করে।

আফজলের সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে আসল পাথর সরিয়ে ফুটো পাথর আফজলকে ফেরত দেওয়া হচ্ছে।

তারপর বিদেশে আফজল একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিল। ছ'বছরের জেল হয়। জাহাজের চাকরি পায়। তাও জেল থেকে বেরিয়ে একটি লোককে দিয়ে সে কিছু হীরা পাঠিয়ে দিয়েছিল। লোকটিকে বলতে বলেছিল, আফজল মারা গেছে। তার স্ত্রী-পুত্র খুব কষ্টে আছে। হীরাবাবদ টাকাগুলো হাতে হাতে দিতে।

তারক রায় দেয়নি। বলেছে, ইদানীং আমি নাকি তাকে ফুটো পাথর দিচ্ছিলাম, কাজেই হীরাগুলো যাচাই না করে সে একটি পয়সা দিতে পারবে না।

তারপর লোকটাকে অনেকবার পাঠিয়েছি। তারক রায় এড়িয়ে গেছে।

আমি খবর পেয়েছিলাম, তারক রায় আর একটা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা নানা জায়গা থেকে তাকে পাথরের যোগান দিচ্ছে।

আমি একদিন রাত্রে তারক রায়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। জানলা আলাদা ছিল, সেটা জানা ছিল। ওই পথেই আগে যাওয়া আসা করেছি।

কি আশ্চর্য, আমাকে দেখে কথা বলবার আগেই তারক রায় আর্তনাদ করে শক্ত হয়ে বিছানার ওপর পড়ে গেল।

তার ধারণা আমি মারা গেছি। মরা মানুষকে চোখের সামনে দেখে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

আমি জানতাম ক্রাচের কোটরে পাথরগুলো থাকে, কিন্তু সেরাত্রে বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হয় নি। তারপর আবার এসেছিলাম, খুঁজে পাই নি। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছি তারক রায় মারা গেছে। ভাল হয়েছে। হারামজাদা দোজখে যাক। আজ জিনিষগুলো পেয়েছি। এই চন্দনের বাক্সসুদ্ধই আমি তাকে দিয়েছিলাম।

আফজল গভীর মমতায় চন্দনের বাক্সটা বুকে চেপে ধরল।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সী মোহন সিংয়ের দিকে ফিরে বললেন। আমার কাজ শেষ, এবার আপনাদের কাজ শুরু। যা করবার করুন।

আফজল, একটা কথা শুধু তোমাকে বলে যাই, আজও তুমি আসল জিনিস পাও নি। আসল জিনিসের মালিক সরকার। এগুলো সেখানেই পৌঁছে দেওয়া হবে।

সেকি!

আফজলের কণ্ঠ থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি চন্দনের বাক্সটা খুলে দেখেই বাক্সটা মেঝের ওপর আছড়ে ফেলল।

পাথরের নুড়িগুলো থানার মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

—সমাপ্ত—